শ্যামলী নিসর্গ

দ্বিজেন শর্মা

শ্যামলী নিসর্গ

ঢাকার সুদর্শন বৃক্ষ

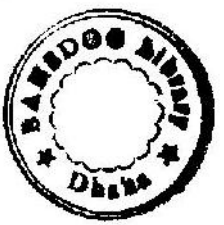

দ্বিজেন শর্মা

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library

বাএ ৩৫৫৮

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৭/মে ১৯৮০। প্রকাশক : পরিচালক, সাধেক প্রকাশন বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪০৩/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭. প্রকাশক : হাবীব-উল-আলম, পরিচালক [চলতি দায়িত্ব], প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। চিত্র : গোপেশ মালাকার। মুদ্রণসংখ্যা : ১২৫০ কপি। মূল্য : ২০০.০০ টাকা

SHYAMOLEE NISHARGA (Description of Trees) by Dwijen Sharma. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Reprint : February 1997. Price : Tk. 200.00 only

ISBN 984-07-3517-9

উৎসর্গ

নিসর্গমুগ্ধ পঞ্চসখা
অমৃতলাল আচার্য (বলধা)
ডা. এম. আহমদ (বরিশাল)
আলী আনোয়ার (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
ফাদার জেমস বেনাস (নটরডেম কলেজ)
ডা. বিষ্ণুপদ পতি (কুমুদিনী হাসপাতাল)

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন বাংলা একাডেমীর মূল লক্ষ্য। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সাধনেও একাডেমী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। মননশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর অবদান দেশ বিদেশের বিদ্বৎ সমাজে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। একাডেমীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তার প্রকাশনার সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারেরও অধিক। এই বিপুল সংখ্যক প্রকাশনার মধ্যে এমন কিছু বই আছে যা ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নি। শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হওয়ায় বাংলা একাডেমীর অনেক বই দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমী চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কিছু বইয়ের পুনর্মুদ্রণ করে থাকে। এই অভিলক্ষে ১৯৯১ থেকে পুনর্মুদ্রণযোগ্য গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব একাডেমীর 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্পে'র অধীনে সম্পন্ন হয়ে আসছে।

জনাব দ্বিজেন শর্মা প্রণীত 'শ্যামলী নিসর্গ' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। লেখক এই গ্রন্থে ঢাকার সুদর্শন বৃক্ষরাজির আকার, আয়তন, আকৃতি, বর্ণ এবং এর ভেষজগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত করেছেন। গ্রন্থটি পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এই কারণে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

এই গ্রন্থ আগেরমতো পাঠকসমাজের চাহিদাপূরণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মহাপরিচালক

Accession 17918

সূচিপত্র

প্রাক-কথন	:	১
চাঁপা	:	২৭
দেবদারু	:	২৯
সজনা	:	৩৩
কামরাঙ্গা	:	৩৫
জারুল	:	৩৭
সিলভার ওক	:	৩৯
চালতা	:	৪২
কনকচাঁপা	:	৪৪
তেলশুর	:	৪৬
কালোজাম	:	৪৯
ইউক্যালিপ্টাস	:	৫১
হিজল	:	৫৩
নাগলিংগম	:	৫৫
দেশী-বাদাম	:	৫৭
অর্জুন	:	৫৯
নাগেশ্বর	:	৬২
লিয়্যুইয়া	:	৬৫
বেরিয়া	:	৬৮
বুদ্ধ নারিকেল	:	৭০
জংলী বাদাম	:	৭৩
মুচকুন্দ	:	৭৬
শিমুল	:	৭৮
পরশ-পিপুল	:	৮২
পুত্রঞ্জীব	:	৮৪
আমলকি	:	৮৬
কৃষ্ণচূড়া	:	৮৯
ক্যাশিয়া	:	৯২
সোনাইল	:	৯৫
পেল্টোফরাম	:	৯৮
অশোক	:	১০১
রক্তকাঞ্চন	:	১০৩
তেতুল	:	১০৫

স্পেথোডিয়া	:	২০৬
টেবেব্যুইয়া	:	২০৯
গামারি	:	২১১
সেগুন	:	২১৩
পান্থপাদপ	:	২১৫
নারিকেল	:	২১৯
সুপারি	:	২২২
খেজুর	:	২২৪
রয়্যাল পাম	:	২২৭
বনসুপারি	:	২২৯
তাল	:	২৩১
লিভিস্টনা	:	২৩৪

সংযোজন

ইপিল ইপিল	:	২৩৬
চিনে-চেরি	:	২৩৮
বাওবাব	:	২৪১
শাল	:	২৪৪
স্কারলেটকর্ডিয়া	:	২৪৭
পারুল	:	২৪৯
জ্যাকারাণ্ডা	:	২৫২
আকাশনীম	:	২৫৪

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রকাব্যে তরুলতা : কিছু উদ্ধৃতি	:	২৫৭

পরিশিষ্ট-২

ব্যবহৃত পরিভাষার ব্যাখ্যা	:	২৯১
পরিশিষ্ট ১-এর শুদ্ধিপত্র	:	২৯৭
নির্ঘণ্ট	:	৩০১

প্রাক-কথন

১.

তরু-নির্ভরতা অমোঘ নিয়তি বলেই সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অদ্যাবধি মানুষ প্রকৃতির এই অনুষঙ্গের প্রবল অস্তিত্বে যাদুমুগ্ধ। সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের স্বাধীনতাকে বহুদূর প্রসারিত করলেও প্রকৃতির আওতা থেকে পূর্ণ-মুক্তির দিন সুদূর ভবিষ্যতেও অস্পষ্ট। আমাদের খাদ্যবস্তুর এক ও অনন্য জোগানদার এই তরুরাজ্য। অধুনাতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও এ-পথে বিকল্পের সন্ধান দিতে পারে নি। এই নির্ভরতার এ পর্যায়ের শেষ কবে কেউ জানে না। আদিম উদ্ধত প্রকৃতির ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যে অসহায় আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তরু ছিল জীবনের প্রিয় আশ্বাস। বলা যায়, তারও আগে তাদের বর্তমান পরিচয় বিবর্তনের অধঃস্তন কোন স্তরে যখন অস্পষ্ট তখনও তরুর সঙ্গে সখ্য ছিল নিবিড়। রৌদ্রের তাপ, বাত্যার প্রহার, ক্ষুধার দাহ থেকে অব্যাহতির জন্য সভ্যতার এ প্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নেও আমরা তরু-মুখাপেক্ষী। লক্ষ লক্ষ বছরের এই সংযোগে কখনও সখ্যে, কখনও শত্রুতায় আমাদের জৈবিক উত্তরাধিকারের গভীরে যে-মূল বিস্তার করেছে, অবচেতন থেকে চেতনায়, এষণা থেকে ঐতিহ্যে তা প্রোথিত। 'প্রকৃতি আমাদের মা আমরা তার অন্যতম অংশ হিসেবেই বিবর্তিত হয়েছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে বসবাস করেছেন। তাই এর দৃশ্য-গন্ধ-শব্দ এবং গভীর নির্জনতায় একাকীত্বের সহজাত বাসনা আমাদের মনের গভীরে এতো দৃঢ়বদ্ধ। ঝরেপড়া পাতা, নতুন খড়ের আঘ্রাণ, পাহাড়ি ঝর্নার কলনাদ, মুখের উপর মেঠোঘাসের রসাল স্পর্শ, এক-কাপের গ্রন্থন অথবা এপ্রিল আকাশে তার উচ্ছ্বসিত বর্ণের বিকীর্ণ হলুদহরিৎ তাই অনুরণিত হয় আমাদের স্নায়ুর গভীরে। আমাদের মানুষেতর সুদূর অতীতের সঙ্গে যুক্ত এ স্মৃতি অবিস্মরণীয়।'[১]

তাই প্রকৃতির প্রতি আমাদের সহজাত আকর্ষণ শুধু সংস্কৃতি চর্চার ফলই নয়, জৈবিক উত্তরাধিকারও। কিন্তু এ বোধ কোনক্রমেই একমুখীন নয়, বিপ্রতীপ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে তা সদা ক্ষুব্ধ। কারণ, প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধের পাশে তার চেয়েও শক্তিশালী আর একটি বাসনা মানুষের মনে সেই আদিকাল থেকেই অঙ্কুরিত ছিল : এ হলো আত্মপ্রতিষ্ঠার বিদ্রোহ। প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাত ও তাকে পর্যুদস্ত করার এই লক্ষ্য আজ বহুদূর সম্পূর্ণ। অতীতের সেই বিদ্রোহী অঙ্কুর আজ বিকশিত বিশাল মহীরুহে। তবু দ্বন্দ্বের পূর্ণ নিরসন সম্ভব হয় নি। হওয়ার সম্ভাবনাও দুর্লক্ষ্য। সমাজবিবর্তনের ফলে শোষণমূলক সমাজসংস্থানের উদ্ভব সমাজের অভ্যন্তরের দ্বন্দ্বকে প্রকৃতির পরিমণ্ডলেও প্রসারিত করেছে, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ প্রকৃতির নির্বিচার শোষণেও সংক্রমিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি তা তীব্রতর করেছে। কিন্তু ফল শুভ হয় নি। তাই জল-স্থল অন্তরীক্ষের একচ্ছত্র অধীশ্বরের অহঙ্কারে উদ্ধত মানুষ হঠাৎ আবিষ্কার করছে তার ব্যর্থতা ও অসঙ্গতি। 'অণুবিদারণের বিপুল সাফল্যও মানুষকে প্রকৃতির শৃঙ্খল থেকে

মুক্তি দিতে পারে নি। সে আজ বলশালী, তার জ্ঞানান্বেষা সুদূরতর পরিমণ্ডলে প্রসারিত, কিন্তু শক্তি অর্জনে সাফল্যের তুলনায় তার প্রজ্ঞার সম্বল অত্যন্ত দীন।[২]

প্রকৃতির প্রতি আমাদের রোষকষায়িত দৃষ্টি এখন কিছুটা স্নিগ্ধ। যে আক্রোশে মানুষ এতদিন অরণ্য উচ্ছেদে প্রকৃতিকে বিবস্ত্র করেছে, একালের মনে তার সমর্থন নেই। এখন আমরা জানি এ জয় নয়, শোষণ। জ্ঞানের উপরে যেখানে লোভের প্রাধান্য সেখানে হতাশাই অনিবার্য পরিণতি। 'তাই আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিপুল ত্বরণ আর প্রযুক্তিবিদ্যার অন্ধনিয়মের শিকার এই মানুষ আজ তার নিজের সৃষ্ট পৃথিবীতে এক দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক',[৩] প্রাচুর্যের মধ্যে অন্তহীন অভাব, শান্তির প্রয়াসে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের বৃদ্ধি, সুখের সন্ধানে বেদনার অভিজ্ঞতার অসঙ্গতিতে সে এখন অস্থির। জয় ও ব্যর্থতার মধ্যে দোলায়িত তার চেতনা নতুন সত্যদৃষ্টির অপেক্ষায় আজ উন্মুখ।

এ সমস্যা প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি ও সমাজ-সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও মানুষ যেহেতু জীব এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার সংযোগ শুধুমাত্র অর্থনীতিনির্ভর নয় বাস্তব্য-রীতিনিয়ন্ত্রিতও, তাই জীববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত। এর অধুনাতম ধারণা বাস্তব্যচৈতন্য (ecologic consciousness) এ পথে পর্যাপ্ত আলোকপাতে সক্ষম। মানুষ প্রকৃতির অন্যতম শক্তি। ভূমিকম্প, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মত সেও ভূপৃষ্ঠের বহু পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। প্রায় বারো হাজার বছর আগে খাদ্যসংগ্রহ থেকে খাদ্য-উৎপাদনের বৈপ্লবিক উত্তরণ ক্রমান্বয়ে তাকে পৌরসংগঠন, খাদ্যমজুত, বাণিজ্য ও সর্বশেষে শিল্পবিপ্লবের বিপুল সম্ভাবনার ঐশ্বর্য দিয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে তার অনুগত দাসত্বের ভূমিকা শেষ হয়েছে বহু আগেই। সে এই বারো হাজার বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে প্রকৃতির অন্যতম শক্তিরূপে। এই ইতিহাসের সাফল্য কৃষি, শিল্প, গতি, স্বাচ্ছন্দ্য ; এর ব্যর্থতা শোষণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃতির স্বকীয় ভারসাম্যের বিঘ্নজনিত বিকৃতি। জীবমণ্ডলের (biosphere) স্বয়ংসম্পূর্ণতা আধুনিক মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিঘ্নিত হয়েছে। মানবজাতির এই আচরণ শুধু প্রকৃতিকেই নয়, নিজের জৈবধর্মকেও বহুদূর প্রভাবিত করেছে। অবশ্য এ লাভালাভের বিচারে মতানৈক্য স্বাভাবিক। মানুষের পক্ষে ইতর প্রাণীর অনুরূপ প্রকৃতি-আনুগত্য অবাস্তব। তার নিজের বিশেষ দৈহিক সংগঠনের মধ্যে যে-আশ্চর্য সম্ভাবনা উপ্ত ছিল, বর্তমান মানুষ তার অনিবার্য বিকাশেরই ফল। এই অর্থে মানুষ নিজেই তার স্রষ্টা। প্রকৃতিকে নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে সে নিজেকেও পরিবর্তিত করেছে। বলা বাহুল্য, এ পরিবর্তন পরিপার্শ্বে যে দ্রুতিতে সংগঠিত হয়েছে সমাজের ক্ষেত্রে, তার নিজের ক্ষেত্রে এই গতি অব্যাহত থাকে নি। মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মকে যে-আগ্রহে আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছে, নিজের ক্ষেত্রে তার তীব্রতা অটুট রাখে নি। আজ আমরা প্রকৃতির রাজ্যে জীবনকেই জানি সবচেয়ে কম। এই অজ্ঞতার জন্যই প্রকৃতি-পরিবর্তনের সার্বিক কর্মকাণ্ড ত্রুটিমুক্ত হয়নি। এরই পরিণাম বর্তমান সভ্যতার সঙ্কট ও সার্বিক ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। প্রকৃতিকে যথেচ্ছ দোহনের পরিণাম সম্পর্কে যারা একদা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন বর্তমান সঙ্কট পর্যায়ে তাদের যুক্তির পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত। প্রকৃতির যে-সম্পদ আহৃত হয়েছে তার অধিকাংশই বিনিময়ভিত্তিক নয়। খনিজ দ্রব্য, তৈল, গ্যাস এবং গভীর ভূস্তরে

সঞ্চিত শিলীভূত বারি, নষ্টভূমি কোনকালেই আর প্রতিস্থাপিত হবে না। আমাদের সৃষ্ট যেসব রাসায়নিক পদার্থ এখন বায়ু, ভূ ও জলে নিক্ষিপ্ত তা প্রকৃতির স্বাভাবিক আত্তীকরণের রীতিভুক্ত নয়। এগুলি বাড়তি এবং বিপজ্জনক। আণবিক বোমার উন্মাদ প্রতিযোগিতা ও আবহদূষণে মানবপ্রজাতির মারাত্মক কর্মকাণ্ড এর প্রকটতম নিদর্শন। অথচ মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতির নিজের এমন একটি সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মশৃঙ্খলা রয়েছে যার তাৎপর্য যথাযথ অনুধাবন ব্যতীত তার রদবদল আপাতদৃষ্টিতে লাভজনক বিবেচিত হলেও, আখেরে মারাত্মক হতে পারে। স্মর্তব্য যে মধ্যজীবীয় (mesozonic) যুগ থেকে ভূপৃষ্ঠ জৈবভারের (biomass) সামগ্রিক পরিমাণে বিশেষ কোন রদবদল হয়নি। কালক্রমে বহু প্রজাতি, গণ, গোত্রের উদ্ভব ও বিলয় ঘটেছে। কিন্তু জি.জি. সিম্পসন বর্ণিত হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির দেনাশোধের ভার একের পর এক প্রজাতির উপর ক্রমান্বয়ে ন্যস্ত হয়েছে, কখনও থমেনি। জীবনের পরিবর্তন ঘটলেও অব্যাহত রয়েছে জৈবপ্রক্রিয়া।[৪] মানুষের অদূরদর্শিতা ও প্রলোভনস্পৃহায় প্রকৃতির এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য আজ বিঘ্নিত এবং সে নিজেও বিপন্ন হয়েছে এজন্যই।

এ থেকে মুক্তির পথ অবশ্যই প্রকৃতি-প্রত্যাবর্তন নয়। সামনে কোন প্রোজ্জ্বল প্রভাত আপাতত দুর্নিরীক্ষ্য হলেও মানুষ পশ্চাদপসরণের মৃত্যুকে এ-যুগে বরণ করবে না। যে-প্রজ্ঞা মানুষকে চিরদিন সঙ্কট উত্তরণে আনুকূল্য দিয়েছে তা ব্যর্থ হবে না। জীববিদ্যা-চর্চায় ইদানীং পরিলক্ষিত অতিরিক্ত উৎসাহ নিশ্চিত আশারই প্রতিধ্বনি। 'প্রকৃতিকে অনুসরণ ব্যতীত যে তার নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব'[৫] বেকনের এই উক্তির তাৎপর্য একালের গবেষণাকে প্রভাবিত করবে। প্রকৃতির বিঘ্নিত-ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সঠিক ভূমিকা আবিষ্কারেই নিহিত বিধায় এই প্রত্যাশা অসম্ভব নয় যে প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীমূলকস্থিতিতেই (symbiosis) হয়তো শেষাবধি একটা সমাধান মিলবে। তবে এই অপ্রিয় সত্যটি স্বীকার্য যে, সমাজে শোষণ বিদ্যমান থাকলে প্রকৃতির নির্বিচার শোষণও কখনই শেষ হবে না।

মানুষ নিঃসঙ্গ দ্বীপ নয়। পৃথিবীর অজস্র অস্তিত্বপুঞ্জের সে অন্যতম মাত্র। এ সংযোগ আজ আর অনাবিষ্কৃত নেই। জীব-প্রজাতিসমূহের স্বাতন্ত্র্য কোনক্রমেই পরম নয়, মূল প্রাণ-প্রবাহের বহুধা শাখায়ন মাত্র। কোন প্রজাতিই স্থির, স্থিত নয়, সে চঞ্চল ও গতিশীল। তাদের জন্ম ও মৃত্যুর মতো ক্রমবিবর্তনও তাদের জীবনে স্বাভাবিক এবং এখানে তারা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। মানুষ প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান হলেও সে এর ব্যতিক্রম নয়। মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পর্য সম্পর্কিত এ চেতন মানবচিন্তায় তাই কোনকালেই অনুপস্থিত ছিল না। প্রকৃতির অনিয়ন্ত্রিত ধ্বংসে যে মানুষকেও স্পর্শ করবে এ আশঙ্কা অতীতেও বার বার ঘোষিত হয়েছে। 'জীব-ভারসাম্য' (biological balance) রক্ষার জন্যই তাই বনমহোৎসব, বন্যপ্রাণী-রক্ষা, অরণ্য আবাদে বিধিনিষেধ, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারে সতর্কতা ও শহরের কৃত্রিমতায় উদ্যান-সংযোজন। কিন্তু আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় খুবই দীন। যেহেতু বিজ্ঞানীর দায় শুধু আবিষ্কারে, ব্যবহারে নয়, আমাদের প্রযুক্তিবিদ্যা সেজন্য প্রজ্ঞ-নিয়ন্ত্রিত নয়, মুনাফার প্রেষণা-নির্ভর। শিল্পপ্রগতি আজ ভারসাম্যহীন,

বৈরগর্ভ আধুনিক সভ্যতা তাই দেউলে। এর নিরসন এককভাবে সত্যদৃষ্টিতে নিহিত নেই, বাস্তবায়নেই মূলীভূত। স্মর্তব্য এ দায় বিপদগ্রস্ত বিশ্বমানবের।

২.

ভারতীয় উপমহাদেশে উর্বর মাটির প্রসাদগুণে প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভয় ও বিস্ময়বোধ বিদ্রোহ অপেক্ষা সৌম্য ও প্রশান্তিকেই লালন করেছে বেশি। কৃষি-নির্ভর এদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিবিড় প্রকৃতি তাই ভয়াল নয়, বিশাল ও বিস্ময়-স্নিগ্ধ। প্রকৃতি ও মানুষ এ দেশবাসীর ধারণায় একই প্রাণলীলার আধার এবং এজন্য এক ও অবিচ্ছিন্ন। জগতের সীমাহীন বৈচিত্র্যে তাই তাঁরা অনুসন্ধান করেছেন চৈতন্যের ঐক্যসূত্র। প্রতিটি অস্তিত্ব এখানে চেতনার বিপুল তরণে স্পন্দিত। এখানে সুন্দর তাই শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-প্রতিচিত্রিত বাস্তবই নয়, আত্মাবিধৃত পরম সত্যও। জল-স্থল-নিখিলের এই সার্বিক ঐক্যবোধই তাই এদেশীয় দর্শনচিন্তার ভিত্তি। বৃক্ষ-লতা-তৃণ এখানে তরুমাত্র নয়, তারা 'ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি, প্রাণের আনন্দরূপ তাদের শাখায় শাখায়, প্রথম প্রৈতির বন্ধনবিহীন প্রকাশ এর ফুলে ফুলে।'[৬]

এসব ধ্যানধারণার বহুলাংশ মূলত তরুর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতারই বিমূর্ত প্রকাশ। উদ্ভিদের দান অপরিশোধ্য, তাই আমাদের অস্তিত্বে এর ভেদ্যতা এতটা গভীর। এর শুরু যেমন অতীতের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এর শেষও তেমনি দূর ভবিষ্যতে অদৃশ্য। হয়তো এর শেষ নেই। জীবনচক্রের যে দুরতিক্রম্য শৃঙ্খলে প্রাণের অস্তিত্ব, আমরা সেখানেই পরস্পরের সঙ্গে বন্দী। তাই এর বৈকল্য মৃত্যুকীর্ণ। জীবনীশক্তির মূলধাত্রী সূর্যের বিকীর্ণ আলোকণিকা শুধু তরুর যাদুমন্ত্রেই ধরা দেয় শর্করা অণুর জটিল শৃঙ্খলে। আর এতেই লুকানো থাকে জীবজগতের প্রাণ-ভোমরা। বাত্যা ও জলস্রোতের তীক্ষ্ম নখর থেকে ভূমির উর্বরতা রক্ষার দায়ও এই তরুরাজ্যের। যে-অক্সিজেন আমাদের শ্বাসের উপাদান তার যোগানদারও এই উদ্ভিদ। দূর আকাশের মেঘেরা এরই আমন্ত্রণে মাটিতে তাদের স্নেহস্পর্শ রেখে যায়, তাই সিক্তা ধরিত্রী এতো প্রসন্ন। শিল্পপ্রগতির এই উৎকর্ষের দিনেও ঔষধ, বস্ত্র, আসবাবে তরুর অগ্রাধিকার অব্যাহত। জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অজস্র আচার অনুষ্ঠানে প্রসারিত তার অধিকার সীমা। আর যদিও কোনদিন বিজ্ঞান এ নির্ভরতার অবসান ঘটায় তবু তখনও উদ্ভিদ থাকবে সৌন্দর্যের, আনন্দের, প্রশান্তির অম্লান উৎস হয়ে। তাদের এতো বর্ণ, এতো সুষমা কোনকালেই নিঃশেষিত হবে না। নিসর্গের যে-ছবি তরুতে বিধৃত তার প্রতিস্থাপন অসম্ভব। আমাদের জীবনে তরুর ভূমিকা অবিনশ্বর, আর এজন্যই উপমহাদেশের প্রাচীন প্রাজ্ঞরা তরুকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'মানবজাতির মাতৃ-স্বরূপা হে বৃক্ষ স্বাগত।'[৭]

বৃক্ষে প্রাণের অস্তিত্বের ধারণা এই উপমহাদেশে অত্যন্ত প্রাচীন।ক আরণ্যক ঋষি জানতেন, 'প্রথম প্রাণ বৃক্ষের আধারেই তার বেগ নিয়ে এসেছিল এ বিশ্বে'।[৮] 'সেইদিন পশু নেই,

---

ক. 'অন্তঃসঞ্জা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতা'—মনু

পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই। চারিদিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলছে : 'আমি থাকবো, আমি বাঁচবো, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করবো রৌদ্রে-বাদলে দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে প্রান্তরে পর্বতে। তারই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে উঠছে : 'আমি থাকবো, আমি থাকবো।'[৯]

তরুর এ বাণী আমাদের মর্মের গভীরে প্রবিষ্ট। শুধু কাব্য, সাহিত্য, চিত্রকলায়ই নয়, আমাদের জীবনদৃষ্টির বহুদূর অবধিও প্রসারিত এর ছায়া। আমাদের ধর্ম, দর্শন, অধ্যাত্মসাধনাও তাই তরুপ্রভাবিত। কঠোপনিষদের ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা তাই একটি অশ্বত্থ বৃক্ষেরই প্রতিচিত্র।[ক] চর্যাপদের বৌদ্ধগীতিকারও তাই মানবজীবনের রহস্যের সঙ্গে তরুর সৌসাদৃশ্যে এত উৎফুল্ল।[খ] আর এই একই সুরে বাংলার বাউলও এরই প্রতিধ্বনি করেছেন তার উদাসী একতারায় :

'আলেক গাছে ফুল ফুটেছে
যার সৌরভে জগৎ মেতেছে,
আলেক হয় গাছের গোড়া
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা'।[১০]

এজন্যই আমাদের সাধু, সন্ন্যাসী, আউল, বাউল দরবেশ তরুপ্রাণ। বৃক্ষতলই তাঁদের সাধনা ও সিদ্ধির পীঠস্থান। ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তাই অশ্বত্থ বৃক্ষও বোধিদ্রুম। যদিও আজ আমাদের জীবনচিন্তা ভিন্নখাতে প্রবাহিত তবু 'সৌন্দর্যের অন্বেষণ যেহেতু সত্যানুসন্ধান, তাই বৃক্ষ আরাধনা এ যুগেও জীবন-সাধনারই প্রতিবিম্ব এবং নিসর্গচর্চা জীবনদর্শনের অখণ্ড অনুষঙ্গ'।[১১] এখানে সত্য ও সুন্দর অভিন্ন। এই বোধ আমাদের ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার, আমাদের জীবনে এর ভূমিকা এ কালেও উপেক্ষণীয় নয়।

৩.

আমাদের উপমহাদেশে চাষবাদের শুরু নব্যপ্রস্তর যুগে। লৌহযুগের কবরখানায় প্রাপ্ত চীনা ও ধান সেকালের কৃষি-উৎকর্ষেরই প্রতীক। হরপ্পা ও মহেনজোদাড়োর কৃষিপ্রাচুর্যের তুলনা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। যব, গম, চীনা, খেজুর, তরমুজ ও তুলা চাষ তখন বহুব্যাপ্ত। কৃষি-যন্ত্রপাতি এবং কাঠের ব্যবহারও ততদিনে আর অজানা নেই। তাদের নানা আসবাবে ও মুদ্রায় অশ্বত্থ পাতার ছাপাকে তৎকালীন তরুপ্রীতির স্বীকৃতি বলা হয়তো ভুল হবে না। আদিম অরণ্যের প্রতীক এই বনস্পতির পরবর্তীকালীন ব্যাপক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে হয়তো মহেনজোদাড়োর স্মৃতিও যুক্ত। তাদের বাসন-কোসন ও সীলমোহরে অন্য গাছের চিহ্নও কম নেই। এদের অনেকেই আমাদের একেবারেই অপরিচিত, হয়তো চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির ত্রুটি কিংবা শিল্পীর বিমূর্ত প্রয়াসই কারণ। যাদের চেহারা স্পষ্ট তাদের মধ্যে খেজুর, চীনা, বাবলা ও ঝাণ্ডিই প্রধান।

ক. ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।

খ. 'কআ তরুবর পঞ্চবি ডাল'—লুইপাদ।

পরবর্তীকালে যাযাবর আর্যদের অসংস্কৃত রোষেই যদি এ-সভ্যতা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে থাকে তবে বলতে হয় শেষ অবধি আগন্তুকদেরও পরাভব ঘটেছিল এদেশেরই সর্বগ্রাসী সভ্যতার কাছে। কৃষি-নির্ভরতায় তারাও যুক্ত হলো এদেশের অতীতের সঙ্গে, তথাকথিত অনার্য ঐতিহ্য বিকশিত হলো আর্যদেরই চিন্তায়, কর্মে, সাধনায়। যে উর্বর আবেষ্টনীতে আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের চেতনা লালিত হয়েছে, তার অব্যাহত গতি রুদ্ধ হয় নি কোনোকালে। রক্ত ও ঐতিহ্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও উপমহাদেশের নবাগত সকল জাতির মিশ্র-প্রতিক্রিয়াজাত সংশ্লেষ আমাদের শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য ও দর্শনে সত্য হয়ে আছে।

নদীবিধৌত উর্বর মাটির এই দেশে প্রকৃতি অকৃপণা। তার নিসর্গ, আবহাওয়া, আর অর্থনীতি এর মানুষকে স্থৈর্য ও আবেগে সমৃদ্ধ করেছে। তাই এ আবেষ্টনীর সব কিছুতেই ক্ষরিত উৎসাহ, উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা। এজন্যই মহেনজোদাড়োর এতো বৈচিত্র্য। এর 'ছাগল, মাছ, গরু, পাখি, কাঁকড়া-বিছে, ময়ূর, সুন্দর গাছপালা, প্রকৃতির মাঝখানে প্রাণীর মেলা, একটি গাছ, অজস্র তার ডাল, তলায় হরিণ ... ফণাতোলা গোখরো, কর্মরত মানুষ'[১২] যেন অজন্তার প্রাচীরচিত্র কিংবা মোগল চিত্রের নিসর্গ-দৃশ্যের বিক্ষিপ্ত উপাদান। পরিপার্শ্ব সম্পর্কে যে-দেশের মানুষের চেতনা এতো প্রখর, প্রকৃতির সুন্দরতম অনুষঙ্গ গাছপালায় তার আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। একমাত্র কালিদাসের কাব্যেই অর্ধশতাধিক গাছের উল্লেখ আছে। খর্জুর, চন্দন, পাটল (পারুল, *Bignonia suaveolens*) জবা, জম্বু (জাম), তমাল, তালী (তাল), তিলক (তিল) দূর্বা, দেবদারু (দেওদার), অগরু (*Acquilaria agolocha*), দ্রাক্ষা, নবমল্লিকা, নমেরু (রুদ্রাক্ষ), মান্দার, পূগ (সুপারি), প্রিয়ঙ্গু (শ্যামালতা), প্রিয়াল (পিয়াল *Buchanania latifolia*), কাকলি (অশোক), পুন্নাগ (*Callophyllum inophyllum*), কদম্ব, কদলী, কন্দলী (ভুঁইচাঁপা), কর্ণিকার (সোঁদাল), কল্পদ্রুম (মান্দার?), শালুক, কুরুবক (জয়ন্তী), পারিজাত (মান্দার), কেতকী (কেয়া), কেশর (নাগেশ্বর), তীরনলিনী (স্থলপদ্ম), ভূর্জবৃক্ষ (*Betula alnoides*), মাধবী, মালতী, কুর্চি, যুথিকা, জাতি, বেতস (বেত), শমী (*Acacia suma*), শল্লকী (বাবলা), শিরীষ, সপ্তপর্ণী (ছাতিম), লোধ্র (*Symplocos racemosa*), কিংশুক (পলাশ) প্রভৃতির অজস্র উল্লেখ তৎকালীন কবিকুলের তরুচেতনার সাক্ষ্যবহ।[১৩] পদ্ম ভারত উপমহাদেশের অন্যতম প্রিয় ফুল। চিত্রে ও ভাস্কর্যে বহুল ব্যবহারেই শুধু নয়, পদ্মের একাধিক নামকরণেও তাদের নান্দনিক বোধ প্রকট। 'শ্বেতপদ্মের নাম পুণ্ডরীক ও অরিন্দম, লালপদ্ম কোকনদ, নীলপদ্ম কুবলয় ও ইন্দীবর।'[১৪] সে যুগের মালবিকা নিপুণিকাদের জন্য উপবন রচিত হতো দূর বেত্রবতী নদীতীরে, অশোক, শিরীষ, নবমল্লিকা, শিংশপা (শিশু) ও আমলকীর ছায়াঘন নিকুঞ্জে। সেদিন ফুলই ছিল অংগরাগ ও অলঙ্করণের প্রিয়তম সামগ্রী। তাই কালিদাস লিখেছেন :

'করপুটে লীলাকমল যাদের
কালকেশে গাঁথা কুন্দকলি
লোধ্র পরাগ স্মিত মুখে যেথা
পাণ্ডুকান্তি দিয়েছে রচি,

অলক চূড়ায় নবকুরুবক
চারু দুটি কানে শিরীষ দুল
দোলে বধূদের সীমন্তমূলে
তোমারই ফুটানো কদম ফুল।'[১৫]

ঐতিহ্যের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে আমাদের বৈষ্ণবকাব্যে, লোকগীতিকায় এবং রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, জসীমউদ্দীনের কাব্য-কল্পনায়। বৈষ্ণব কবিতার ফুলেরা বর্ণে, গন্ধে অনুজ্জ্বল নয়। তাদের প্রিয় ফুল চম্পক, শিরীষ, থলকমল (স্থলপদ্ম), কেশর, কাঞ্চন, কিংশুক, লবঙ্গ। বাংলার লোককাব্যেও প্রকৃতির বর্ণিল উচ্ছলতার নজীর বহু। মৈমনসিংহ গীতিকায় তরু-লতার ঘাটতি নেই। এই কবিদের প্রিয় গাছ কনকচাম্পা, নাগেশ্বর, মালতী, কেয়া, বকুলের সঙ্গে ব্রাত্য তেলাকুচাও বিশেষ সমাদৃত।[ঘ] রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে জীবনানন্দের রোমান্টিক বিষণ্ণতা আর জসীমউদ্দিণের গ্রামীণ সারল্য স্বভাবতই বহুলাংশে তরুলগ্ন। 'নরম শরতে ঝরে পড়া হলুদ বোঁটা শেফালীতে মৃত্যুর ঘোর' একান্তই জীবনানন্দের। জসীমউদ্দীনের কাব্যচেতনার প্রতীক মেঠো কলমী, গ্রামবধূর শুভ্র হাসির মতো এই ফুল সরল, অনাদৃত তবু দুর্মর। অত:পর আমাদের কাব্যধারায় প্রকৃতি ও তরুলতা প্রায় অনুপস্থিত। বিমূর্তনের এ-যুগে, প্রতিকাশ্রয়ী প্রকাশের গতি রঞ্জন-রশ্মির মত অন্তর্ভেদী হলেও তাতে দূর আকাশে বিস্ফুরিত রামধনুর সপ্তবর্ণের ঐশ্বর্য নেই। কাব্য থেকে তরুর এই বিদায় কি অনিবার্য ছিল?

আমাদের প্রবাদ ও প্রবচনে তরুলতার বহু কৌশলী উল্লেখ লক্ষ্যণীয়।[ঙ] উৎসব-আয়োজন, আচার-আচরণ, সংস্কারেও এর প্রভাব কম নয়। বাঙালী নারীদেরও অঙ্গরাগে উদ্ভিদের ভূমিকা একদা ন্যূন ছিল না। নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপি ও কেশব সেনের ইদিলপুর লিপি এর সাক্ষী। গলায় 'সুগন্ধী ফুলের মালা, চুলে তিলপাতা, কানে রিটাফুল কিংবা তালপাতার অলঙ্কার, হাতে পদ্মডাঁটার বালা প্রাচীন বাঙালী নারীর প্রিয় ভূষণ'।[১৬]

আজ অবশ্য সেকালের এসব সামগ্রীর সমাদর ততটা নেই। আমাদের রুচি থেকে আজ উদ্ভিদ বহুলাংশে বর্জিত। ফুলরেণুতে পাউডার-স্নো অপসৃত হবে না জানি, কিন্তু চুলে, কানে, গলায় হাড়-প্লাষ্টিক-পুতির সঙ্গে ফুল কি খুবই বেমানান হতো? একই যান্ত্রিক রুচির প্রতিফলন আমাদের জীবনধারায় বহুক্ষেত্রে লক্ষণীয়। আধুনিক যুগের বৈঠকখানা প্রাণহীন বস্তুসম্ভারে আকীর্ণ একটি স্বল্পায়তন যাদুঘর হয়ে উঠেছে। এই রুচি-বিবর্তনকে শিল্পপ্রগতির ফলশ্রুতি না বলে অনুকরণ বলাই ভাল। এতে আমাদের ঐতিহ্যের ভূমিকা অনুপস্থিত। শিক্ষিত বাঙালী আজ কায়িক শ্রমে অনীহ। এবং সেটাই অনেকাংশে প্রকৃতির

ঘ. চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল
সিন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠুঁট তেলাকুচা ফল।

ঙ. হরিহরি বিন্না তিরিতিরি পাত
বাড়ির বিন্না চব্বিশ হাত।
অথবা
উঠান ঠন ঠন বৈঠক খাটি
যে গর্ভবতী পুতে ধরে ছাতি ... সুপারী

সঙ্গে আমাদের জীবনের বিচ্ছেদ প্রশস্ততর করেছে। তাই স্বাভাবিকের চেয়ে কৃত্রিমের প্রতিই আমাদের আকর্ষণ আজ অধিকতর।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার উপযোগী পরিবেশ হয়তো আমাদের শহরজীবনে আর অবশিষ্ট নেই; কিন্তু আমাদের সীমিত অঙ্গনে এবং নাগরিক উদ্যানে এর আংশিক চর্চা বোধ হয় সম্ভব। এই যুগের মানুষ ছায়াছবি ও খেলাধূলার কুশীলব সম্পর্কে যতটা আগ্রহী গাছপালা, পশুপক্ষী সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ সেই পরিমাণে ক্ষীণ। এ স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। সুস্থ দেহ-মনের পক্ষে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ জরুরী। শুধু আমাদের নয় পাশ্চাত্যেও সমস্যাটি সুপ্রকট। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও থুরোর ম্লান জনপ্রিয়তা এবং ইদানীংকালের তরুণদের বর্ধমান প্রকৃতি-ঔদাসীন্যে এই স্বীকৃতি মিলবে। এ-মনোভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার সঙ্কট, মানবমনে তার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রচারসহ কাব্যে, সাহিত্যে, গল্পে, ছবিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তরুসম্পর্কিত অধুনা-বিস্মৃত প্রতীকসমূহের পুনঃস্মরণ প্রয়োজন। প্রাচীন গ্রিস, ভারত, চীন, জাপান, পারস্য, মিসরের মন্দির, গুহা ও মনুমেন্টের খোদাই ও চিত্র থেকে শুরু করে বিশ্বসাহিত্যের বিপুল পরিসরে এই উপকরণসমূহ বিক্ষিপ্ত। যন্ত্রণাদগ্ধ বিশ্বে ফুল আনন্দ ও প্রেমের অম্লান উৎস। লিলির হলুদ পরাগ হলো কৌমার্যের, পদ্ম সৃষ্টি ও স্থিতির, সাদাফুল পবিত্রতার, নীল রং আনুগত্যের, গোলাপ প্রেমের, ডেইজী সূর্যের, ঘাস প্রয়োজন ও প্রাচুর্যের, পপি বিস্মৃতির, ঘৃতকুমারী দুঃখ ও বেদনার, আইভি স্থৈর্যের, দোপাটি অস্থিরতার প্রতীক।[১৭] স্থান-কালে অবশ্য এসব প্রতীকের অর্থ এক থাকে নি। যেমন গোলাপ দূরপ্রাচ্যে সদগুণ, মিসরে নৈঃশব্দ, রোমে উচ্ছলতা এবং অন্যান্য বহুদেশে প্রেমের অভিজ্ঞান। তাছাড়া তো শিল্পীর স্বাধীনতা রয়েছেই।[৮] একসময় তুর্কী হারেমে বার্তাপ্রেরণে পুষ্পলিপির (floriography) ব্যাপক প্রচলন ছিল। গ্রীসে ব্যক্তিক আবেগ-অনুরাগের আদান-প্রদান ছাড়াও ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ও জাতীয় ক্রীড়া প্রভৃতিতেও পুষ্পলিপির প্রসার ঘটেছিল। আরবে প্রতিটি বৃক্ষই একটি বিশিষ্ট গুণের প্রতীক। হিন্দুদের কাছে বেলপাতার তিনটি পত্রিকা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কিংবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের স্মারণিক। তরুর শ্রেণীবিন্যাসে ক্রুসীফেরী গোত্র ক্রুশের নামাঙ্কিত। যে-ঐতিহ্য সভ্যতার এত গভীরে প্রবিষ্ট তার উৎসাধন স্পষ্টতই বৈনাশিক। উৎকট যান্ত্রিকতার প্রচারে আজ যখন অনেকেই উচ্চকণ্ঠ, স্বস্তির আকাঙ্ক্ষা যখন মরীচিকার চক্রান্তে বন্দী, তখন প্রকৃতির পুনরান্বেষণেই হয়তো মিলবে এই আত্মিক যন্ত্রণার দাওয়াই। আর প্রাচ্যমানসের অনাক্রম্য সুস্থিতির উত্তরাধিকারের দৌলতে আমাদের পক্ষে এই সঙ্কট উত্তরণ পাশ্চাত্য অপেক্ষা সহজতর হতে পারে। বলাবাহুল্য এ প্রয়াসে তরুর ভূমিকা অবশ্যই থাকবে।

---

৮. Ophelia :There is Rosemary. that's for rememberance :
Pray you love. remember : and there is Pensie. that's for thought.
--Hamlet

৪.

এই উপমহাদেশে সূর্য যেখানে নিষ্করুণ রুদ্র, শৈত্য সেখানে শুধু একটি জৈবিক সংবেদনই নয় জীবনের জন্য তাৎপর্যশীল একটি প্রতীকও। আমাদের কাছে শীতলতা শান্তির অনুষঙ্গ এবং তা ছায়া ও জলবিধৃত। তাই দাহতপ্ত তৃষিতের জন্য জলসত্র প্রতিষ্ঠা, পুকুর খনন ও ছায়াতরু রোপণ এদেশে নাগরিক আদর্শ তথা ধর্মীয় প্রত্যয়ও। আমাদের এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে অশোক-শেরশাহসহ অজস্র নাম যুক্ত এবং ধারাটি এ-যুগে ক্ষীণতর হলেও একেবারে বিশুষ্ক নয়।

উর্বর মাটি, অকৃপণ সূর্যালোক এবং অবিরল বৃষ্টির প্রসাদে বাংলাদেশ অরণ্যপ্রবণ নদী ও বন তাপ-প্রশমনে স্বভাবই ফলপ্রসূ বিধায় গ্রীষ্ম এখানে অসহ্য নয়। চিরহরিৎ এই তরুরাজ্যে শীতের প্রকোপও প্রকট নয়। বরং শীত এদেশে প্রাচুর্যের, বিশ্রামের ঋতু। পরিবেশের তাগিদজাত প্রকৃতিচর্চা এদেশে কোনদিনই প্রভাব ফেলে নি। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, আচার-আচরণ, কাব্যচর্চার ওপারে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে তেমন প্রয়াস এখানে অনুপস্থিত ছিলো। আর বাঙালির স্থাপত্য উল্লেখ্য পর্যায়ে ব্যাপ্ত হয় নি বলে তার অনুষঙ্গ উদ্যানবিদ্যাও স্বাভাবিক কারণেই অকর্ষিত, উষর রয়ে গেছে। এ দৈন্যের কারণ বাংলার নম্র, সর্বংসহা প্রকৃতি। জীবনের আন্দোলন, অস্তিত্বের আশঙ্কা এখানে প্রবল নয়। নদীর এপার ভাঙলেও ওপার গড়ার অশ্বাস এখানে নিশ্চিত। এদেশে অযত্নে ফসল ফলে। তাই ভাবপ্রবণ বাঙালি বিসূয়কর বিপুল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনীহ। স্বল্পেই তার সুখ, তার তুষ্টি। বাংলার মাটির ঘরই যেন তার অচলায়তন, অন্তর্মুখ জীবনচেতনার সার্থক প্রতীক। এর অঙ্গনেই তার পৃথিবী সীমাবদ্ধ, তার অন্বেষা অবসিত। কিন্তু এই উপমহাদেশের উত্তরাংশের নিসর্গ ভিন্নতর, তার দাবীও নিদারুণ রূঢ়। জীবন ওখানে ঋতু-বিবর্তনের নরম আন্দোলনে লালিত নয়, সংগ্রাম-সঙ্কুল। গ্রীষ্ম সেখানে প্রখর, শীত কঠোর, প্রকৃতি কৃপণ। পরিপার্শ্বের প্রতি মনোসংযোগে ঐ অঞ্চলের মানুষ বাধ্য। তাই তরু সেখানে উপভোগের সামগ্রীই নয়, জীবনের মৌল অবলম্বনও, এবং এজন্য তরুচর্চা বহুধা শাখায়নে ওদেশে সমৃদ্ধ।

সংস্কৃত কাব্যে তপোবনের বহুল উল্লেখ সহজদৃষ্ট। তপোবনের বর্ণনা থেকে মনে হয় এগুলো ঠিক অরণ্য-বাটিকা নয়, সুরোপিত উদ্যানেরই প্রাথমিক রূপ। নির্জনে অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য এ ব্যবস্থা এদেশের একক বৈশিষ্ট্য নয়, গ্রিসেও এর প্রচলন ছিল। হোমারের মহাকাব্যে এমন উল্লেখ আছে। দূরত্বের বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও দু'দেশের উদ্যানের উৎসমূল আরণ্যক তপোবন। ঋগ্বেদে উদ্যান তৈরি ও সংরক্ষণ পুণ্যকর্ম হিসেবে চিহ্নিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎসায়নের কামসূত্রে উদ্যানের বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান। রামায়ণের অশোক-বন এবং অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যের মালাকার-মালিনীরা সে-যুগের উদ্যানচেতনার সাক্ষ্য। বৌদ্ধমানস স্বভাবতই উদ্যানুরাগী। বৌদ্ধদের নির্মিত 'আরাম' ও 'বন' এবং তক্ষশীলার তৎকালীন ভেষজোদ্যান প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

এ উপমহাদেশে উদ্যানশিল্পের প্রথম মহাপরিকল্পনা মোগলদেরই কীর্তি। এই উদ্যানধারার উৎস পারস্য। সেই কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রসারিত শাখাগুলোরই একটি আমাদের মোগল উদ্যান। আরেকটি ধারা আফ্রিকার দুর্গমতা অতিক্রম করে মুরদের

সযত্ন-লালনে স্পেনে পৌঁছে এবং পরবর্তী নির্মম ধ্বংসেও মারিয়া পার্কে সেই মুরস্মৃতি এখনো টিকে আছে।

বৌদ্ধ শ্রমণ ও পর্যটকদের তীর্থ-পরিক্রমায় ভারত ও পারস্যের সংগে চৈনিক উদ্যানের লেনদেন ঘটা সম্ভব। চৈনিক উদ্যান জাপানে যে উদ্যান-শিল্পরীতির জন্ম দিয়েছে তার বৈশিষ্ট্য আজ বিশ্বস্বীকৃত। জাপানী পদ্ধতির উদ্যান ও নিসর্গ পরিকল্পনা একটি অনন্য শিল্পকর্ম। আর্থার কোয়েস্‌লারের মতে জাপানী শিল্পরীতির মূলে বিদ্যমান রোমান্টিক-বিষণ্ণতা তাদের উদ্যান পরিকল্পনায়ও প্রভাব ফেলে। ওদেশের দুর্বল ভূ-পৃষ্ঠ, ভূমিকম্প এবং আনুষঙ্গিক অস্থিরতায় জাপানী মানস চিরক্ষুব্ধ এবং এই ক্রোধের বিমূর্ত শিল্পরূপই বালু-উদ্যান, বিকলাঙ্গ গাছপালা ও বনসাই পদ্ধতি।[১৮]

মোগল উদ্যানের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এদেশে পরবর্তীকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিবর্তিত হয় নি। আমাদের অবহেলায় একটি আশ্চর্য সম্ভাবনা বিলুপ্ত হলো। স্টুয়ার্টের[১৯] মতে, মোগল উদ্যানের অবলুপ্তির কারণ দু'টি : প্রথমত গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে অব্যাহতি যে-পরিকল্পনার লক্ষ্য, যানবাহনের উন্নতি, ভ্রমণশিল্পের প্রসার ও শৈলাবাসের জনপ্রিয়তায় তার গুরুত্বহানি অনিবার্য। বিপুল অর্থব্যয়ে উদ্যান তৈরি অপেক্ষা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে নাতিশীতোষ্ণ পর্বতে গ্রীষ্মাবকাশ কাটানো অনেক বেশি উপভোগ্য। বিত্তশালীদের রুচির এই পরিবর্তনই মোগল উদ্যানের বিপর্যয় ঘটিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ উদ্যানশিল্প শিল্প বিধায় স্বভাবতই স্থান-কাল-প্রভাবের অধীন। রীতিবদ্ধ (formal) শিল্প-পরিকল্পনা পাশ্চাত্যে বর্জিত হলে তার তরঙ্গ আমাদের দেশকেও স্পর্শ করেছিল। পরবর্তীকালে প্রাচীনগন্ধী এ-শিল্পরীতি থেকে প্রেরণা সংগ্রহে তাই আমরা ঔদাসীন্য দেখিয়েছি।

অবশ্য শুধু উদ্যানশিল্পই নয়, ঐতিহ্য সম্পর্কে এক সার্বিক অনীহা পরাধীনতার যুগে সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। শোষণমূলক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ঝড়োহাওয়া-লুণ্ঠিত ঊষর এই দেশে স্থানীয় বা বৈদেশিক কোন সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশই তখন অসম্ভব ছিল। বিদেশী শক্তির বিশেষ স্বার্থে এদেশে পাশ্চাত্য চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার আমদানীকৃত বীজগুলি বাস্তব্য-প্রতিকূলতায় কাচঘরে (green house) বাহিরে উন্মুক্ত উদার প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত, পল্লবিত হয় নি। এদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগের যা সাফল্য তার সার্থক তুলনা জোড়কলম (graft), উর্বর সঙ্কর (fertile hybrid) নয়। এ-ধরনের কলম টিকে থাকে, কিন্তু তার না আছে প্রসার, না বিকাশ ; চারিত্র্য-ধর্ম অটুট রাখাই তার সাফল্য এবং এটুকুই চাষীর লাভ। কিন্তু সার্থক সঙ্কর অনন্ত সম্ভবনাশীল, তার মিশ্রণ শুধু দেহে নয়, অস্তিত্বের গভীরতর গভীরে এবং অভিযোজনা ও অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কলম অপেক্ষা সে বহুগুণ বেশি সফল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের প্রাচ্য-ঐতিহ্যে আত্তীভূত হয় নি বলেই ব্যর্থ-সঙ্করের অবশম্ভাবী বিষ্টব্ধ পরিণতি।

আমাদের আধুনিক উদ্যানশিল্পীর দায় ও দায়িত্ব অসীম। বিদেশের সর্বোৎকৃষ্ট ফসলের সঙ্গে আপন ঐতিহ্যের সঙ্করণ এবং দেশের উর্বর মাটিতে এর আবাদের দায়িত্ব তাদের। আমরা যেন ভুলে না যাই একটি সুষম সাংস্কৃতিক সংশ্লেষ ব্যতীত আমাদের স্বাধীনতা অপূর্ণ, স্বাতন্ত্র্য অর্থহীন

২.
ভারত উপমহাদেশের অভিজাত উদ্যান-পরিকল্পনার গৌরব মোগলদের এবং তাদের স্থাপত্যের অনুষঙ্গ হিসাবে তা বিকশিত। উৎসভূমি পারস্যের প্রভাব এতে অত্যন্ত স্পষ্ট বিধায় মোগল-উদ্যানের আলোচনায় ওই অঞ্চলের পরিবেশ ও ঐতিহ্যের কিছুটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রচণ্ড তাপ ও শৈত্যে পারস্যের পর্বসঙ্কুল উপত্যকার বিবর্ণ রিক্ততা প্রায় বর্ষব্যাপ্ত দীর্ঘ। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী বসন্তে বর্ণ ও বৈচিত্র্যের প্লাবনে এ দৈন্য মুছে যায়। বরফ গলার শুরুতেই মৃদু বর্ণের ছোঁয়া লাগে গভীর-ঘন সাইপ্রেস অরণ্যে বিক্ষিপ্ত ফুলের গাছে গাছে। তারপর গোলাপী প্রস্ফুটন দেখা দেয় বাদাম ও এপ্রিকটের গাছে। ধীরে ধীরে মাটির বুক ফুঁড়ে মাথা তোলে নার্সিসাস, হায়াসিন্‌থাস, আইরিস ও কার্নেশন কুঁড়িরা, ফোটে লাইলাক, জেসমিন। রামধনুতে ঢেকে যায় পারস্যের মাঠ-ঘাট, বনপ্রান্তর। আর সবার শেষে ফোটে ফুলের রানী গোলাপ। বর্ণ গন্ধে তুলনাহীনা। বিশাল ঝাড়ে ঝোপে গোলাপী, লাল, সাদা ও হলুদ গোলাপের এই উচ্ছ্বসিত প্রস্ফুটনের তুলনা পরীর দেশকেও হার মানায়। তাই এ অঞ্চলের মানুষ অন্য কোন দেশের নিসর্গে তৃপ্ত হয় না। এজন্যই হিন্দুস্তানের অঢেল সোনারূপায় সম্রাট বাবর তৃপ্ত হন নি। অনুক্ষণ মনে পড়তো কাবুলে তাঁর বাগান কখন বসন্তে লাল-হলুদ আর্গানে ঢেকে গেছে, ডালিম দুলছে ডালে ডালে। তিনি এর তুলনা খুঁজে পান নি পৃথিবীর আর কোন দেশে।

মধ্য-এশিয়ার রিক্ত প্রকৃতির আকস্মিক বাসন্তী উচ্ছ্বাসে রাঙা ওদেশের মানুষের মন। স্বল্পায়ু এই সৌন্দর্যের আক্ষেপে তাদের কাব্য তাই বাঙময়। হাফিজ, ওমর খৈয়াম ও সাদীর কাব্য-সাধনা ও জীবন-দর্শনে অস্থির প্রকৃতির প্রভাব স্পষ্ট। গোলাপ, গুলিস্তান ও বুলবুল তাদের প্রিয় কাব্যপ্রতীক। বিদায়ী বসন্তের জন্য তাদের তাই অন্তহীন বেদনা। এই অস্থায়িত্বের জন্যই সুখাবদীদর্শনে তাদের আস্থা। শুধু নিসর্গই নয়, নিজেদের ধর্মীয় অনুপ্রেরণাও উদ্যানশিল্পে প্রভাব ফেলেছিল। ইসলামে উদ্যান ও ফুল সর্বাদৃত২। বেহেস্ত-বাগিচার কল্পনাও পারস্যের উদ্যানকে প্রভাবিত করে থাকবে। তাছাড়া শিল্পচর্চার অন্যরীতি তৎকালে ধর্মানুমোদিত না থাকায় শিল্পীমনা পারসিকদের সমস্ত উদ্যম ও নৈপুণ্য উদ্যান-চর্চায়ই ব্যয়িত হয়েছে। পারস্যের এ শিল্প বিকাশের এগুলোই কারণ। বর্ণ ও তাপমুক্তি উদ্যানের মৌল লক্ষ্য বিধায় তা জলসেচকেন্দ্রিক। পারস্য-উদ্যান জলধারার শৈল্পিক সংস্থানে বিশিষ্ট। নীলটাইল বাঁধানো খালের মর্মরিত জলধারায় প্রতিফলিত সাইপ্রেসের ছায়া আকাশের রঙকে হার মানাতো। যে-বর্ণ এতো আশ্চর্য অথচ স্বল্পস্থায়ী তাকে ধরে রাখার উৎকণ্ঠা এই শিল্পে প্রকট। উদ্যানে গোলাপ ছাড়াও বকুলা, প্লেইন ও উইলোর প্রাচুর্যও কম ছিল না।

বাবরই মুখ্যত এই উপমহাদেশে মোগল উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা। শুধু যোদ্ধাই নন, তিনি শিল্পস্রষ্টাও। উদ্যান-চর্চায় তাঁর উৎসাহ বিশ্বখ্যাত। এদেশে প্রথম উদ্যানের বহু

২. জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি,
দুটি যদি জোটে তার একটিতে
ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।

পরিকল্পনা তাঁর নিজের। তাঁর কথায়, 'আমি যে-সমস্ত উদ্যান ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছি তাহাতে সমতা রক্ষার কোন ত্রুটি রাখি নাই। প্রত্যেক কোণে সুসমঞ্জস উদ্যান তৈরী করিয়াছি এবং তাহাতে নির্ভুল সৌষম্যে গোলাপ ও নার্সিসাস লাগাইয়াছি।[২০]

এদেশে বাবর ও তাঁর নিকটতম উত্তরসুরীদের উদ্যান পারস্য-রীতিরই অবিকল অনুকৃতি : সেই জলধারার বিচিত্র বিন্যাস, শৈত্য ছায়া ও বর্ণের প্রাচুর্য, পাথর কিংবা ইঁট বাঁধানো খালে স্তরে স্তরে লাফিয়ে পড়া জলের কলধ্বনি, উচ্ছ্বসিত ঝর্নার মর্মর, সাদা ফেনার শুভ্র উদ্ভাস, প্রশস্ত জলাশয়ের ফোয়ারা-উৎকীর্ণ আর্দ্রতার মাঝখানে কালো পাথরের মঞ্চ, খালপারের গোলাপ ঝোপ, দেয়ালের পাশে সাইপ্রেস ও প্লেইন গাছের ঘননীল বেষ্টনী, ছায়াঘন বীথিকা, জ্যামিতিক ছককাটা তৃণাঙ্গন—কার্পেটের মত ঘাসের সবুজে নরম , উন্মুক্ত অথবা ফল-তরুতে আচ্ছন্ন, খোলা জমির কোণে কিংবা মাঝখানে একটি চিনার বা আম গাছ, উঁচু করে তলায় বাঁধানো বেদী, এসবই দুরন্ত দুপুরের দুঃসহ তাপ থেকে মুক্তির, বিবর্ণ রিক্ততা থেকে প্রোজ্জ্বল বর্ণের ঐশ্বর্যে উত্তরণের প্রয়াস ; এখানেই আলাপ, আলোচনা, সংগীত, ফারসী কাব্যচর্চা ও বিশ্রাম ; মোগলদের মজ্জাগত উপভোগস্পৃহার এ এক অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি।

ই. বি. হ্যাভেলের ধারণা মোগলের শিল্পরীতি আসলে প্রকৃতিপ্রীতি কিংবা শিল্পপ্রীতি থেকে উৎপন্ন নয়, এর মূল প্রেরণা শিল্পসর্বস্বতা এবং ভারতবর্ষে তা একেবারেই নতুন। এ ধারণা অবশ্য তর্কসাপেক্ষ। সি. এম. ভি. স্টুয়ার্টের মত এ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য । প্রাচ্যবাগের সঙ্গে ইউরোপীয় উদ্যানের তুলনায় তিনি বলেছেন, 'ওদেশে যেখানে উদ্যান ভোগ-প্রেরণার প্রতীক, এদেশে তা ইতিহাস, শৈল্পিক-ঐতিহ্য ও ধর্মবোধের সমন্বয়ের ফল।[২১] যাই হোক, হিন্দু-সংস্কৃতির অবক্ষয়ের দিনে মোগলরাই এদেশের শিল্পে নবপর্যায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন।

মোগল-উদ্যান রীতিনিষ্ঠ। এগুলি বর্গক্ষেত্র কিংবা আয়তক্ষেত্র। বাগানের অভ্যন্তরীণ ভাগ-বিভাগেও এই একই রীতি । চারদিকে সুরম্য প্রাচীর, দুই কিংবা চারটি বিশাল তোরণ, রঙিন মার্বেল, আলো ও জলের প্রাচুর্যই প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাগানের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রসমূহও দুই কিংবা চারটি ফটকে প্রান্তিক পথের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি ক্ষেত্রে একই ধরনের ফুল কিংবা ফলের গাছ, অবশ্য মিশ্ররোপণও অনুপস্থিত ছিল না। তৎকালীন রাজপুত-উদ্যানকে হিন্দু উদ্যানের নমুনা হিসেবে ধরলে সৌন্দর্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও এ কথা বলা যায় যে, রাজপুত উদ্যান যেখানে আন্তঃপৌরিক, মোগল-উদ্যান সেখানে নাগরিক। বিশালতায় তা আধুনিক পার্কের সঙ্গে তুলনীয়। তাই হ্যাভেল বলেন, 'ভারতের শিল্প-ইতিহাসে মোগলদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান প্রশস্ত রীতিনিষ্ঠ উদ্যান।' [২২]

দেশান্তরিত শিল্পরীতির সার্থক বিকাশের পক্ষে স্থানীয় মাটির সঙ্গে তার দৃঢ়সংযোগ অপরিহার্য। মোগল স্থাপত্যের মধ্যএশীয় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বহুলাংশে তা ভারতবর্ষীয়। সংযোগ ও মিশ্রণ জীবনের অব্যাহত গতির অন্যতম মৌল শর্ত বিধায় শিল্পেও প্রযোজ্য। তাই এ দেশের মোগল-উদ্যানেও ক্রমেই স্থানীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে এবং মিশ্রণ ঘটেছে পরোক্ষ সূত্রে। মোগলরা স্বভাবতই তাঁদের প্রিয় মধ্যএশীয় গাছপালা এদেশে রোপণ করেছেন। কিন্তু সাইপ্রেস, প্লেইন, চিনার, টিউলিপ, গোলাপ, ভায়লেট, নার্সিসাস, পিচ, ডালিম, আইরিস, এ্যানিমুন ও আপেলের সঙ্গে তাঁরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন এদেশীয়

সুদৃশ্য ফার, চিরসবুজ আম এবং অন্যান্য রূপসী তরু। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাজপুতদের 'চাঁদনীবাগের' (moonlit garden) সঙ্গে মোগলবাগের সংযোগ এবং তাতে মোগল হারেমের রাজপুতানী বেগমদের অবদান ছিল।

চাঁদনীবাগ কিন্তু মোগলের 'সুরুজবাগের' (sunlit garden) অনুগ নয়। এ স্থানীয় এবং তা তার সমাজ, সংস্কার ও ধর্মবোধ-নিয়ন্ত্রিত। এখানে জীবনের উত্তেজনা, রস-পিপাসা ও উপভোগ-স্পৃহা স্তিমিত, এবং শুভ্র নিরাভরণ সজ্জা বৈরাগ্যমুখর। এই উদ্যানের ফুলের রঙ সাদা, পথের রঙ সাদা এবং ঝর্ণা রঙহীন। গাছ এখানে গাঢ় সবুজ, গন্ধ অঢেল। এ ধরনের পরিকল্পনার অন্যতম কারণ রাজপুত নারীরা কেবল রাতেই উদ্যানে আসতেন। অন্ধকারে অন্য সব রঙই অস্পষ্ট বিধায় এখানে সাদারই একাধিপত্য। এসব ফুলের অধিকাংশই নিশিগন্ধা। অবশ্য পরবর্তীকালে এসব উদ্যানেও বর্ণবৈচিত্র্য সংযোজিত হয়েছে এবং মোগলেরই প্রভাবে।

এ উপমহাদেশে মোগল উদ্যানের সংখ্যা বহু। আগ্রায় বাবরের উদ্যান, শাজাহানের আঙ্গুরীবাগ ও তাজমহল-উদ্যান, দারা-শিকোহর বিজিরবাগ, কাশ্মীরে আকবরের সালিমার উদ্যান ও জাহাঙ্গীরের নাসিম বাগ, লাহোরে শাহজাহানের সালিমার বাগ এই ধারার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ ছাড়াও কাশ্মীরের নিশত-বাগ, দিল্লীর লালকেল্লার বাগান, হয়াতবক্স ও মেহতা-বাগ, মোবারক-বাগ, এনায়েত-বাগও বিখ্যাত। শুধু সম্রাটরাই নন, সম্রাজ্ঞীরাও উদ্যানে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। নূরজাহানের লাহোরস্থ সাদরা উদ্যান ও দিলখুশবাগ, শাহজাহানপত্নী ইজ্জতোদৌল্লা বেগমের দিল্লীর সালিমার উদ্যান এবং শাহযাদী জেবুন্নেসার চারবুর্জি বাগ উল্লেখযোগ্য। এসব বাগের অধিকাংশই আজ স্মৃতিমাত্র। লাহোরের সংরক্ষিত সালিমার বাগই আজ শুধু অতীতের সেই অনুপম দিনের প্রধান সাক্ষ্য হয়ে আছে। পরিতাপের বিষয় আমরা আমাদের এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের আত্তীকরণেই শুধু নয়, যথাযথ সংরক্ষণেও ব্যর্থ হয়েছি।

ঐতিহ্য-বিবর্জিত বন্ধ্যাত্বের নজীর এদেশের ইংরেজ শাসনাধীন জমিদার শ্রেণীর বাগান এবং সরকারী পার্ক। সি. এম. স্টুয়ার্টের ভাষায়, 'আগাছাপূর্ণ খোলা জায়গা, পরিত্যক্ত ইউরোপীয় ধাঁচের মূর্তিসমূহ, বিরাট রেলিঙের বেড়া, অপ্রয়োজনীয় প্রশস্ত রাস্তা, বিক্ষিপ্ত পুষ্পবেদী, নি:সঙ্গ বৃক্ষরাজি এবং সবশেষে গরম দেশের পক্ষে হতাশাব্যঞ্জক ঝর্ণা বা জলপ্রণালীর অভাব অতি সহজেই এ সত্যকে প্রকটিত করে।'[২৩] ইঙ্গ-বঙ্গ আন্দোলনে অভিজাত শ্রেণীর রুচি থেকে ক্রমেই দেশীয় গাছগাছড়া নির্বাসিত হয়েছে এবং সেই স্থান পূরণ করেছে আমাদের দেশের আবহাওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত মহার্ঘ বিদেশী তরুরা। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, এদেশে আমাদের দেশী তরুদের প্রতিষ্ঠাও বিদেশীদেরই অবদান। আমাদের অরণ্যপর্বতে তরুসন্ধানী জে. ডি. হুকার, উইলিয়াম রক্সবার্গ, ডেভিড প্রেইন, নাথানিয়েল ওয়ালিচ, জর্জ কিং তাই নমস্য। তাঁদের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলেই আমাদের উদ্ভিদবিদ্যার জন্ম।* তাঁদের কাছ থেকেই আমরা আমাদের গাছপালাকে নতুন করে

* ১৭৮৭ সালে কর্ণেল কিড কর্তৃক কলিকাতার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠা।

চিনেছি এবং তাদের অবদানেই ঢাকা আজ উষ্ণমণ্ডলীয় তরুর উজ্জ্বল সবুজে সুবর্ণ-নিবিড় হয়ে আছে।

৬.

'পশ্চিমের মন আজ যেমন প্রাচ্যমুখীন, প্রাচ্যমন তেমনি আজ পশ্চিমের অনুমোদন ব্যতীত তৃপ্ত নয়'[২৪] রজার ফ্রাইর এ উক্তির প্রথমাংশ বিনয় কিন্তু শেষাংশ নির্জলা সত্য। প্রাগ্রসর পাশ্চাত্য আধুনিক বিশ্বে আমাদের দিশারী এবং তাদের তুল্যমানে যাবতীয় কলাকীর্তির মূল্যায়ন ব্যতীত আমরা নিরুপায়।

আমাদের উদ্যানচর্চার আকস্মিক অবলুপ্তি ঘটলেও ইউরোপে এই শিল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহু স্তর উত্তীর্ণ হয়েছে সেই শিল্পকৃতির আলোচনা ব্যতীত এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক অবস্থান ও অগ্রগতি পরিমাপ অসম্ভব। যে-ঐতিহ্য কালের ফসল আহরণে অনীহ, স্থবিরত্বই তার পরিণতি। স্থানকাল-বিধৃত শিল্পরীতির বৈচিত্র্য একটি অনবচ্ছেদ্য বৈশ্বিক প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত এবং সেজন্য সেগুলি পরস্পর সন্ধিবদ্ধ। যে-রীতি আজ কালের পেছনে অবস্থিত সময়ের ব্যবধান উত্তরণ তার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত এবং শিল্পের অধুনাতম জ্ঞান ব্যতীত এই পুনর্বাসন অসম্ভব। শুধু ঐতিহ্যে নিরঙ্কুশ আস্থাই নয়, নতুন আত্মীকরণের সাধনাও আজ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

যদিও ব্রিটেনের শিল্প-ইতিহাস সুপ্রাচীন নয় এবং তাদের দ্বৈপ-অন্তর্মুখীনতা সর্বজনবিদিত, তবু ইংরেজের সংগ্রহশালাই আমাদের পাশ্চাত্য জ্ঞানের মুখ্য উৎস। বৃটেনের উদ্যানশিল্পের পর্যালোচনা থেকে আমরা সারা ইউরোপীয় উদ্যানের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখার পরিচয় পেতে পারি। হোমার-বর্ণিত গ্রীক ঋষিদের তপোবনোদ্যান রেনেসাঁর প্রবল ত্বরণে যখন ইতালীর ভিলার চত্বরে এসে পৌঁছেছিল বৃটেনে তখনও সভ্যতার আলোক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। সূর্যধৌত ইতালির এই ভিলাউদ্যান ছায়াঘন, ফোয়ারা-উৎকীর্ণ জলধারায় উচ্ছল এবং এই শিল্পের প্রাথমিক স্তরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রীতিনিষ্ঠ। সেজন্যই রাস্তাগুলি সোজা সরল, ছককাটা জমি, প্রতি চত্বরে এক এক রকম গাছ এবং পটভূমির প্রাসাদের সঙ্গে এই সজ্জা সামঞ্জস্যহীন। এ যেন বহুলাংশে পারস্যনীতিরই অনুকৃতি। এই মিল পারস্পরিক প্রভাবসঞ্জাত, নাকি সমান্তরাল অভিব্যক্তির ফল বলা কঠিন। ইউরোপীয় উদ্যানের শৈশব লালিত হয়েছে ইতালীয় ভিলার প্রাচীর ছায়ায়। ফরাসি নগরের বিস্তৃতর পরিসরেই দেখি তার বয়ঃসন্ধির বিদ্রোহ ও যৌবনের উদ্দামতা এবং অতঃপর সেখান থেকেই বিশ্বনিখিলে মুক্তি। সুবিন্যস্ত তরুরোপণে ইউরোপে ঐতিহ্যস্রষ্টা প্রথম চার্লস যখন ইতালীর স্থপতিদের সাহায্যে ফরাসিদেশের নিসর্গ-রচনায় নিবিষ্ট, আমাদের দেশে তখন বাবরের রাজত্বের শেষপাদ। ফরাসি সম্রাটদের প্যারীর পথে পপলার রোপণ, আমাদের শেরশাহের গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে বৃক্ষরোপণের প্রায় সমকালীন। আজকের প্রেক্ষিতে এ সমান্তরাল সামঞ্জস্যের স্মৃতিচারণ শুধুই দুঃখবহ।

ফরাসী উদ্যানের সূচনা ইতালীয়দের হাতে হলেও ফরাসীদের প্রবল ঐতিহ্যের গ্রাসে তা জারিত ও রূপান্তরিত হয় আরেক বিশিষ্ট শিল্পরূপে। এখানে রোমান ভিলার সংকীর্ণ পরিসর মুক্তি পেল পার্কের বিস্তৃততর আয়তনে। আঁদ্রে লে-ন্‌তর এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যান-স্থপতি এবং তাঁর নির্মিত ভার্সাই উদ্যান তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পকীর্তি। তিনি ছিলেন রীতিনিষ্ঠ পরিকল্পনার অনুসারী। নিয়মের নিগড়ে প্রকৃতিকে বেঁধে রাখার আকাঙ্ক্ষা তাঁর নির্মাণে স্পষ্ট। প্যারীর পথে তাঁর পরিকল্পিত শৃঙ্খলাবদ্ধ উদ্ধত পপলার দু' পাইন বীথি যেন ফরাসী সম্রাটের প্রচণ্ড দম্ভের কাছে অবনত প্রকৃতিরই প্রতীক, যেন এ অলংকরণেই বিকীর্ণ তাঁর আনন্দ।

শিল্পচেতনার বয়ঃসন্ধির এ বিদ্রোহ স্বাভাবিক নিয়মেই যৌবনে ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। উপলব্ধির এই নতুন রোমাঞ্চে ক্রোধ অনুপস্থিত। প্রত্যয়মথিত এ দৃষ্টি প্রেমের আবেগে স্বপ্নিল। তাই মানুষের দৃষ্টিতে এই প্রথমবারের মত আবিষ্কৃত হলো প্রকৃতির নৈরাজ্যে ছন্দ, সুষমা ও সংহতি। এই নবতর উপলব্ধির আলোকে স্পষ্টতর হলো রীতিনিষ্ঠ কল্পনার জড়তা ও সীমাবদ্ধতা। চেতনার এই আলোয় শিল্পীর সামনে দেখা দিল এক নতুন দিগন্ত। আশ্চর্যে, বিস্ময়ে, প্রেমে স্রষ্টা অভিযাত্রী হলেন এই অকর্ষিত শিল্পলোকে। উনিশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শিল্পসাহিত্য এ অভিজ্ঞতারই ফসল। বলাবাহুল্য উদ্যানস্থাপত্যেও ব্যতিক্রম ঘটে নি।

শিল্পবিপ্লবোত্তর বৃটেনে প্রকৃতির যথেচ্ছ দোহনে নবজাত পুঁজিতন্ত্র যখন দিশাহারা, মাঠ-ঘাট-বন উচ্ছন্ন করে যখন প্রসারিত হচ্ছে মেষচারণভূমি, কয়লা-লোহা-জাহাজ তৈরীর রসদ, তখন এ উন্মত্ত প্রলোভনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন জন অ্যাভেলীন। রয়েল সোসাইটিতে তরু-সংরক্ষণ সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা ছাড়াও 'সিল্‌ভা' বা 'অরণ্য তরুর আলোচনা' (১৬৬৪) গ্রন্থেরও তিনি লেখক। অর্থ, সৌন্দর্য ও দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তাঁর তরুরোপণ আন্দোলন সেদিন ব্যর্থ হয় নি। সরকার, নৌবিভাগ এবং সচেতন সামন্তশ্রেণীর অনুকূল্যে ব্রিটেনের বিবস্ত্র-নিসর্গে পত্রাবরণ বিস্তারের এই প্রথম প্রয়াস একটি উল্লেখ্য ঘটনা।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় চার্লসএর রাজত্বকালে সম্ভবত লে-ন্‌তর ব্রিটেনে আমন্ত্রিত হন। অনেকের ধারণা সেন্ট জেম্‌স্ পার্কের প্রথম রীতিনিষ্ঠ পরিকল্পনা তাঁর। এই ধারার জড়তার বিরুদ্ধে ব্রিটেনে প্রথম বিদ্রোহী লেংলি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ওদেশের উদ্যানশিল্পে তিনিই রোমান্টিক রীতির প্রথম প্রবক্তা। এ নতুন শিল্পদৃষ্টি ভালবাসা-সম্পৃক্ত ও যুক্তি-অতিক্রান্ত কল্পনায় রঙিন বিধায় তরুশাসন এখানে নিষ্প্রয়োজন। তাই এ সুন্দর উদ্যানে নিয়মের কঠোর শৃঙ্খলা যেমন অনুপস্থিত তেমনি আরণ্যক নৈরাজ্যও অবারিত নয়। এর সাফল্য এ দুয়ের সুষম সাযুজ্যেই নিহিত। উইলিয়াম কেন্ট এ-রীতির সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যানশিল্পী এবং অধুনিক উদ্যানের জনক। তাঁর শিল্পস্বর্গের ভারবাহী স্তম্ভত্রয় বিস্ময়, বৈচিত্র্য ও সংগোপন যা উদ্যান-শিল্পের অন্যতম মৌল রীতি হিসেবে আজও স্বীকৃত। ১৭৪৮ সালে কেন্টের মৃত্যুর আগেই তার আশ্চর্য তুলিতে বৃটেনের অমার্জিত নিসর্গ সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হয়েছিল।

এই শিল্প-আন্দোলন শুধু নতুনের সৃষ্টিতেই অবসিত হয় নি, প্রাচীনকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। হ্যামপ্রে রেপটন অতঃপর সেন্ট জেমস পার্কের পুনর্বিন্যাস ঘটান। নবরূপায়ণে আগেকার সারিবদ্ধ সমান্তরাল গাছেরা হলো এলোমেলো। পথের সরলরেখা এঁকেবেঁকে দীর্ঘায়িত হলো এবং দর্শকের দৃষ্টি মুক্তি পেল নিয়মের পীড়ন থেকে রহস্যের স্বপ্নলোকে।

ভিক্টোরিয়ান ইংলণ্ড শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির জন্য বিখ্যাত। উদ্ভিদবিদ্যার ক্রমোন্নতির এ-যুগে বিজ্ঞানচেতনার প্রভাবে এদেশে আদৃত হলো বিদেশী তরুরা। শুরু হল নানা দেশ থেকে গাছ-গাছড়া সংগ্রহের হিড়িক। নতুন উদ্ভিদের বন্যাস্রোত এলো ইংলণ্ডে। প্রতিষ্ঠিত হলো বোটানিক্যাল গার্ডেন,* নতুন পার্ক, সুদৃশ্য অ্যাভিনু। কলকারখানার ধোঁয়াটে অবয়ব ঢাকা পড়লো তরুর সবুজে। গ্রাম-দেশের সুদূর অবধি ছড়িয়ে গেলো নিসর্গ-চেতনা। এ যুগের সর্বাধিক উল্লেখ্য প্রতিভা উইলিয়াম রবিনসন। তিনি রোমান্টিক চেতনার সীমিত স্বাধীনতাকে অতিক্রম করে একেবারে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে উদ্যানশিল্পকে নিয়ে এলেন। সৃষ্টি করলেন বন্য-উদ্যান (wild garden)। যে বিপুল পরিমাণ নতুন গাছ-গাছড়া তখন ইংলণ্ডে এসেছিল তাদের আকৃতি প্রকৃতির সীমাহীন বৈচিত্র্যের স্থান-সংকুলানের পক্ষে রোমান্টিক উদ্যান তখন যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল না। তাই উইলিয়াম রবিনসনের পক্ষে প্রকৃতি-প্রত্যাবর্তন অনিবার্য ছিল। এ উদ্যানরীতি তাঁর জন্মভূমি স্যাসেক্সের 'গ্রাভী ম্যান'-এ প্রথম বাস্তবায়িত হয়। স্থায়ী উদ্ধত ওকের সঙ্গে নানা বিদেশী গাছ এখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত-বিচিত্র সব সুন্দর লতারা জড়িয়ে আছে ডালে ডালে, ঘাসের সবুজে গজিয়েছে নানা রঙের লিলি। এডওয়ার্ডের ইংলেণ্ডের 'রমোদ্যান', (pleasure garden) 'পার্বত্য-উদ্যান' (alpine garden) এবং লেক ডিস্ট্রিক্টের তরুসজ্জায় রবিনসনের প্রভাব সুস্পষ্ট। সুইডেনে আজও রবিনসন-রীতির উদ্যান তৈরি হয়। ১৮৮৩ সালে লিখিত তাঁর 'দ্য ইংলিশ ফ্লাওয়ার গার্ডেন এণ্ড হোম গার্ডেনস'-এর জনপ্রিয়তা অদ্যাবধি স্তিমিত নয়। তাঁর মতে প্রকৃতির নিজস্ব রীতি অনুযায়ী গড়ে-ওঠা নিসর্গই সর্বাধিক স্বাভাবিক ও সুন্দর এবং উদ্যান-শিল্পীর কর্তব্য প্রকৃতির এই গ্রন্থনার রহস্য উদ্ঘাটন ও সদ্ব্যবহার। আত্যন্তিক অনির্দিষ্টতার দরুন এই ধরনের উদ্যান নির্মাণ অত্যন্ত জটিল এবং সেজন্যই তা যথেষ্ট জনপ্রিয় হতে পারে নি।

৭.

আশ্চর্য সুন্দর আমাদের স্বদেশ, বাংলাদেশ। বাংলার নিসর্গ সম্পদে-বৈচিত্র্যে-বিস্ময়ে অপূর্ব। উদ্ধত প্রান্তিক পর্বত, অবারিত উদার মাঠ, কাকচক্ষু নদীনালা, গভীর বনানী, সমুদ্রধৌত বেলাভূমি, নিস্তরঙ্গ হ্রদ আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের ঐশ্বর্য। এদেশের নমনীয় প্রকৃতির প্রগাঢ় ছায়ায় আমাদের অভ্যাস, আমাদের চেতনা লালিত। গ্রীষ্মের উজ্জ্বল রোদ, বর্ষার অশ্রান্ত বারি-ধারা, শরতের নরম নীল আকাশ, হেমন্তের হলুদ আলো, শীতের রিক্ত মাঠ, বসন্তের উদ্ভিন্ন মুকুলের কলরব বাঙালীর মানস-বৈশিষ্ট্যের

* লণ্ডনের কিউ গার্ডেনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ১৮৪১ সনে।

স্বতঃ অনুষঙ্গ। আমাদের জীবনচিন্তা, স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য এবং সৌন্দর্যবোধের উৎসমূল এদেশের সুবর্ণ-নিসর্গে, প্রকৃতির অম্লান ঔদার্যে প্রোথিত। যে ভাবালু আদর্শবাদে আমাদের জীবনচেতনা মূলিত, এমন সর্বংসহা প্রকৃতি ব্যতীত তার লালন অসম্ভব।

কিন্তু প্রকৃতির আপন বিন্যাসে আজকের মন আর তুষ্ট নয়। আপন মনের মাধুরীতে তাকে ঢেলে সাজান কালের অনমনীয় দাবী। শুধু নান্দনিক তাৎপর্যই নয়, অর্থনৈতিক প্রলোভনও এতে কম নেই। তাছাড়া শিল্পের বিস্তারে এদেশের নিসর্গ ও গণমানস যখন আলোড়িত তখন নিসর্গ পরিকল্পনার অবিলম্ব বাস্তবায়ন খুবই জরুরি। অর্থকরী ও প্রায়োগিক কারণেই শুধু নয়, সুষম মানস গঠন, শিক্ষা ও সৃজনশীলতার জন্যও তা অপরিহার্য। এ বিদ্যা শুধু কল্পনার অনিয়তাকার জগৎ পেরিয়ে একটি বিশিষ্ট তত্ত্বের মর্যাদা পেয়েছে। 'বায়োএসথেটিক্স' শব্দের পরিভাষা আজও আমাদের অভিধানে অনুপস্থিত। জীবনন্দনতত্ত্ব যুৎসই শব্দ কিনা তা সুধীজনের বিচার্য। কলা ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রসারমাণ দূরত্বের উপর নির্মিত সামান্য কয়েকটি সেতুবন্ধে একটি এই জীবনন্দনতত্ত্ব। এটি জীববিদ্যা ও নন্দনতত্ত্বের সংশ্লেষ। অধ্যাপক লেন্সলট হগবেনের ভাষায়, দেশকে সুন্দরতর করার প্রয়াসে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুপরিকল্পিত বিন্যাসই জীবনন্দতত্ত্বের বিষয়।[২৫] এই বিদ্যার পণ্ডিত শুধু শিল্পী নন, বিজ্ঞানীও। তিনি স্থপতির যমজ হলেও তার কার্যকর উপাদান আরো জটিল এবং ইট, কাঠ, পাথরের মতো জড়বস্তুর বদলে এগুলি জীবন্ত। তাদের ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ কঠিনতর। দেশের বিস্তৃত পরিসরে যেসব জীবন্ত অবয়বে অজস্র বর্ণ ও আকৃতির বৈচিত্র্য বিধৃত সেগুলিই জীবনন্দনতত্ত্বের উপকরণ এবং এদের শৈল্পিক সংস্থান এক দুরূহ শিল্পকর্ম।

সূর্যালোকিত মৌসুমী-বিধৌত আমাদের দেশ জীবনন্দনতত্ত্বের অজস্র আকর্ষী উপাদানে সমৃদ্ধ। শাল-দেবদারুর রাজসিক সৌষ্ঠব, সেগুন-তেঁতুল-তালের বলিষ্ঠ গ্রথন, বিলাতী-ঝাউয়ের মর্মর, নাগকেশর-ছাতিমের উদ্‌ভ্রান্ত সুগন্ধি, কুর্চি-সজনার শুভ্রতা, কৃষ্ণচূড়া-পলাশ-শিমুলের উচ্ছল বর্ণচ্ছটা, নারকেলের দুর্বার দুর্মর সবুজ, পদ্ম-শাপলার ললিত লাবণ্য, কাশমঞ্জরীর অবারিত উচ্ছ্বাস, সুন্দরী-গেওয়া-গোলপাতার নিরন্ধ্র নীল, বটের নিশ্ছিদ্র ছায়া আমাদের নিসর্গ-শিল্পীর প্রিয় রং ও রেখা, আকার ও অলংকার। শুধু উদ্ভিদ নয়, প্রাণীর ভূমিকাও এখানে উল্লেখ্য। সুন্দরবনের বাঘ, সমুদ্রমুখের কুমীর হাঙ্গর, চরণভূমির চকিত হরিণ, নদীস্রোতের রূপালী মাছ; পাখীদের বিচিত্র পালক ও অনুপম কাকলি, আর দূরাগত হাঁসের ডানাঝাপটার কম্পিত অনুরণনও এরই অনুষঙ্গ।

কিন্তু নিসর্গ-চেতনার প্রতি আমাদের মনোযোগ খুবই প্রশ্নসাপেক্ষ। উন্মুক্ত অনূঢ় প্রকৃতির অলংকরণের প্রসঙ্গ দূরে থাক, আমাদের বহুল প্রচারিত পর্যটনকেন্দ্রসমূহে আজও এই প্রসঙ্গ অবহেলিত। কক্সবাজার ও কাপ্তাই নি:সন্দেহে মনোহরী। কিন্তু এই কৃতিত্ব আমাদের নয়, প্রকৃতির। সে স্বভাবতই এখানে সুন্দর। আমাদের সযত্ন প্রয়াসে সেই সৌন্দর্য বর্ধিত হয় নি। কক্সবাজারের ধূলিধূসর দরিদ্র শহর, বেলাভূমির বিকর্ষী অনুর্বর রিক্ততা, কাপ্তাইর ছায়াহীন পথঘাট ও অমার্জিত উন্মুক্তির নিরসন খুবই জরুরী। কক্সবাজারের প্রকৃত-তরু বিলাতী ঝাউ-এর একক রোপণেই এ দৈন্যের নিরসন অনেকটা সম্ভব ছিলো। কাপ্তাইয়ের অসম ভূমিবিন্যাসে আধুনিক উদ্যানের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার

বাস্তবায়ন মোটেই কঠিন নয়। অথচ আমরা নির্লিপ্ত উদাসীন।

পর্বত ও সমুদ্রের আকর্ষণ চিরন্তন। সেখানে ব্যাপ্তি অবারিত এবং আমাদের ভ্রমণসংস্থার লক্ষ্যও স্বাভাবিকভাবেই সেখানেই। কিন্তু এর বাইরে, এদেশের দূরতর অঞ্চলে আরও আকর্ষণীয় স্থান রয়েছে। সিলেট-মৈমনসিংহের জলাভূমির দৃশ্যপট সম্পর্কে এদেশের শিক্ষিতজন কমই অবহিত। এসব জলাভূমির স্থানীয় নাম 'হাওর'। এই জলাভূমি শীতের শুরুতেই বিশাল দূর্বাশ্যামল প্রান্তর হয়ে ওঠে। জনমানবহীন এই মাঠের নৈঃশব্দ্য, দিগন্তে দূর পর্বতের ঢেউ, বিক্ষিপ্ত বিলের কাঁচস্বচ্ছ জল ও ছায়াঘন হিজলকুঞ্জ, সবই অপূর্ব প্রশান্তি-সিক্ত। এখানে সমতলের একঘেয়েমি নেই, এর উচ্চাবচ আন্দোলিত। হিজলের অরণ্য-বলয় ছাড়াও এখানে তুলসীগন্ধী লিপিয়া, প্রস্ফুটিত বনগোলাপ, উজ্জ্বল বেগুনী হড়হড়ি ও শতমূলীর ঝোপঝাড় অজস্র। এর ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় নির্ভয় দোয়েল-শ্যামা ঘুঘুদের দল ; আরও দূরে গরুর বাথান, বিলের কিনারায় বোরোধানের কচিসবুজ আর দিনরাত হাজারো হাঁসের মেলা। তাই হঠাৎ মনে হয় এ যেন একেবারে অপরিচিত দেশ, আদিম অথচ সহিষ্ণু, শান্ত ; এই স্বাদ না আছে পর্বতে, না সমুদ্রে। যদি এ অঞ্চল উন্নয়ন সম্ভব হয়, যদি ঢেলে সাজানো যায় এর নিসর্গ তবে সে হার মানাবে সুন্দরী কক্সবাজারকে, সুভৌল কাপ্তাইকে। এমন নির্জনতায় হিজল-জারুলের ভীড়ে সরষে ফুলের আঘ্রাণঘন একটি সন্ধ্যার রক্তরাগ সমুদ্রের সূর্যোদয় অপেক্ষা কিছুমাত্র স্বল্পাকর্ষী নয়।

আমরা অনগ্রসর অর্থনীতির দেশের বাসিন্দা বিধায় আমাদের উপযোগচেতনা অত্যধিক প্রখর। শুধু সমষ্টিতে নয়, ব্যষ্টিতেও তা প্রকট। অর্থলাভ ও আদর্শের মধ্যে আমরা ভারসাম্য রাখতে ব্যর্থ। ব্যক্তিজীবনে কিংবা সমাজ কল্পনায় অর্থনৈতিক লাভ ও স্বাচ্ছল্য একক লক্ষ্য হয়ে উঠলে তা প্রাচুর্য আনলেও স্বস্তি হারাবে মনে রাখা উচিত, দেশের নিসর্গ-রচনার, একে সুন্দরতর উপভোগ্যতর করার প্রয়াস অপব্যয় কিংবা বিলাস নয়, প্রয়োজন। বিশেষত, শহর-নগর-বন্দরের প্রসার, নতুন রাস্তা, কলকারখানা, পুল, স্টেশন, বাড়িঘরের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিক নিসর্গ পরিবর্তনের মুখোমুখি হওয়ায় এই প্রয়োজন অগ্রাধিকারী হয়ে উঠেছে। এই কৃত্রিম কাঠামোগুলোকে স্বাভাবিক নিসর্গে খাপ খাওয়ান আবশ্যক। শুরু থেকে এ-সম্পর্কে সতর্ক না হলে আমাদের বিপর্যস্ত নিসর্গ একদিন সংশোধনের সীমা অতিক্রম করবে, আর তখন শিল্পহীনতা, রুচিহীনতার জন্য আমরা আখেরে নিন্দিত হবো উত্তরসূরীদের কাছে।

এ অবহেলা অনগ্রসর সবদেশেই সমস্যা। শিল্পোন্নত দেশেও মোটেই অনুপস্থিত নয়। প্রসঙ্গত বৃটেনের কথা উল্লেখ্য। ১৯৫৯-এর ২২শে এপ্রিল পার্লামেন্টে জনৈক সদস্য জানতে চান যে ব্রিটেনের নবনির্মিত সড়কগুলির সঙ্গে নিসর্গের সামঞ্জস্য বিধানে সরকার কোনো স্থপতি-সংস্থার পরামর্শ নেন কিনা। সমস্যা এড়ানোর জন্য যদিও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি প্রসঙ্গত উপদেষ্টা-কমিটি ও রয়েল আর্ট কমিশন-এর নামোল্লেখ করেন, তবু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে এসব সংস্থা উক্ত ব্যাপারে কার্যত ক্ষমতাহীন ও প্রায় নিষ্ক্রিয়।[২৬]

দেশের নিসর্গ পুনর্গঠনের সমস্যা একটি ব্যাপক ও জটিল কর্মকাণ্ড যার বাস্তবায়ন সুষ্ঠু পরিকল্পনা-নির্ভর। কোন একক ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান নয়, সারাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা এখানে অপরিহার্য। সৌন্দর্য-চেতনার সার্বিক ও ব্যাপক প্রসার

ব্যতীত নিসর্গ রক্ষা ও তার স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। অবশ্যই তা সময়সাপেক্ষ। তাই প্রথম পদক্ষেপ হলো সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্বদান এবং স্থপতি, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও নিসর্গীদের সহযোগিতা কামনা। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে বিমুখ প্রকৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমাদের অবশ্যই স্পর্শ করবে এবং তখন ক্ষতিপূরণ হয়তো আর সম্ভব হবে না।

ন.

মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তাহলে চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত, ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে।[২৭] নতুন ঢাকার ছায়াঘন পথে চলার সময় এ কথাটি বারবার মনে পড়ে। সবুজ মাঠ, নির্জন পার্ক, বনানীর আড়ালে বিক্ষিপ্ত বসতিঘর, অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য শিথিলবিন্যাস যেন উপরোক্ত চিন্তারই সার্থক রূপায়ণ।
লক্ষ লক্ষ বছর প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে বসবাসের অভিজ্ঞতা আমরা আজও বিস্মৃত নই। মানুষের জৈবধর্ম অপেক্ষা বহুগুণ দ্রুতধাবী তার সভ্যতা, তাই সমাজবিবর্তনের ত্বরণে আজ মনভিযোজনার সমস্যায় সে পীড়িত। শহরের আকাশচুম্বী প্রাসাদ, উজ্জ্বল রং, কর্কশ শব্দপুঞ্জ, মানুষের ভীড়, দ্রুতগতি, কৃত্রিম আলো, নিয়ন্ত্রিত উত্তাপ ইত্যাদি অজস্র ভালমন্দের ভিড়ে, স্বাচ্ছন্দ্য ও হতাশায় দোদুল্যমান আজ মানুষের ত্রিশঙ্কু অস্তিত্ব। প্রকৃতির উপর বিজয় অর্জনের গৌরব সর্বস্তরের মানুষকে কতদূর স্পর্শ করেছে বলা কঠিন। কিন্তু স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে আত্যন্তিক কৃত্রিমতার ভিড়ে এখন সে অতীত অপেক্ষা কম অসহায় নয়। আলেক্সি ক্যারলের ভাষায় 'বর্তমান সভ্যতা আমাদের স্বভাবের স্বীকৃতি নয়, এ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খেয়াল, মানুষের ক্ষুধা ও অধ্যাস, তার মতবাদ ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি। আমাদের আকৃতি ও আয়তনের সঙ্গে একান্তই বেখাপ।[২৮] তবু শহরের জয়যাত্রা রোধ অসম্ভব। গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সব দেশেই শহরের প্রসার ও প্রশস্তি। অবশ্য আধুনিক শহর আজ বহুলাংশে প্রকৃতির কাছে অবনমিত। উন্মুক্ত পার্ক, প্রশস্ত রাস্তায় তরুবীথি ও বিস্তৃত তৃণাঙ্গন, স্বচ্ছ শীতল ঝিল, শব্দরোধী ঝোপের আড়াল এসবই এই বশ্যতার প্রতীক। এ ছাড়া শহরের স্বাভাবিক জীবন দু:সহ। ঢাকা শহরের পুরনো বসতি এ পর্যায়ে আমাদের নিকটতম অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য। রমনার সবুজে আবৃত এ শহরের রূপ গ্রামবাংলার একান্ত অনুগ। এখানে শহর গৌণ, প্রকৃতি মুখ্য। তাই এর পথে চলায় ক্লান্তি নেই। নরম নিটোল এক আশ্চর্য প্রশান্তিতে স্নিগ্ধ মাঠ-ঘাট-বীথি। গ্রীষ্মের দীর্ঘ দুপুরে পথতরুদের প্রসারিত শীতল ছায়া, তৃণপত্রে নিঝরিত শরৎরাতের শিশিরের শব্দ, হেমন্তের গোধূলির আলোয় উজ্জ্বল তরুশীর্ষ, শীতের ঝরে পড়া পাতার ধূসর বিষণ্ণতা আর বসন্তী প্রস্ফুটনের বর্ণাঢ্য উচ্ছ্বাস হঠাৎ মনেপড়া শৈশবস্মৃতির মতই আমাদের নগরশ্রমজর্জর জীবনে ক্ষণিক আনন্দের স্পর্শ হয়ে ওঠে। রমনার আকাশে উজ্জ্বল নীল এখনও অবারিত, দিনেরা অরণ্যের মত নির্জন, পাতার সবুজে নিওন আলো- বিকীর্ণ রাত রহস্যময়

ঢাকার উদ্যান-নগরীর একটি রাজনৈতিক পটভূমি আছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের সংযুক্তি পরিকল্পনায় ঢাকায় নতুন প্রদেশের রাজধানী নির্মাণের অসম্পূর্ণ উদ্যোগের ফল রমণা গ্রীণ। শহরের নিসর্গ-পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় ১৯০৮ সালে। লণ্ডনের কিউ উদ্যানের অন্যতম কর্মী আর. এল. প্রাউডলক এর স্থপতি। ঢাকাস্থ উষ্ণমণ্ডলীয় রূপসী তরুগোষ্ঠী নির্বাচনের কৃতিত্বও তাঁর। শহরে বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনার বহুমুখী সমস্যার এমন সুসমঞ্জস সমাধান অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। ১৯১৮ সালে প্রাউডলক যখন চলে যান, ঢাকার পথে তরুরোপণের অসম্পূর্ণ কাজ তাঁর সহযোগীদের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ হয় ১৯২৮ সালে।[৩] বর্তমান ঢাকার শ্যামলী নিসর্গ প্রাউডলক পরিকল্পনারই ফলশ্রুতি।

ঢাকা আজ (১৯৬৫) দ্রুত বর্ধমান। রূপসী রমনা আজ বহুদূরে প্রসারিত। দ্বিতীয় রাজধানী ও শিল্পাঞ্চলসহ এ শহর একদিন মহানগরে উন্নীত হবে। এর নিসর্গ সেদিন কী রূপ নেবে আজই বলা কঠিন। আমরা অবশ্যই আশা করবো আমাদের স্থপতিরা বিভিন্ন দেশের শেষতম অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণে কার্পণ্য করবেন না। কিন্তু অদ্যাবধি এ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে বিশেষ কোন আশার সম্ভাবনা প্রতিফলিত হয় নি। একমাত্র রমনা পার্ক ছাড়া (যদিও তার পরিণত রূপ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে) আপাতত এ পর্যায়ে স্মরণযোগ্য আর কোন সাফল্য আমাদের নেই। যেসব আবাসিক কলোনী বহুকাল আগেই তৈরি হয়েছে সেগুলো আজও উন্মুক্ত ও রৌদ্রদগ্ধ। অথচ শুরুতেই সেখানে গাছপালা লাগালে এতদিনে আজিমপুর, মতিঝিলের পটপরিবর্তন ঘটতো। নতুন পথে যেসব গাছ আজকাল লাগানো হচ্ছে তা মূলত সেই পুরনো পরিকল্পনারই অনুসারী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ অনুকৃতি। যেসব নতুন অ্যাভিন্যু আমাদের শহরের প্রধান আকর্ষণ সেগুলোর তরুবীথির দুর্দশা এর উজ্জ্বলতম নজির। ঢাকায় ইদানীং বৃক্ষরোপণ অপরিকল্পিত মিশ্রণে ও নতুন কল্পনার দৈন্যে হতশ্রী। শহরে আজও কোন বনানী (woods) নেই, নেই দ্বি-সার গাছের কোনো ছায়াঘন মিশ্রবর্ণের অ্যাভিন্যু। ঢাকার তরুরোপণের শুরুতেই পাখিদের সমস্যাটি বিবেচিত হয় নি। তাদের খাবার ফলের গাছ শহরে নেই বলেই কাক ছাড়া অন্য পাখি এখানে দুষ্প্রাপ্য। সেই ভুল সংশোধনের কোন লক্ষণও চোখে পড়ে না। সুসমন্বিত পরিকল্পনার সাফল্যে সবাই আজ উচ্চকণ্ঠ। অথচ শহরের তরুরোপণ ও প্রয়োজনবোধে সেগুলির অঙ্গচ্ছেদের মধ্যে কোন সংযোগ দেখি না। যে নির্মমভাবে হলিফ্যামিলি রোড ও নীলক্ষেতের তরুবীথিকে বিকৃত করা হয়েছে তা করুণ ও মর্মস্পর্শী।

আশাবাদ চিরদিনই মানুষের অবলম্বন। শুভবুদ্ধির উপর আস্থা-স্থাপনে আমরা বিশ্বাসী। আশা করবো কোটি কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও ঐতিহ্যের সমন্বিত রূপ দেশের রাজধানীতে প্রতিমূর্ত হবে, আমাদের সৃজনীশক্তি অবারিত হবে, এর ছত্রচ্ছায়া সকলের শান্তি নিশ্চিত করবে।

---

৩. অশীতিপর বৃদ্ধ পুরানা পল্টনবাসী বাবু অখিলচন্দ্র চক্রবর্তীর সৌজন্যে তথ্যাবলী সংগৃহীত। তিনিই প্রাউডলকের প্রধান সহকর্মী ছিলেন। ঢাকার পথতরু, পার্ক, গভর্ণর হাউসের বাগান ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর সংযোগ বহুদিনের।

৯.
'সুষ্ঠু বিন্যাস ব্যতীত আমাদের পরিপার্শ্ব শিল্পবর্জিত, অমার্জিত এবং আমাদের প্রকৌশল প্রগতি অর্থহীন', নিসর্গ-স্থপতি পল এডওয়ার্ডসের এ মন্তব্য উপযোগবাদীদের কাছে অতিশয়োক্তি বলে বিবেচিত হলেও এর যাথার্থ্য সম্পর্কে সুধীজন নিঃসন্দেহ। সৌন্দর্য যাদের কাছে বিলাস-উপকরণ তাদের দৃষ্টির স্থূলতা আজ আর প্রচ্ছন্ন নেই। যেহেতু জীবন অস্তিত্ব মাত্র নয়, প্রস্ফুটনও তার স্বভাব, তাই সৌন্দর্য প্রয়োজনেরই অনুষঙ্গ। এ বোধের স্বীকৃতি জাতীয় পরিকল্পনায় প্রসারিত না হলে বিকাশের ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটবে এবং ফলাফল আশু অনুভব্য না হলেও ক্যানসারের মতই তার নিঃশব্দ-বিস্তারে আখেরে মারাত্মক হয়ে উঠবে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে পুনর্গঠন তো বিপ্লবেরই নামান্তর। এখানে এই প্রকল্প অবশ্যই অগ্রাধিকারী। দেশের শিল্পসম্পদ ও নিসর্গ পরস্পর যুক্ত ও পরিপূরক। প্রথমটির জন্য দ্বিতীয়টির অনাদর অনাবশ্যকই নয়, ক্ষতিকরও। বর্তমান শিল্পপ্রগতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কয়েকটি নিসর্গসমস্যা তাই আলোচিত হলো :

(ক) **অরণ্য :** আমাদের বনসম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সুতরাং বন রক্ষণ ও বৃদ্ধির তাগিদ আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। বন শুধু কাঠ ও জ্বালানীর যোগানদারই নয় স্বাভাবিক আবহাওয়া, ভূমির অক্ষত উর্বরতা এবং নিসর্গের ঘনিষ্ঠ সহযোগীও। আমাদের বন-বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য কেবলই প্রয়োজন-কেন্দ্রিক, শিল্পচিহ্নিত নয়। বনের সঙ্গে নিসর্গ-শোভার ঘনিষ্ঠতা আজও আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত। এই একমুখীন পরিকল্পনার রদবদল প্রয়োজন। বন দেশের নিসর্গের একটি অপরিহার্য প্রত্যঙ্গ এবং সেজন্য তার বিন্যাসে সৌন্দর্যের স্বীকৃতি জরুরি।

(খ) **গ্রাম :** গ্রামের পতিত ও অনুর্বর জমিতে ফল, জ্বালানী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রেও নিসর্গ পরিকল্পনার প্রশ্নটি বিবেচ্য। বর্তমানে (১৯৬৫) ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে এ পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পূর্বাপেক্ষা সহজতর। গ্রামাঞ্চলে এখন রাস্তা, পুল ও কলকারখানার প্রসার ঘটছে। এ সবই কৃত্রিম এবং সেজন্য দেশের নিসর্গের সঙ্গে এগুলির অভিযোজনার বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। সবচেয়ে সুন্দর পরিবেশে যেন এগুলি স্থাপিত হয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে তাদের সাযুজ্য অব্যাহত থাকে। অন্যথা অবিন্যস্ত, বিক্ষিপ্ত এসব উপকরণের সংখ্যাবৃদ্ধি নিসর্গের প্রতিকারহীন বিপর্যয়কেই ডেকে আনবে।

(গ) **রাজপথ :** দেশের অভ্যন্তরে শত শত মাইল বিস্তৃত রাজপথের দুপাশে বৃক্ষরোপণ দেশীয় নিসর্গের অন্যতম মূল্যবান সম্ভাবনা। অবশ্য ছায়া, বাত্যার আড়াল ও আর্থিক লাভের বহুমুখী উদ্দেশ্যও এতে জড়িত। দেশের হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত নতুন ও পুরাতন রাস্তায় বৃক্ষরোপণ যেমন আমাদের ভাবী সম্পদ, তেমনি সমস্যাও। আমাদের বহু শত মাইল পথ এখনও উন্মুক্ত কিংবা আগাছাকীর্ণ। ইদানীং যে-ধরনের নতুন বৃক্ষরোপণ শুরু হয়েছে তা প্রায়ই পরিকল্পনাহীন নৈরাজ্যিক। একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি গ্রহণ ও আক্ষরিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

সাধারণত আমাদের পুরানো রাস্তায় বৃক্ষরোপণে যে শিল্পরুচি ও বিবেচনা ছিল ইদানীং তার অভাব চোখে পড়ে। যশোর রোড, সিলেট-তামাবিল রোডের পথতরুরা যেমন আকর্ষী

তেমনি ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মূল্যবান। অথচ এখনকার রোপণ অবিন্যস্ত, ছন্দহীন, বৈচিত্র্যহীন। সাধারণত এক্ষেত্রে বহুদূর পর্যন্ত একই রকম গাছ লাগানোর রীতি বহুকাল থেকে প্রচলিত। ইদানীং অবশ্য মিশ্ররোপণও চোখে পড়ে, তবে তা কোনক্রমেই পরিকল্পনাবিহীন হওয়া উচিত নয়। পথের দুপাশের এক সারিতে গাছ না লাগিয়ে ঢালসহ পাশে যতটুকু জায়গা খালি পাওয়া যায় তার সবটুকুই ব্যবহার করা উচিত। এতে একঘেয়েমি কাটে তেমনি একটি বনানী গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও থাকে। এখানে অর্থকরী ফলের গাছ কিংবা বিদেশী গাছ না লাগানোই ভালো। ফলের গাছ সাধারণত গ্রামের দুরন্ত ছেলের শিকারে পরিণত হয়। আর বিদেশী তরু স্থানীয় নিসর্গের সঙ্গে সুঅভিযোজিত হয় না এবং ক্ষেত্রবিশেষে দুর্বল ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের রেলপথ ও মোটর সড়কের দুপাশে নীচু জমি ঘাসের জন্য ইজারা না দিয়ে সেখানে গাছপালা লাগালে ভালো হতো। মহাসড়কের পাশে গ্রামের শিশুদের জন্য জাম, আমলকিজাতীয় ছোট ছোট ফলের গাছ লাগানো উচিত। এগুলি এখন গ্রামে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। গাছ লাগানোর ব্যাপারে দূরে উঁচু গাছ ও রাস্তার কিনারে নিচু ঝোপঝাড় লাগানোই নিয়ম, যদিও আমাদের দেশে উল্টোটিই দেখি।

(ঘ) **শহর-তরু :** বহুমুখী বিবেচনা ব্যতীত শহরে তরুরোপণে সাফল্য অসম্ভব। ছায়া ও সৌন্দর্যের সঙ্গে আবর্জনা বৃদ্ধি, ভেঙ্গে পড়ার ভয়, এবং মাটির গভীরে প্রবিষ্ট শিকড়ের আক্রমণে দালানের ভিত, জলের পাইপ ইত্যাদির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির সমস্যাও এতে জড়িত। গাছের আকার, তার সর্বাধিক বিস্তার, ডালপালার বৈশিষ্ট্য, দৃঢ়তা, শিকড়ের পরিমাণ, প্রসার এবং তাদের জল-শোষণজনিত ভূ-সঙ্কোচনের ক্ষমতা ইত্যাদির সঠিক নির্ণয় ব্যতীত শহরে তরুরোপণ অসার্থক। এ ছাড়াও আনুষঙ্গিক আরও বহু সমস্যা আছে সেগুলির জটিলতাও কম নয়।

শহর পুরোপুরি মানুষের সৃষ্টি। পর্বতপ্রমাণ কৃত্রিমতার এতো বড় উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রকৃতির দান এখানে অত্যল্প। এমন পরিবেশে বৃক্ষরোপণ হল কৃত্রিমতার আংশিক প্রশমনের প্রয়াস এবং তার ইচ্ছানুরূপ বাস্তবায়ন সুকঠিন। গাছপালার আকার, আয়তন, বর্ণ ও প্রস্ফুটনের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকার বৈশিষ্ট্য এবং শহরবাসীর রুচি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা অবশ্যই বিবেচ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে ঢাকায় প্রাউডলক পরিকল্পনা উল্লেখ্য। তরুর প্রজাতি নির্বাচন ও সেগুলির বিন্যাসে তাঁর পদ্ধতি আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের ভিত্তি। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা কিংবা মূল পরিকল্পনা বাতিল হওয়ার জন্য এই রোপণ সম্পূর্ণ নয়। উষ্ণমণ্ডলীয় বৃক্ষের অন্যতম রূপসী তরু নাগেশ্বর, শাল, বকুল ও শিরীষ তার নির্বাচনে স্থান পায় নি। এখানে দ্বি-সার পথতরু ও বনানী অনুপস্থিত। পাখিদের প্রশ্নটি বিবেচিত হয় নি। তাই বট-প্রিয় কাক ছাড়া অন্য পাখি দুষ্প্রাপ্য। বাঙালির একান্ত আপন শেফালি, ছাতিম, কুর্চি, কামিনী, পলাশ বিলাতি ঝাউ, কনকচাঁপা, মুচকুন্দ, চাঁপা, হিজল, গামারি, কাঞ্চন, অশোক, মহুয়া, কাঞ্চি, শিশু, আমলকি, তমাল, বকুল ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য। এসব গাছপালার অনেকেই হয়তো পথতরুর সর্বগুণযুক্ত নয়, কিন্তু শহরের বিস্তৃত পরিবেশে ঝোপেঝাড়ে, রাস্তার মাঝখানে, মোড়ে, পার্কে উন্মুক্ত অঙ্গনে এদের স্থান সঙ্কুলান সম্ভব।

ঢাকার এখনকার বৃক্ষরোপণ সেই পুরানো পদ্ধতির ব্যর্থ অনুকৃতিই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জকও। প্রসঙ্গত গুলিস্তানের সম্মুখস্থ অ্যাভিনিউর দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। শহরের অন্যতম এই সুন্দর পথের দুপাশের উঁচু দালানের সঙ্গে পথতরুরা (পরশপিপুল, জারুল ও অ্যাকাশিয়ার বিক্ষিপ্ত অসংবদ্ধ মিশ্রণ) একেবারেই বেমানান। এখানে কেন শাল, নাগেশ্বর কিংবা দেবদারু *(Polyalthia longifolia var pendula)* নির্বাচিত হলো না? এসব স্থানের পক্ষে আদর্শ সাইপ্রেস্-পপলারের রাজকীয় সৌষ্ঠবের সঙ্গে আমাদের উপরোক্ত তিনটি বৃক্ষই তুলনীয়। অথচ ঢাকার পথে সেগুলি নেই। এখানে কেবল কৃষ্ণচূড়ারই আধিপত্য। গাছটি সুন্দর বটে, তবে সেজন্য বিস্তৃত সবুজ পটভূমি চাই, অন্যথা অনেক ক্ষেত্রেই সে বেমানান। একই কারণে হলিফ্যামিলি রোডের গ্লিরিসিডিয়া বীথির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য অস্ফুট থেকে যায়। এখানে পুত্রঞ্জীব কিংবা কাউয়ের একটি ঘনসবুজ প্রেক্ষিত থাকলে ভালো হতো। মৈমনসিংহ রোডে ও সেক্রেটারিয়েটের সামনে লাগান বাগান বিলাসের পরিকল্পনা প্রশংসার্হ, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে রয়েল পাম লাগালে সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়ত। মূলকথা, শহরে বৃক্ষরোপণ একটি জটিল শিল্পকর্ম। এজন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে গভীর শিল্পদৃষ্টিও প্রয়োজন।

ইদানিংকার রোপণে তরুবীথি অমিশ্র রাখার প্রতি কর্তৃপক্ষ উদাসীন। এজন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনার বিপর্যয় সম্ভব। এমন দৃষ্টান্ত ঢাকার পথে কম নেই। বীথিতরুর সৌন্দর্যহানির ক্ষেত্রে সেগুলিও যদৃচ্ছা ছাঁটাইও কম দায়ী নয়। প্রয়োজনবোধে ডালপালা কেটে ফেলা কর্তব্য হলেও তাতে যত্ন, জ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধ থাকা চাই। ডালকাটার পর ক্ষত নিরাময়ের কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না। তাই গাছের কাণ্ডে গর্ত ও আনুষঙ্গিক ক্ষয় সর্বত্র বহুলদৃষ্ট। এইসব ত্রুটি সংশোধন প্রয়োজন।

(ঙ) নগরপথ : পথ শহরের ফুসফুস। লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গের এর সম্পর্ক নিবিড়। বাড়িঘর, যানবাহন আকীর্ণ এই কৃত্রিম সমাবেশের মাঝখানে ছায়াঘন প্রশান্ত রাস্তা কর্মক্লান্ত মানুষের কাছে স্বস্তির আশ্বাস। তাই এতে অর্থব্যয়ে সঙ্কোচ নিষ্প্রয়োজন। বরং রাস্তাই একমাত্র স্থান যার আয়েস ও সৌন্দর্য শহরের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে স্পর্শ করে। শহরের জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে পথের প্রথম স্থানই প্রাপ্য। অথচ আমাদের শহরপথ সংকীর্ণ, ফুটপাত হতাশাব্যঞ্জক এবং পথের পাশে ঘাসবিছানো হেঁটে বেড়ানোর জায়গা অনুপস্থিত।

প্রসঙ্গত প্যারীর স্যাঁজেঁ লিজেঁর দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। প্রায় ২৫০ ফুট চওড়া এ পথের দুধারে ৩১ ফুট ফুটপাত, তারপর একসারি গাছ, আবার ৩৮ ফুট সমান্তরাল ঘাসের লন, আবার একসারি গাছ এবং শেষে মাঝের ৮৫ ফুট গাড়ীপথ। আমাদের শহরে এমন দুএকটি রাস্তা তৈরি কি অসম্ভব? ইংরেজ জাতির কৃপণতায় অতিষ্ঠ রবিনসনের ক্ষোভ প্রসঙ্গত স্মরণীয়। ফরাসী দেশের অনুকরণে লণ্ডনের রাস্তাঘাট ঢেলে সাজানোর জন্য তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় নি। তিনি বলেছিলেন যে, এ-পর্যায়ে দৈন্য ঠিক অর্থের নয়, পরিকল্পনার। আমাদের ক্ষেত্রেও উক্তিটি অনেকাংশে সত্য।

(চ) বনানী : আমাদের শহরে কোনো বনানী নেই। পার্ক থেকে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের জন্য এর গুরুত্ব সমধিক। এখানে অজস্র গাছপালার ভিড়ে বিবিধ আকার, আয়তন, আকৃতি, বর্ণ ও

গ্রথনের বিচিত্র বিন্যাস সম্ভব। পার্ক যতবেশি মার্জিত, বনানী সেই পরিমাণে প্রাকৃতিক। তার শোভায় গভীর অরণ্যের স্মৃতি। এখানে নিয়মের পীড়ন নেই। এর সবই সহজ, স্বাভাবিক এবং প্রকৃতির আপন নিয়মে সুস্থিত। আধুনিক শহরের মাঝখানে এক টুকরো অনূঢ় অরণ্যের সাক্ষাতেই বিস্ময়ের চমক থাকে। শুধু গাছপালাই নয়, হরিণ, খরগোস, কাঠবিড়ালী ও নানা জাতের অহিংস পশু-পাখি দিয়ে এর বৈচিত্র্যবৃদ্ধি সম্ভব। এই স্থান বৃদ্ধের অবসর বিনোদন, শিশুদের ক্রীড়া ও কৌতুক এবং নিসর্গীর প্রকৃতি-সান্নিধ্যের পক্ষে আদর্শ।

আমাদের শহরে স্থানাভাব সত্ত্বেও সীমিত আয়তনের বনানী সৃষ্টি অসম্ভব নয়। ছোট ছোট পার্কের জন্য নির্দিষ্ট জায়গার কয়েকটিতে বনানী গড়ে তোলা যায়। ঢাকার উপকণ্ঠস্থ আবাসিক নগরীতে উদ্যান নগরীর আদর্শ গৃহীত হতে পারে। ঢাকার প্রসারমাণ আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজেন্দ্রপুরের শালবনের সম্ভাবনা যাতে অবহেলা ও অত্যাচারে বিনষ্ট না হয় সেজন্য পূর্বাহ্ণ সতর্কতা প্রয়োজন। আমাদের বহু মফস্বল শহরে এবং কক্সবাজার, কাপ্তাই ভ্রমণকেন্দ্রে তা অনুসৃত হতে পারে।

(ছ) আরণ্যক উদ্যান : ঢাকায় বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রস্তুতিপর্বই (১৯৬৫) এখনও শেষ হয় নি। একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্যান সৃষ্টির জন্য অন্যূন আরও বিশ বছর প্রয়োজন। এ পর্যায়ে সিলেট কিংবা চট্টগ্রামের সুগম কোন সংরক্ষিত বনে অন্যূন দশ বর্গমাইল ভূমিতে একটি আরণ্যকে উদ্যান গড়ে তুললে বোটানিক্যাল গার্ডেনের অন্তর্বর্তী পরিপূরক হিসেবে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। বাড়তি আগাছা ও একই প্রজাতির পৌনঃপুন্য সরিয়ে আরও গাছগাছড়া লাগিয়ে নানা জীবজন্তু রেখে সেখানে অতি অল্প সময়ে একটি প্রাকৃতিক বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। বাংলার সর্বমোট উদ্ভিদ-প্রজাতির একটি উল্লেখ্য সংখ্যাসহ স্থানীয় গাছগাছড়ার একটি আদর্শ সংগ্রহ রক্ষাও এভাবে সম্ভব হতো। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তা ভ্রমণশিল্প প্রসারেও আনুকূল্য যোগাত।

(জ) বিবিধ : শহরে ও গ্রামে ব্যক্তিগত বাগান তৈরীতে উৎসাহ যোগানোর জন্য উদ্যানের মডেল প্রদর্শনী ; প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা ; উন্নত ধরনের নার্সারী স্থাপন ; স্কুলে উদ্যান ও প্রকৃতিপাঠের উপর গুরুত্ব ; পক্ষীবৃদ্ধি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ; কৃষিকলেজ ও কলাভবনে নিসর্গ-উদ্যানের (landscape garden) প্রাথমিক কোর্স প্রবর্তন ; জমিদারদের দখলীকৃত বাগান সংরক্ষণ ; স্টেশন, কোর্ট, বাজার এমনি সব জনবহুল স্থানে প্রদর্শনী-উদ্যানের ব্যবস্থা ; গাছপালার নামে শহরের পথ ও অঞ্চলের নামকরণ ; স্কুল, কলেজ, মফস্বল শহর সর্বত্র নিসর্গ-পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যবস্থা এবং এজন্য ক্ষমতাশীল একটি সংস্থা গঠন ; দেশী ও দেশীকৃত গাছগাছড়ার একটি সাধারণ স্থানীয় নামকরণের ব্যবস্থা[৩] ; দ্রুত চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা।

---

৩. দৈনিক অবজারভার পত্রিকায় লেখকের প্রকাশিত 'Pride of the Trees' প্রবন্ধে এ ধরনের কিছু নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল : *Acacia monoliformis* —কণ্ঠীবল্লভ ; *Albizia rechardiana* রাজ শিরীষ ; *Caryota urens* বনসুপারি ; *Cassia nodosa* মণিকাঞ্চন ; *Cassia siamea* - শ্যামসোনাইল ; *Enterolobium saman* - মেঘশিরীষ ; *Eucalyptus citriodora* - পত্রগন্ধা ; *Ficus comosa* নাক্ষপাকুড় ; *Grevillea robusta* পত্রসুন্দর ; *Livistona chinensis* চীনতাল ; *Livistona rotundifolia* কতাল, *Milletia ovalifolia* নীলাঞ্জন ; *Peltophorum inerme*

১৩.
অ্যাভেলিনের 'সিল্‌ভা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণীর' কথা মনে পড়ে। স্থান ও কালের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও দুটি গ্রন্থ অনুপ্রেরণা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে পরস্পর ঘনিষ্ঠ। অ্যাভেলিনের আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি। লেংলি, কেন্ট, রেপ্টন, রবিনসন প্রমুখ নিসর্গ-শিল্পী ও বৃটেনের জনগণ কয়েকশ বছর ধরে সে দেশের নিসর্গ ঢেলে সাজিয়েছেন, প্রকৃতির বিশাল ক্যানভাসে অ্যাভেলিনের স্বপ্নকে চিত্রায়িত করেছেন। কিন্তু আমরা কি বনবাণীর আদর্শে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়েছি ? শিল্পপ্রসারের এ যুগে আমরা কি দেশের প্রকৃতিকে রক্ষা ও তাকে সুন্দরতর করার প্রয়াসে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখিয়েছি? বলাবাহুল্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রাম্য এবং অনীহা পর্বততুল্য।

ঈপ্সিত জাতীয় নিসর্গ-বিন্যাস একটি মহৎপরিকল্পনা। এমন কোন পরিকল্পনার সার্বিক রূপায়ণে জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা অপরিহার্য। কোন সহযোগিতাই সার্থক নয় যদি না তা উৎসারিত হয় মনের গভীরে প্রবহমান কোন শাশ্বত চেতনা থেকে। তাই শুধু উপযোগিতা নয়, ভালবাসা হোক তরুচর্চা ও তরুচর্যায় আমাদের মূল প্রেরণা। সেদিনই আমাদের এ প্রয়াস সার্থক হবে যেদিন আমাদের চেতনার গভীর থেকে উৎসারিত হবে কবিগুরুর সেই বাণী :

> 'হে তরু এ ধরাতলে রহিব না যবে
> সেদিন বসন্তে নব পল্লবে পল্লবে
> তোমার মর্মর ধ্বনি পথিকেরে ক'বে
> ভালবেসেছিল কবি বেঁচেছিল যবে '

ঢাকা, ১৯৬৫

উদ্ধৃতি সূত্র

১. পি. এম. জোয়াডের এ উক্তি Flowering Trees in India - M.S. Randhawa–তে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৮
২. Man in Nature - Marston Bates - p. 104
৩. Man the Unknown - Alexis Carrel. p. 58
৪. প্রাগুক্ত–২, পৃ. ৯৬
৫. প্রাগুক্ত–২, উদ্ধৃত, পৃ. ১০৫
৬. বনবাণী—রবীন্দ্র রচনাবলী ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৪
৭. ঋগ্বেদ, গিরীজা প্রসন্ন মজুমদার কৃত প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদবিদ্যায় উদ্ধৃত, পৃ. ১২
৮. প্রাগুক্ত–৬, পৃ. ১১৩
৯. বলাই—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্রা, শতবার্ষিকী সংকলন, পৃ. ৫৭৩
১০. বাংলার বাউল গান—অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৫০

কনকচূড়া; *Delonix regia* কৃষ্ণচূড়া; *Spathodia campanulata* রুদ্র পলাশ; *Gliricidia maculata* মধুমাধব।

১১. প্রাগুক্ত-১, পৃ. ১৩
১২. ভারতের চিত্রকলা-অশোক মিত্র, পৃ. ২৩
১৩. কালিদাসের কাব্যে ফুল—সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর, দ্রষ্টব্য।
১৪. আমার ঘরের আশে-পাশে—ড: তারক মোহন দাস, পৃ. ৪
১৫. মেঘদূত, (উত্তর মেঘ), অনুবাদ নরেন্দ্র দেব, পৃ. ৬৮
১৬. বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডা: নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৫৫৫
১৭. Magic Garden-Rosetta E. Clarkson. p. 128-136
১৮. Lotus and the Robbot--Arthur Koestler, p. 209-210
১৯. Gardens of Great Mughals-C.M.V. Stuart, p. 27-30
২০. বাবরের আত্মজীবনী—রূপময় পশ্চিম পাকিস্তান-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৮২
২১. প্রাগুক্ত-১৯, পৃ. ২
২২. Indian Architecture, E.B. Havell. pp. 157-158
২৩. প্রাগুক্ত-১৯, পৃ. ২৬৮-২৬৯
২৪. প্রাগুক্ত-১২, পৃ. ২
২৫. প্রাগুক্ত-১, পৃ. ৫৯
২৬. Trees and the English Landscape, Paul Edwards. p.-54
২৭. তপোবন, প্রাগুক্ত-৯, পৃ. ২২৭
২৮. প্রাগুক্ত-৩, পৃ.৩৪।

চাঁপা
মাইকেলিয়া চম্পকা

চাইর কোনা পুষ্কুনির পারে চাম্পা নাগেশ্বর
ডাল ভাঙ্গ পুষ্প তুল কে তুমি নাগর।'

মৈমনসিংহ গীতিকা

মধ্যম বৃক্ষ। কচি মুকুল রেশম-উজ্জ্বল। পত্র ৮″ — ১০″ দীর্ঘ, বর্শাফলকাকৃতি, প্রায় মসৃণ। পত্রবৃন্ত $\frac{৩}{৪}$″ — ১″ দীর্ঘ। ফুলের বর্ণ ম্লান-হলুদ কিংবা সোনালী, তীব্র সুগন্ধী। প্রস্ফুটিত ফুলের ব্যাস ২″; পাপড়ি-সংখ্যা প্রায় ১৫, মুক্ত, ছুরির ফলার মত। ফুলের মধ্যবর্তী একটি দণ্ডের গোড়ায় একগুচ্ছ পরাগকেশর এবং দণ্ডের সর্বত্র গর্ভকেশর সর্পিলভাবে বিন্যস্ত। ফল গুচ্ছবদ্ধ, বহু গোলাকৃতি ফলকণিকার সমাহার এবং একটি দণ্ডে যুক্ত। ফলপুঞ্জের দৈর্ঘ্য ৩″—৬″। বীজ গাঢ় বাদামী কিংবা কালচে লাল।

ঢাকার সেন্ট্রেল উইমেন্স কলেজে আমরা একসার চাঁপাগাছ লাগাই। গাছে প্রথম কলি আসার পরপরই কী জন্য যেন অনেকদিন কলেজে যাওয়া হয় নি। আজও মনে পড়ে, জুন মাসের এক সকালে কলেজে গিয়ে দেখলাম সবকটি চাঁপাগাছ ফুলে ফুলে ভরে গেছে, মধুগন্ধ ছড়িয়ে আছে সারা কলেজে, দুতলার বারান্দায়, তিনতলার ক্লাসঘরে এবং প্রবল ঢেউয়ের মতো। চাঁপার সঙ্গে আমার আশৈশব পরিচয়, কিন্তু তার এমন প্রচণ্ড অথচ অনুপম মধুরিম অস্তিত্বের কথা জানা ছিল না।

ফুলের সুষমা ও সুগন্ধের জন্য কাব্য, কলা, উপহার, অর্চনা সর্বত্রই চাঁপার ব্যবহার। এই স্নিগ্ধ বর্ণ ও উজ্জ্বল সৌরভ পবিত্রতার প্রতীক বলে চাঁপার সমাদর আমাদের ঘরে ঘরে। বৃদ্ধি দ্রুত, জীবন দীর্ঘ, চাষ সহজ এবং প্রস্ফুটন অফুরান। বসন্তের মধুর উষ্ণতায় চাঁপার বন ফুলে ফুলে ভরে ওঠে, বাতাস মদির হয় মধুগন্ধে, এই মাধুর্য তুলনাহীন। বাড়ির প্রাঙ্গণ, বাগান, বিদ্যায়তন, পার্ক, চৌরাস্তার মোড় এর ঘনবদ্ধ সারি কিংবা ঝোপের পক্ষে দুইই উপযুক্ত স্থান। হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে চাঁপা অত্যন্ত পবিত্র। তাই সিংহলে বুদ্ধমূর্তি তৈরীর জন্য এই কাঠ বহুল ব্যবহৃত।

চাঁপার কাণ্ড সরল, উন্নত, মসৃণ এবং ধূসর বর্ণ। যদিও শাখার সংখ্যা বহু তবু মূলকাণ্ড কখনোই শাখা-প্রশাখার ভিড়ে লুপ্ত হয় না। ঋজু কাণ্ড অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এজন্যই তার ঈর্ষাকৃতি ও প্রায়-কৌণিক ভঙ্গি। পাতা চ্যাপ্টা, উজ্জ্বল-সবুজ, একান্তরে ঘনবদ্ধ এবং উপপত্র খড়-পাণ্ডুর, ক্ষণস্থায়ী। ফুল একক, কাক্ষিক এবং বর্ণে ম্লান-হলুদ, রক্তিম কিংবা প্রায় সাদা। বসন্ত-গ্রীষ্ম প্রস্ফুটনের কাল। সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় ফুলের পাপড়ি বিকীর্ণ ভঙ্গিতে উন্মুক্ত এবং তীব্র সুগন্ধি। চাঁপাকলি দীর্ঘ-গোলাকৃতি, সুডৌল, সূক্ষ্মাগ্র এবং

এজন্য অনুপম অঙ্গুলির উপমা। ফুল ঝরে গেলে চাঁপাগাছ ফলে ফলে ভরে ওঠে। ফল কাক ও শালিকের প্রিয় খাদ্য। অজস্র ফল শক্তিক্ষয়ের কারণ বিধায় ফলের প্রাচুর্যে অনেক সময় পরবর্তী প্রস্ফুটন হ্রাস পায়। এজন্য কচি ফল কেটে ফেলাই প্রচলিত রীতি। বীজ ছাড়াও কলমে চাষ সম্ভব।

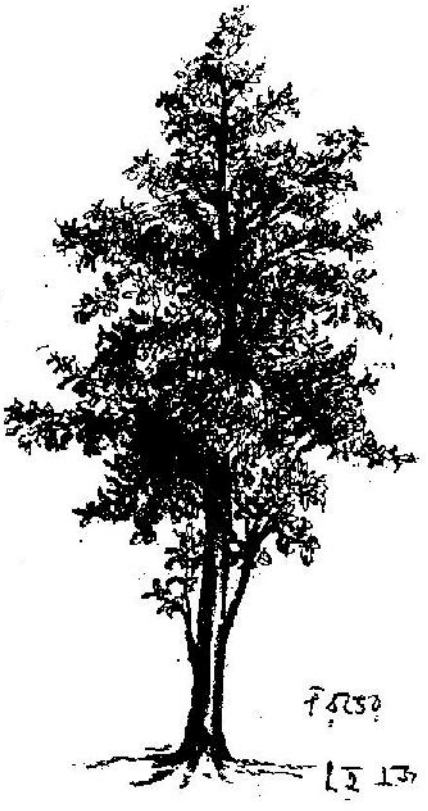

চাঁপার ভেষজ গুণ বহু। বাকল ও ফুল বাতরোগের ঔষধ, ফুলের আরক চক্ষুরোগে ব্যবহার্য। ফল ও বীজ পাকস্থলীতে উপকারী। চাঁপা-গাছের সার বাদামী রঙের, নরম, কিন্তু স্থায়ী, পালিশে উত্তম, তাই আসবাব ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য।

বাংলা-ভারত উপমহাদেশ ও মালয়ের উষ্ণাঞ্চল জন্মস্থান। ঢাকায় ব্যক্তিগত বাগানের বাইরে চাঁপা দুষ্প্রাপ্য হাটখোলা ও ডেমরা রোডের সন্ধিস্থলে, সেগুন বাগিচা, সিদ্ধেশ্বরী অঞ্চলে চাঁপা গাছ দৈবাৎ চোখে পড়ে। শহরের সম্ভাব্য স্থানে ব্যাপক রোপন খুবই জরুরী। বীজ থেকে চারা জন্মান সহজ। অবশ্য পিঁপড়ার উপদ্রবের জন্য বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। বর্তমানে একটি বড় চাঁপাগাছ আছে শিল্পকলার বকুলতলায়, একটি সারি আছে শাহবাগ লাগোয়া যাদুঘরের সীমানায় পুকুরপারে।

'মাইকেলিয়া' হলো ফ্লরেন্সবাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী (১৬৭৯-১৭৩৭) পি. এ. মাইকেলির স্মারক। চম্পকা সংস্কৃত নামের লাতিন তর্জমা।

Family : *Magnoliaceae*. Sc. name. : *Michelia champaca* Linn. Syn. : *M. aurantiaca* wall. Beng. : Champa, Hindi. : Champ, Champa. Champaka. English. : Golden Champa. Place. : Hatkhola. Segun Bagicha etc. (1965).

দেবদারু

পলিএ্যালথিয়া লংগিফলিয়া

> *'চেয়ে চেয়ে মনে হলো, ওই একটি দেবদারুর মধ্যে যে শ্যামল শক্তির প্রকাশ সমস্ত পর্বতের চেয়ে তা বড়ো, ঐ দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে'।*
>
> রবীন্দ্রনাথ

সরল, উন্নত, পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র দীর্ঘাকৃতি, ৫″ — ৮″ × ১″ — ২″, ঘন সবুজ; পত্রপ্রান্ত তরঙ্গিত; পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, বর্ধিত; পত্রবৃন্ত ১/৪″ দীর্ঘ। ফুল ক্ষুদ্র, সবুজাভ, ঈষৎ সুগন্ধি। পাপড়ির সংখ্যা ৬, ৩/৪″ — ১″ দীর্ঘ, ছড়ান। ফল ডিম্বাকৃতি, গুচ্ছবদ্ধ, ৩/৪″ লম্বা; বোঁটা ১/২″, দৃঢ়। বীজ মসৃণ।

রবীন্দ্রনাথ দেবদারুর উপর কবিতা লিখেছিলেন। অবশ্য এটি নন্দলাল বসুর এক পত্রপটের প্রত্যুত্তরে লিখিত কাব্যলিপি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলংগে, আর নন্দলাল কার্সিয়াংগে। শিল্পী হিমালয়ের পটভূমিতে দেওদার গাছের ছবি এঁকে কবিগুরুর নিকট পাঠালেন। তুলির ইঙ্গিতকে কবি ভাষায় রূপ দিলেন ঃ

> "তপোমগ্ন হিমাদ্রির বক্ষরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
> বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারু রূপে।"

কবির দৃষ্টিতে দেবদারুর যে-বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে প্রকটিত সন্দেহাতীতভাবে তা বৈজ্ঞানিকের আয়ত্তাতীত বিষয়। তবু বিজ্ঞানী এখানে আপত্তি উত্থাপন করবেন এবং কবির কাছে মূল্যহীন হলেও বিজ্ঞানীর কাছে তা অত্যন্ত মৌলিক। কারণ, দেওদার আর দেবদারু এক নয়। দেওদার পাইন জাতীয়, বৈজ্ঞানিক নাম 'সিড্রাস দেওদারা'। তাদের বাহ্যিক সাদৃশ্যটি বৈজ্ঞানিক বিচারে নৈকট্যের সূত্র নয়। এই তরুদ্বয় সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই গোষ্ঠীভুক্ত, তাদের এক করে দেখা বিজ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব।

দেবদারু হিমালয়ের আত্মজ নয়, সে সিংহলী। তবু দেবদারু আমাদের দেশজ তরুরই অন্যতম। তার প্রসার এ দেশে মানুষের সযত্ন পরিচর্যার অপেক্ষা রাখে নি। বাংলাদেশের সর্বত্রই দেবদারু সহজদৃষ্ট।

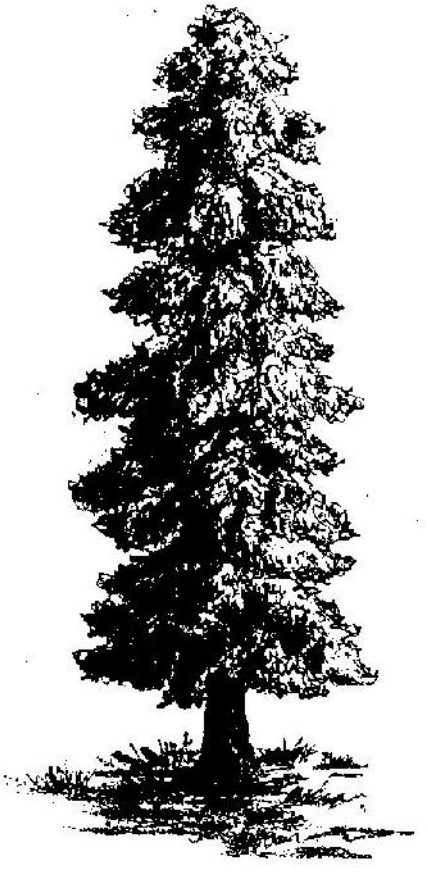

প্রকৃতির রাজ্যে ভারসাম্য রক্ষার নিয়মের জন্যই আমরা দেখি যার রূপ নেই, তার গুণ আছে, যার গন্ধ নেই বর্ণে সে অনন্য. দেবদারুর পৌষ্পিক দৈন্য খুবই স্পষ্ট। আয়তন ও আকৃতিতে এই ফুলেরা যেমন সাধারণ, বর্ণেও তেমনি তারা পাতার ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এ দৈন্য ছাপিয়ে উঠেছে তার সুশ্রী দেহভঙ্গি আর পাতার ঐশ্বর্য।

দেহের সৌষ্ঠবে দেবদারুর শ্রী অনন্য। সরল, উন্নত, আকাশচুম্বি উদ্ধত এমন ভঙ্গির তুলনা এ-দেশের তরুরাজ্যে সহজলভ্য নয়। ইংরেজি নাম "মাস্ট ট্রী"। মাস্তুলের যোগ্য তুলনা বৈকি। ঢাকায় দেবদারুর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু অক্ষত, সম্পূর্ণ দেবদারু শহরে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। নীলক্ষেতের দেবদারু বীথির দুরবস্থাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিদ্যুৎ-সংস্থার কর্মচারীদের নির্মমতার জন্যই তাদের এই বিকৃতি, এই বিকলাংগতা।

এদের কাণ্ড ধূসর, অমসৃণ, রুক্ষ এবং পাতা বর্শাফলকের মত দীর্ঘ, হ্রস্ববৃন্তক, প্রান্ত মৃদু আন্দোলিত, গাঢ় সবুজ, প্রায় কালোর কাছাকাছি। কিন্তু কচি পাতার রং মিশ্র হলুদ-সবুজে আশ্চর্য উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। বসন্তের শুরুতে এদের কচি পাতার ঝালরকে উজ্জ্বল আলোয় অপরূপ দেখায়। দেবদারু ছায়ানিবিড়, তাই পথতরুর আদর্শ। শাখা-প্রশাখা দীর্ঘ নয় এবং বিন্যাসের একটি নির্দিষ্ট ধরন রয়েছে বলেই অনেক সময় পিরামিডাকৃতি হয়ে ওঠে, মূল কাণ্ড কখনই শাখায়নে লুপ্ত হয় না, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উদ্ধত থাকে। শুধু সবুজের ঐশ্বর্যে নয়, পাতার স্বপনেও দেবদারু আকর্ষণীয়। পাতারা আনত, ভূ-মুখিন। শীত পাতা ঝরার দিন। বসন্তে নতুন পাতা আসার পরপরই প্রস্ফুটন শুরু হয়। সমস্ত সঞ্চয় পত্রসজ্জায়

[illegible]িত বলেই হয়ত ফুলের এ দৈন্য। শাখাপ্রান্তে গুচ্ছবদ্ধ হলুদ-সবুজে মেশান ছোট ফুলের বড়ই সাদামাটা।

পাতার ভিড়ে নিষ্প্রভ এই প্রস্ফুটন মৃদু সুগন্ধি। ছটি মুক্ত দলে গঠিত ফুল যেন ছোট্ট একটি অনুজ্জ্বল তারা। গর্ভকেশর মুক্ত এবং বহু সংখ্যক। তাই, একটি ফুল থেকেই পরিণত অবস্থায় একগুচ্ছ ফল জন্মে। এই গুচ্ছফলের প্রতিটি ফলকণা এক-একটি গর্ভকেশরেরই পরিণতি। বর্ষাকাল ফল পাকার সময়। দেবদারুর পাকা ফলের রং বেগুনী-কালো। বাদুড় এই ফলের ভক্ত বিধায় রাতে দেবদারু গাছে এদের ভীড় জমে। বীজ থেকে খুব সহজেই চারা জন্মে এবং বৃদ্ধি কিছুটা মন্থর।

দেবদারুর অর্থকরী ব্যবহার সীমিত। কাঠ সাদা রঙের এবং বাক্স, পেটরা, পেন্সিল, ড্রাম ইত্যাদিতে ব্যবহার্য। বাকল থেকে নিম্নমানের আঁশ সংগ্রহ সম্ভব। পাতা গৃহ ও তোরণ সজ্জার উপকরণ। দেবদারুর একটি বিশিষ্ট উপপ্রজাতি আছে, সৌন্দর্যে সে অপরূপা, নাম : পলিঅ্যালথিয়া লংগিফলিয়া ভেরাইটি প্যানডুলা। ঢাকার এয়ারপোর্টের পূর্বদিকে একটি বাড়ির লন-এর একটিমাত্র গাছ দৈবাৎ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে (১৯৬৫)।

পলিএ্যালথিয়া গ্রীক শব্দ, অর্থ সর্বরোগহর কিংবা সমার্থবোধক কিছু। লংগিফলিয়া লাতিন শব্দ, অর্থ দীর্ঘপত্রী। দেবদারু পাতার আকৃতির জন্যই এই নাম।

নীলক্ষেত ছাড়াও দেবদারু শহরের নানা জায়গাসহ শেরে-বাংলা নগরে সংসদ অ্যাভিন্যুর পশ্চিমের মাঠে দেখা যায়। প্যানডুলা ভেরাইটি এখন ঢাকার সর্বত্র, বিমানবন্দরের সড়কে অনেকগুলি আছে।

Family : *Anonaceae*. Sc. n. : *Polyalthia longifolia* Hk. F. & T. Syn : *Guatteria longifolia* wall. Beng. : Debdaru. Debdar. Hindi : Debidar. Asok. Eng. : Mast tree. Indian Fir. Place : Nilkhet (1965).

সজ্‌না

মোরিংগা ওলিফেরা

'এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিমসাদা—রং তার আশ্বিনের আলোর মতন।'

জীবনানন্দ দাশ

মধ্যমাকৃতি নমনীয় পত্রমোচী বৃক্ষ। বাকল স্থূল। পত্র যৌগিক, ১২″—৩০″ দীর্ঘ, ত্রিপক্ষল। পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, $\frac{১}{২}$″— $\frac{৩}{৪}$″ দীর্ঘ। মঞ্জরি বিরাট, শাখায়িত, বহুপৌষ্পিক। ফুলের ব্যাস ১″, সাদা, সুগন্ধি। দল চমসাকৃতি ঊর্ধ্ব পরাগকেশর ৫, বন্ধ্যা ৫। ফল ৯″—১৮″ দীর্ঘ, সভঙ্গ, সবৃন্ত, ঝুলন্ত।

সজ্‌নার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। সে আমাদের সর্বাধিক প্রিয় ও পালিত তরুর অন্যতম। মূল আবাস পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্যভূমি হলেও আজ বাংলাদেশ-ভারতের সর্বত্র এবং আরও বহু দেশে এর সংখ্যা অজস্র। সজ্‌না দুর্মর। সাধারণ কলম থেকেই প্রজনন। সহজ সংখ্যাবৃদ্ধি এবং মানুষের প্রয়োজন এই দু'য়ের জন্যই এমন ব্যাপক বিস্তার। সীমিত আকৃতি ও আয়তন এবং বহুপত্রের ঘনবিন্যাসে গাছের মাথাটি ততটা জমাট নয় বলেই অত্যন্ত স্বল্প আয়তনের মধ্যেই সজ্‌নার স্থানসংকুলান সম্ভব। এজন্যই বাড়ির উঠোন, ঘরের কোণ, এমনি যত্রতত্র এদের আমরা লক্ষ্য করি। সজ্‌নার বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত ও পরমায়ু দীর্ঘ।

সজ্‌নার কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, গাঁটযুক্ত, অমসৃণ, ধূসরবর্ণ ও অজস্র আঁচড়ে ফাটলে চিহ্নিত এবং শাখা এলোমেলো, আনম্য ও কোমল। সজ্‌নার পাতা তরুরাজ্যের এক দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের ত্রিপক্ষল যৌগিক পত্রকে হঠাৎ একটি ক্ষুদ্র শাখা বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। পত্রিকাগুলি ডিম্বাকৃতি, ক্ষুদ্র, উপরে ঘনসবুজ, নীচে পাণ্ডুবর্ণ, অসংখ্য এবং তৃতীয় পত্রাক্ষে বিন্যস্ত। এই গাছ ছায়ানিবিড় নয়। পত্রসজ্জা বিক্ষিপ্ত এলোমেলো, কিন্তু চিকন কারুকার্যে আকর্ষণীয় ও সুন্দর। পাতা থেকে ফুলের দুধসাদা রং অবধি সজ্‌নার সারাদেহ একটি শোভন কোমলতামণ্ডিত যা বড়ই আকর্ষণীয়। এই বৃক্ষ পত্রমোচী-শীতের শুরুতেই নিষ্পত্র এবং বৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত কয়েক মাস নিরাভরণ থাকে।

সজ্‌নার মঞ্জরি বিরাট, বহু শাখায় বিভক্ত এবং ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। ফুল ছোট, বাঁকান। দশটি দীর্ঘ পাপড়ির মধ্যে নয়টিই পেছনে ঘুরান, শুধু একটিই সামনে আগানো। অসম ছ'টি

পরাগ কেশরের ঘন-কমলা পরাগকোষগুলি সাদা পাপড়ির মাঝখানে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়। সর্বোপরি মধুগন্ধ সজনা ফুলের অতিরিক্ত আকর্ষণ। বাসি ফুল হলুদ, কুঁড়ি সবুজ এবং তাজা ফুল সাদা। তাই নতুন কুঁড়ি, তাজা ও পুরনো ফুলের সবুজে সাদায়

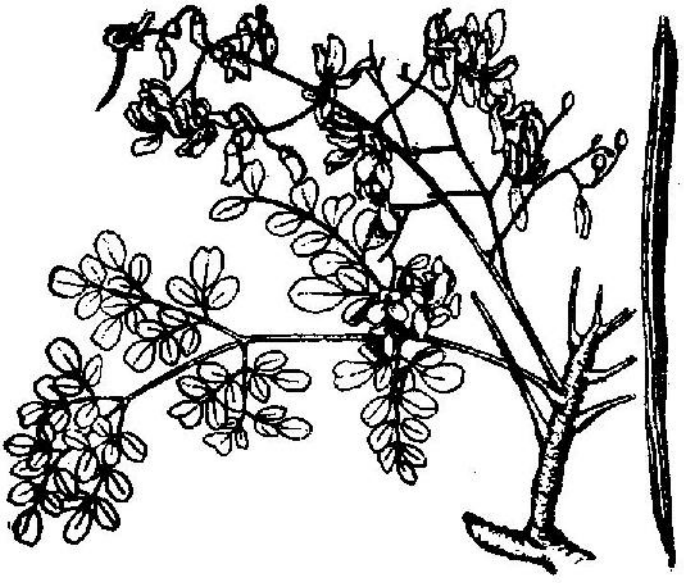

হলুদে এই বিরাট মঞ্জরি এক বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। নিষ্পত্র অবস্থা ছাড়া প্রায় সারা বছরই ফুল ফোটে। তবে বসন্ত থেকে বর্ষা পর্যন্তই প্রস্ফুটন সর্বাধিক। সজনার ফল 'সজনা-ডাঁটা' নামে পরিচিত। দীর্ঘ, ঝুলন্ত, সভঙ্গ এই ফল বহুবীজীয় ও মাংসল। বীজ পক্ষল।

সজনার কুঁড়ি, ফুল ও ফল ব্যবহৃত সব্জী। বীজ-তৈল স্বচ্ছ, বর্ণহীন এবং ঘড়ির তেল ও প্রসাধন তেলের উপকরণ। এটি বাতের অন্যতম মালিশ। বাকল থেকে সংগৃহীত আঁশ দড়ির উপাদান। বসন্ত-রোগের প্রতিষেধক হিসেবেও সজনার সুখ্যাতি আছে। ঢাকার সর্বত্র এ তরু চোখে পড়ে। দুটি বড় গাছ আছে পাবলিক লাইব্রেরির চত্বরে।

মরিংগা সজনার মালাবারীয় নাম। ওলিফেরা লাতিন শব্দ, অর্থ তৈলপৃক্ত।

Family : *Moringaceae*. Sc. n. : *Moringa oleifera* Lamk. Syn. : *M. pterygosperma* Gaertn. ; *Hyperanthara moringa* wild. Beng. : Sajina, Sajna. Urdu : Sahajna. Eng : Horse radish tree, Place : Public Library Campus (1965).

কামরাঙ্গা

অ্যাভেরা ক্যারেম্‌বলা

'ছোলঙ্গ ডালিম্ব বেল নরঙ্গি কমলা।
শ্যামতারা কামরাঙ্গা আর সদা ফলা॥
ছেব জলপাই কালাজাম অতিশয়।
খোরমা খরমুজ আনারস শোভাময়॥'

মুহম্মদ জীবন

ক্ষুদ্র বৃক্ষ। পত্র যৌগিক, একপক্ষল, জোড়পক্ষ পত্রিকা সংখ্যা ৫—১১, ডিম্বাকৃতি, কৌণিকশীর্ষ, মসৃণ, বিপ্রতীপ, $১\frac{১}{২}$″ — ৩″ দীর্ঘ। পত্রাক্ষের প্রথম পত্রিকা ক্ষুদ্রতর। মঞ্জরি অনিয়ত, শাখায়িত, কাণ্ড ও শাখা থেকে উদ্‌গত কিংবা পত্রকাক্ষিক। ফুল ক্ষুদ্র। পাপড়ি যুক্ত, ঘণ্টাকৃতি, $\frac{১}{৪}$″ প্রশস্ত, গোলাপী ও বেগুনী-সাদা রেখায় চিহ্নিত। পরাগকেশর সংখ্যা ১০, অসমান, তন্মধ্যে ৫টি ক্ষুদ্রতর, বন্ধ্যা ও পরাগকোষশূন্য, অন্য ৫টি সম্পূর্ণ ও উর্বর। ফল ডিম্বাকৃতি, ৩″—৫″ × $১\frac{১}{২}$″ — $২\frac{১}{২}$″, ৫ শিরাবিশিষ্ট, মাংসল, পক্কাবস্থায় হালকা হলুদ।

কামরাঙ্গা সুশ্রী তরু। ঢাকায় কোনো পথেই ছায়াতরু হিসাবে এটি রোপিত হয় নি। কোন ব্যক্তিগত বাগান কিংবা জলা-জঙ্গলপূর্ণ কোন পতিত জায়গা ছাড়া কোথাও এদের দেখা মেলে না। হাইকোর্টের পূর্বদিকে পার্ক-এভিনিউর কোল ঘেঁষে যে এক ফালি জঙ্গল সারা শহরের জনকোলাহলে একান্ত বেমানানভাবে অক্ষত, ওখানে একটি কামরাঙ্গা গাছ উপেক্ষা সত্ত্বেও আজও দিব্যি বেঁচে আছে। কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, শাখায়িত এবং শীর্ষ ছত্রাকৃতি, বাকল ধূসর-মসৃণ, পত্র যৌগিক এবং পত্রিকা-বিন্যাস বিপ্রতীপ, শীর্ষপত্রিকা সজোড়, কচিপাতা তামাটে লাল এবং এজন্য নতুন পাতাভরা কামরাঙ্গা গাছ রক্তিম। এই গাছ কোন সময়ই একেবারে নিষ্পত্র হয় না বলে সবুজ ও তামাটে পাতার মিশ্রণে কামরাঙ্গা গাছ সারা বছরই রূপসী। বৈশাখ-শ্রাবণে প্রস্ফুটন। লালচে রঙের ফুলের প্রাচুর্য না থাকলেও বিক্ষিপ্ত মঞ্জরি সৌন্দর্যে নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। কামরাঙ্গার ফল ডিম্বাকৃতি, মাংসল, পাঁচ শিরাবিশিষ্ট। কাঁচা ফল সবুজ, পাকা ফল হালকা হলুদ। শরৎ-হেমন্ত ফল পাকার সময়।

কামরাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর ফল না হলেও বিবিধ ব্যবহার প্রচলিত। খাওয়া ছাড়াও জেলী, জ্যাম, আচার ও শরবতে সুস্বাদু এবং গন্ধ মিষ্টি এবং স্বাদ মুখরোচক। ফল অভ্যন্তরীণ রক্তস্রাবে উপকারী।

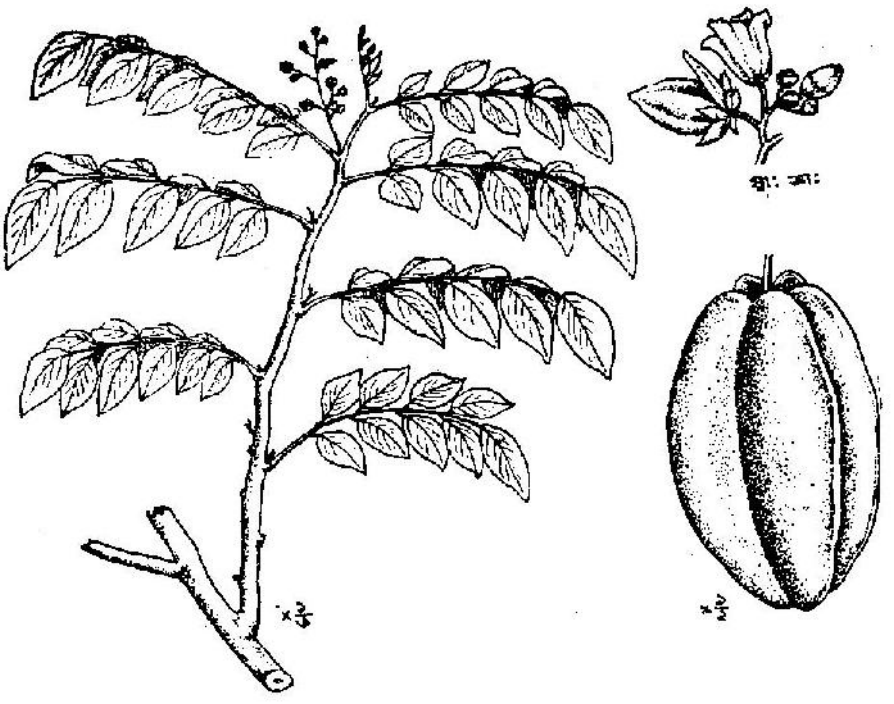

'চিনি-কামরাঙ্গা' সর্বশ্রেষ্ঠ ভেরাইটি, কিন্তু টক-কামরাঙ্গার মতো সুগন্ধি নয়। কাঠ দৃঢ়, স্থায়ী এবং ঘরের কাজে ব্যবহার্য। হামের প্রতিষেধক হিসাবে ডাল দরজায় রাখার রীতি প্রচলিত। জোড়কলমেই কামরাঙ্গা চাষ নির্ভরযোগ্য। এ তরুর মূল আবাস সম্পর্কে নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। আদিস্থান হয়ত আমেরিকা। তবু ইদানিং সব গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ব্যাপক প্রসার। অ্যাভেরা নাম আরবীয় চিকিৎসাবিদ আভেরয়স্-এর স্মারক। ক্যারেমবলা কামরাঙ্গার স্পেনীয় নাম।

Family : *Geraniaceae*. Sc. name : *Averrhoa carambola* Linn. Beng. : Kamranga. Hindi-Urdu : Kamrankha. Eng : Karambola apple. Chinese gooseberry etc. Place : Park Avenue near High Court, Eskaton Road. etc.(1965).

জারুল

ল্যাজারস্ট্রমিয়া স্পেসিওজা

'ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ দুপুর চিল একা নদীটির পাশে
জারুল গাছের ডালে বসে বসে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে।'

জীবনানন্দ দাশ

মধ্যমাকৃতি, পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র বৃহৎ, ৬″—৮″ দীর্ঘ, আয়তাকার, মসৃণ। পত্রবৃন্ত $\frac{১}{৪}$″—$\frac{১}{২}$″। মঞ্জরি অনিয়ত, শাখায়িত, বহুপৌষ্পিক ও প্রান্তিক। ফুল বেগুনী, ২″—২$\frac{১}{২}$″ প্রশস্ত। বৃতি সবুজ, দৃঢ়, স্থায়ী এবং ৬ বৃত্যংশে বিভক্ত। পাপড়ি ৬, প্রায় ১″ দীর্ঘ, কোমল এবং আন্দোলিত-প্রান্তিক। পরাগকেশর অসংখ্য, হলুদ বর্ণ ফল ডিম্বাকৃতি, বৃতিযুক্ত, $\frac{৩}{৪}$″—১″ দীর্ঘ ও ৫-৭ অংশে বিভাজ্য, কঠিন। বীজ $\frac{১}{৩}$″ দীর্ঘ, কৌণিক।

বাংলাদেশের নিম্নভূমির অন্তরঙ্গ তরুদের অন্যতম এই জারুল। কিন্তু জলাভূমি ছাড়াও স্বাভাবিক শুষ্কতায়ও বাঁচে। অন্যথা, ঢাকাবাসীর পক্ষে জারুলের আশ্চর্য প্রস্ফুটন দেখা অসম্ভব হত। ঢাকায় বীথিতরুর প্রস্ফুটনের বর্ণবৈচিত্র্যে লালের ভাগ যত বেশি বেগুনীর অংশ সেই পরিমাণেই কম। জারুল সেই দুষ্প্রাপ্য বর্ণ-ঐশ্বর্যের অধিকারী। রোকেয়া হলের আশেপাশে, নীলক্ষেতে, রমনা পার্কে এবং মিন্টো-বেলী রোডে জারুলের অঢেল প্রাচুর্য। গ্রীষ্মের শুরুতে এই উজ্জ্বল প্রস্ফুটন ঢাকার পথ-শোভায় উজ্জ্বলতা ছড়ায়।

জারুলের কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, মসৃণ, ম্লানধূসর এবং শীর্ষ অজস্র শাখায় ছত্রাকৃতি। খসেপড়া বাকলের আঁকাবাঁকা চিহ্নে চিত্রিত কাণ্ড অনেকটা পেয়ারার সঙ্গে তুলনীয়। পাতা লম্বা, চওড়া এবং গাঢ়-সবুজ। জারুলের বয়স্ক পাতা অনেক সময় রক্তিম। এই পাতার পিঠের রঙ ঈষৎ ম্লান, পত্রবিন্যাস বিপ্রতীপ। শীত পাতা-খসানোর দিন। অবশ্য গাছটি দীর্ঘদিন নিষ্পত্র থাকে না। নিরাভরণ শাখা বসন্তের শেষে আবার কচি পাতার উজ্জ্বল সবুজে ভরে ওঠে এবং পরপরই আসে প্রস্ফুটনের ঢল। শাখান্তের বিশাল মঞ্জরি, উজ্জ্বল বেগুনী বর্ণের উচ্ছলতা এবং ঘনসবুজ পাতার পটভূমিকায় উৎক্ষীপ্ত পুষ্পাচ্ছটা শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, সৌন্দর্যে অনন্যও।

জারুল ফুলের বেগুনী রঙ যেমন আকর্ষণীয় তেমনি শোভন-সুন্দর তার পাপড়ির নমনীয় কোমলতা। ছয়টি মুক্ত পাপড়িতে গঠিত এই ফুল বেগুনী, কখনও সাদার কাছাকাছি পৌঁছয়। পুরনো পাপড়ি পাণ্ডুবর্ণ এবং যেহেতু মঞ্জরি বহু-পৌষ্পিক, তাই সাদায় বেগুনীতে মিলেমিশে প্রস্ফুটনে সবসময়ই বৈচিত্র্যের রেশ থাকে। ফুলের কেন্দ্রে বহু খাটো পুংকেশর পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, তাদের পরাগকোষ হলুদ। বৃতি দৃঢ়, ধূসর-সবুজ, রোমশ ও যুক্ত। পাপড়ির মতো স্বল্পায়ু নয়, প্রস্ফুটনের শেষেও বৃতি ঝরে পড়ে না, ফলের সঙ্গে লেগে থাকে।

ফল ডিম্বাকৃতি ও বৃতিযুক্ত। প্রস্ফুটনের পরপরই শাখা ফলভারে নুয়ে পড়ে। অবশ্য প্রথম প্রস্ফুটনের পর ফুলের প্রাচুর্য মন্দা হলেও বর্ষা থেকে শরৎ অবধি জারুল গাছে ফুলের রেশ লেগে থাকে। বছর ঘুরে এলে পাতা ঝরার দিনে খসে পড়ে এই ফলেরাও। বীজ পক্ষল এবং সহজেই অংকুরিত হয়। বৃদ্ধিও দ্রুত, মাত্র পাঁচ-সাত ফুট উঁচু গাছও অনেক সময় প্রস্ফুটিত হয়। দৃঢ়তা, দীর্ঘায়ু, বর্ণসজ্জা এবং প্রস্ফুটনের ঐশ্বর্যে জারুল আদর্শ পথতরুই নয়, বাগান আর বাড়ির প্রাঙ্গণেও রোপণযোগ্য। জলসহিষ্ণু বিধায় দূরদূরান্তরগামী জনপথের দু'পাশের নিচু জলাভূমিতে রোপণের পক্ষে জারুল খুবই উপযুক্ত।

জারুল আমাদের অন্যতম প্রয়োজনীয় কাঠের যোগানদার। লালচে রঙে এই কাঠ দৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী এবং বহু কাজে ব্যবহার্য। ঘরের কড়ি-বরগা থেকে নৌকা, গরুর গাড়ি, চাষের যন্ত্রপাতি, সাধারণ আসবাব সবই এ কাঠে তৈরি হয়। এই কাঠ আবার আর্দ্রতাসহিষ্ণু। জারুলের ভেষজ মূল্যও কম নয় : শিকড় বিরেচক, উত্তেজক ও জ্বররোধী, পাতা ও বাকল রেচক, বীজ নিদ্রাকর্ষী। জারুলের আদি-আবাস চীন, মালয় ও বাংলা-ভারতের জলাভূমি অঞ্চল। নামের প্রথমাংশ 'লেজারস্ট্রমিয়া' সুইডেনের অন্যতম তরু-অনুরাগী ল্যাজারস্ট্রমের (১৬৯১—১৭৫৯) স্মারক। 'স্পেসিওজা' লাতিন শব্দ, অর্থ সুন্দর।

ঢাকায় জারুলের একটি অন্তরঙ্গ প্রজাতি আছে যার বাংলা নাম বিলাতী জারুল, বৈজ্ঞানিক নাম 'ল্যাজারস্ট্রমিয়া থরেলিয়াই'। এটিও জারুলের আয়তনবিশিষ্ট, কাণ্ড আরো মসৃণ, অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ আর পাতা লম্ব-ডিম্বাকৃতি এবং আয়তনেও অনেকটা ছোট, আকারে পেয়ারা পাতার খুবই ঘনিষ্ঠ, কচি পাতা তামাটে। এরাও জারুলের মতোই পত্রমোচী এবং পত্রমোচনের কালও এক। কিন্তু ফুল ফোটে জারুলের অনেক পরে, ঘন বর্ষায় আর ফুল আয়তনে জারুলের চেয়ে অনেক ছোট এবং বর্ণেও ঈষৎ অনুজ্জ্বল। কিন্তু এই প্রস্ফুটনের প্রাচুর্য দীর্ঘস্থায়ী এবং উজ্জ্বলতা শরৎ অবধি অব্যাহত। তাই সৌন্দর্যের বিচারে সে জারুলের চেয়ে অধিকতর আকর্ষী। ফল ডিম্বাকৃতি এবং ছোট। কার্জন হল ছাড়াও ঢাকা ক্লাবের পূর্ব-উত্তর কোণে একসারি সুদৃশ্য বিলাতী জারুল এখন পূর্বস্থানে নেই। টেনিক কমপ্লেক্সের পাশে একটি ও একটু দূরে পার্কে কয়েকটি আছে। আদি আবাস কোচিন-চীন।

Family. : *Lythraceae*. Sc. name : *Lagerstroemia speciosa* pers. Syn. : *L. flos-reginal* Retz. Beng. : Jarul. Hindi : Jarul. Eng. : Queen Flowr. Place : Nilkhet (1965). *Lagerstroemia thorellii gagnep*. New Dhaka Club (1965).

সিলভার ওক
গ্রিভেলিয়া রবস্টা

'বৈশাখ মাসেতে সখী পঞ্চফুল ফুটে
দেখিয়া ফুলের রূপ নারীপ্রাণ ফাটে।'

মোহাম্মদ আলী রাজা

দীর্ঘ বৃক্ষ। কাণ্ড সরল, উন্নত। পত্র পক্ষবৎ খণ্ডিত, ৪″—৬″, পত্রপৃষ্ঠ রূপালি। মঞ্জরি ৩″—৪″ দীর্ঘ। ফুল ছোট, হলুদবর্ণ এবং মঞ্জরিদণ্ডের একপার্শ্বে বিন্যস্ত। পত্রপুট সংখ্যা ৪ পরাগকেশর ৪। ফল দীর্ঘাকৃতি, ঈষৎ চ্যাপ্টা, $\frac{৩}{৪}″ \times \frac{১}{৫}″$।

ইংরেজি নাম সিলভার ওক। পাতার এক পিঠ ঘন-সবুজ, অন্য পিঠ ঝলমলে রূপালী এবং শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যই হয়তো নামকরণের কারণ। কোনো বাংলা নাম নেই। এ আমাদের দেশী গাছ নয়। সে পরদেশী এবং সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় আদি জন্মভূমি। কিন্তু পাকিস্তান, ভারত এবং সিংহলেও সহজলভ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আবহাওয়া উর্বর বৃদ্ধির অনুকূল। গাছের সৌন্দর্যও খুবই আকর্ষনীয় : সরল গোলাকৃতি কাণ্ড, ঝালরের মতো চিকন-কাটা পাতা, প্রায় কৌণিক শীর্ষ এবং হলুদ মঞ্জরি বড়ই দৃষ্টিনন্দন। হাওয়ার আন্দোলনে এলোমেলো পাতার সবুজ ও রূপালী রঙের ইতস্তত বিক্ষেপ আমাদের দেশজ তরুতে খুবই বিরল। সীমিত পরমায়ু এ গাছের একটি বড় ত্রুটি। মাত্র পঁচিশ বছরেই জরা দেখা দেয় এবং দুরারোগ্য ক্ষয়ে পাতা ও শাখারা খসে পড়ে, প্রাণবন্ত উন্নত ভঙ্গিটি অবক্ষয়ে বিধ্বস্ত হয়, পাতার সংখ্যা কমে আসে, শাখারা রিক্ত বিবর্ণ হয়, ধীরে ধীরে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া নামে। হাইকোর্টের সামনের রাস্তার বিপর্যস্ত গ্রিভেলিয়া বীথিই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রিভেলিয়ার কাণ্ড অজস্র সরু সরু লম্বা ফাটলে রুক্ষ, অমসৃণ, ধূসরবর্ণ আর নাতিদীর্ঘ শাখাগুলি উপরে এবং প্রায় ভূসমান্তরাল ছড়ান থাকে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক গ্রিভেলিয়ার গড়ন প্রায় কৌণিক। কিন্তু পরবর্তীকালে আকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং এলোমেলো শাখা প্রশাখায় এই বিশিষ্ট ভঙ্গির কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না। সে চিরহরিৎ, পত্রসজ্জা আকর্ষণীয়, কিন্তু ছায়ানীবিড় নয়। বৈজ্ঞানিক বিচারে ফলক এককপত্রী হলেও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ছাড়া সেটি ধরা সহজ নয়। পক্ষবৎ খণ্ডিত এই ফলক অনেকটা ফার্ন-পাতার মতো এবং একে যৌগিক বলে ভুল করা সহজ। চিকন করে ঝালরের মত কাটা পাতার সবুজ ও রূপালী রং একটি আকর্ষী

বৈশিষ্ট্য। মঞ্জরির উজ্জ্বলতাও অবশ্য কম আকর্ষী নয়। বসন্ত প্রস্ফুটনের কাল। ফুল অত্যন্ত ছোট, গাঢ়-কমলা এবং মঞ্জরিদণ্ডের একপার্শ্বে গুচ্ছবদ্ধ। পুষ্পবিন্যাসের এই ধরনটি কিন্তু অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। মঞ্জরির আকার ও আকৃতি বেশ বড় এবং এজন্য পত্রের দ্বিবর্ণ পটভূমিতে এই স্বর্ণাভ দীপ্তি মনোহারী।

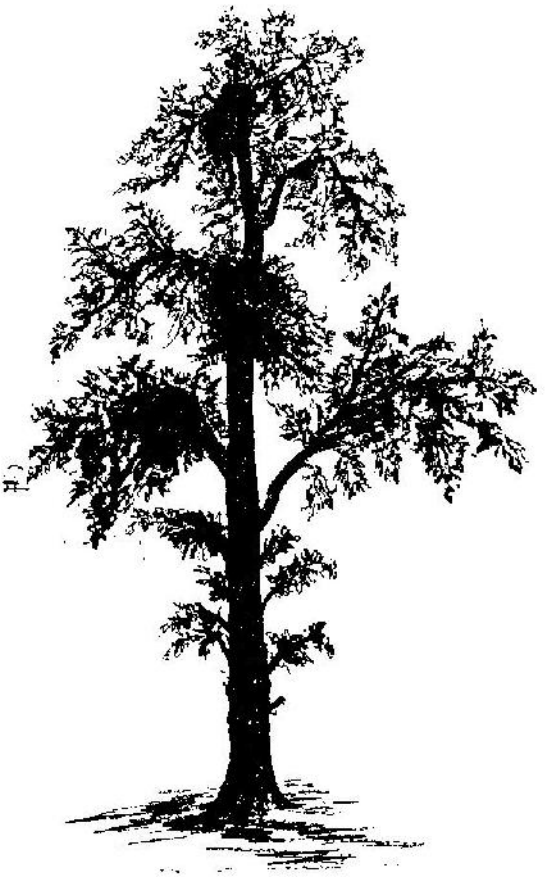

অস্ট্রেলিয়ায় মূল্যবান আসবাবে ব্যবহার্য এই কাঠ শক্ত, সুন্দর এবং সুদৃশ্য রেখায় চিত্রিত। আমাদের দেশে পথতরু হিসেবেই সমাদর। আমেরিকায় টব-জাত গ্রিভেলিয়া গৃহসজ্জার উপকরণ।

গ্রিভেলিয়া নামটি লণ্ডন রয়েল সোসাইটির সহ-সভাপতি ও উদ্ভিদতত্ত্বে উৎসুক সি. এফ. গ্রিভেলের স্মরণিক। রবস্টা লাতিন শব্দ, অর্থ দৃঢ়, বলিষ্ঠ। সম্ভবত কাণ্ডের বৈশিষ্ট্যেই নামটি অর্থবহ।

ঢাকায় কার্জন হল ও হাইকোর্টের মধ্যবর্তী গভর্নমেন্ট হাউস রোডের যে গ্রিভেলিয়ার বীথিটি একদা পথিকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতো বার্ধক্যে তা হতশ্রী (১৯৬৫)। বর্তমানে নেই। একটি জীর্ণ বৃক্ষ আছে নটরডেম কলেজের পশ্চিমে দালানের কিনারে।

বীজ থেকে চারা জন্মান সহজ। বৃদ্ধি খুব দ্রুত নয়। শুধু পথতরুই নয়, বাগান ও বাড়ির প্রাঙ্গণে রোপণের জন্যও রুচিসম্মত।

Family : *Proteaceae*. Sc. name : *Grevillea robusta A.* Cunningham. Eng. name : Silky Oak, Silver Oak. Place : Govt. house Road facing Curzan Hall (1965).

চালতা
ডিলেনিয়া ইন্ডিকা

'আকাশ নীলের তারাখচা পথে বৃষ্টি পড়ে
চালতা ফুলে ফলের বাগান মদির করে।'

বিষ্ণু দে

মধ্যমাকৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র দীর্ঘ, আয়তাকৃতি, রুক্ষ, কর্কশ, দৃঢ়, ৮ — ১৪″ × ৪ — ৬″, প্রান্ত ক্রকচ ; স্ফীতবৃন্ত রোমশ, ১″ — ২″ দীর্ঘ। ফুল একক, বৃহৎ : বৃতি সবুজ, গোলাকৃতি, মাংসল, স্থূল, স্থায়ী ও বর্ধমান। পাপড়ি ৫, মুক্ত, স্বল্পস্থায়ী, স্থূল, সাদা, অডিম্বাকৃতি ; পরাগকেশর অসংখ্য, মুক্ত ; গর্ভমুণ্ড ২০, তারাকৃতি। ফল ৩″ — ৫″ প্রশস্ত, মাংসল, দৃঢ়, আঁশযুক্ত। বীজ অসংখ্য, বৃক্কাকৃতি।

আমাদের অতি পরিচিত চালতার আকর্ষণ ফুলে নয় ফলে। এজন্যই উপযোগবাদী দৃষ্টিতে হারিয়ে গেছে ওর সুন্দর বৈশিষ্ট্য—ফুলের শোভাটি। চালতা ফুল যেকোন সুন্দর ফুলের সঙ্গেই তুলনীয় এবং গঠন-বৈশিষ্ট্যে স্পষ্টতই ম্যাগনেলিয়ার ঘনিষ্ঠ। তাই হঠাৎ আমরা চালতা ফুলের সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়ে কেবলই ভাবি কেনো এতোদিন এটি দেখতে পাইনি, নতুন করে মনে পড়ে কবির সেই আক্ষেপ : 'কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু রয়ে গেল অগোচরে।'

চালতা মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ, কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, শাখাপ্রশাখা এলোমেলো, শীর্ষ প্রায় গোলাকৃতি, ছায়াঘন, ছড়ানো। বাকল লালচে মসৃণ, পাতা দীর্ঘাকৃতি ঘন-সবুজ, দৃঢ়-শিরাবিন্যাসে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে চিহ্নিত, প্রায় খাঁজ-কাটা, প্রান্ত করাতের মতো ধারালো, সূক্ষ্মশীর্ষ ও একান্তরভাবে বিন্যস্ত এবং শাখান্তে কেন্দ্রিত। পাতার আকৃতি ও বিন্যাসে চালতা রূপসী। বর্ষার শুরু প্রস্ফুটনের কাল। ফুল একক, প্রান্তিক এবং অজস্র ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। পাতার গাঢ় সবুজের প্রেক্ষিতে ফুলের বৃহৎ আয়তন, সংখ্যা ও দুধ-সাদা পাপড়ির উজ্জ্বলতা আকর্ষণীয়। ফুলের মৃদু সৌরভ এই বর্ণের মতোই অনুগ্র, স্নিগ্ধ। চালতা ফুলের বৃতির বৈশিষ্ট্যের লক্ষ্যণীয় : বর্ণে সবুজ, মাংসল ও স্থায়ী এবং পরে পরিবর্ধিত অবস্থায় বৃতিই মূলত ফলে রূপান্তরিত। পাপড়ি অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী এবং প্রস্ফুটনের পরদিনই ঝরে পড়ে। বৃতি ও দলের এই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এতটা আর এদেশের কোন ফুলে চিহ্নিত নয়। চালতার পরাগচক্রে অজস্র পরাগকেশর, রঙ ম্লানহলুদ এবং এজন্যই পুষ্পসৌন্দর্যের

আকর্ষী অনুষঙ্গ। বিশটি গর্ভদণ্ডের প্রতীক এর তারকাকৃতি গর্ভমুণ্ড পরাগচক্রের ওপর কিছুটা উৎক্ষিপ্ত। বৃতির সবুজ, দলের শুভ্রতা, পরাগের হলুদ এবং তারকাবৃতি গর্ভমুণ্ড সব মিলিয়ে চালতা ফুলের গড়ন আকর্ষণীয়। ফলের আকৃতি প্রায় গোল, রঙ সবুজ, গ্রথন দৃঢ় এবং স্বাদ টকমিষ্টি। চালতার শাঁস নানা খাদ্যে ব্যবহার্য, জেলি ও শরবত সুস্বাদু। শরৎ-হেমন্ত ফল পাকার সময়। চালতা কাঠ দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী, জ্বালানী ছাড়াও নৌকা ও বন্দুকের বাটে ব্যবহার্য। বাকল ও পাতার রস অরেচক, কিন্তু ফলের রস রেচক। নেপাল, বাংলাদেশ, আসাম, সিংহল ও মালয়ে চালতা সহজ-লভ্য। সম্ভবত এসব অঞ্চলই জন্মস্থান। ঢাকায় নয়াপল্টন ও তেজগাঁয়ে দৈবাৎ এ গাছ চোখে পড়ে।

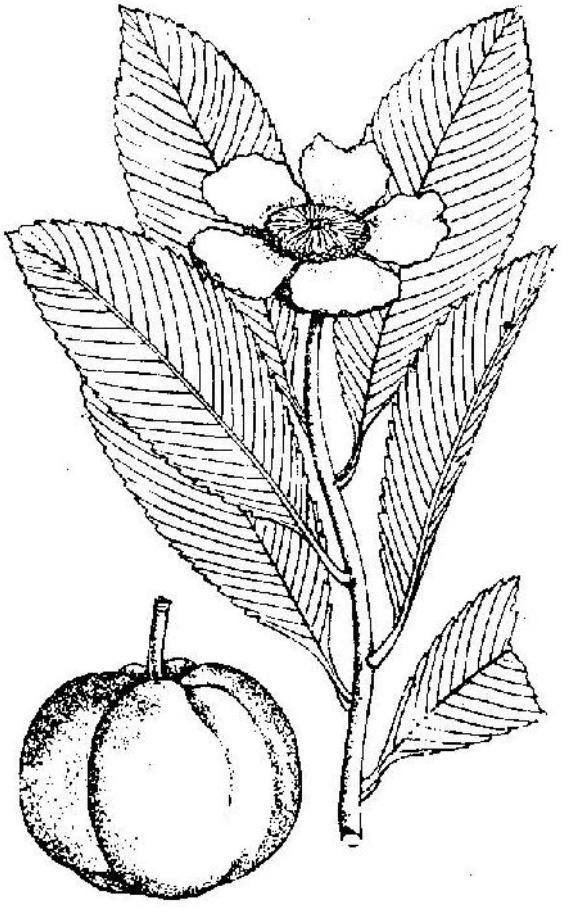

ডিলেনিয়া নামটি অক্সফোর্ডের বিখ্যাত তরুবিদ জে. জে. ডিলেনিয়াসের স্মরণিক এবং এই নামকরণ উদ্ভিদবিজ্ঞানের শ্রেণীনির্ণয়তত্ত্বের জনক লিনিয়াসের কীর্তি। ইণ্ডিকা অর্থ ভারতীয়।

Family : *Dilleniaceae*. Sc. name : *Dillenia indica* Linn. Syn. : *D. speciosa* Thanb. Beng. : Chalta, Chalita. Eng. : Elephant apple. Place : Naya Paltan, Tejgaon (1965).

কনকচাঁপা

ওকনা স্কোয়ারোজা

'হাঁটা না যাইতে কন্যার পায়ে পড়ে চুল
মুখেতে ফুট্যা উঠে কনক চাম্পার ফুল।'

মৈমনসিংহ গীতিকা

ক্ষুদ্রাকৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ। পত্র লম্ব-ডিম্বাকৃতি, হ্রস্ববৃন্তক, ৩″—৫″ দীর্ঘ, কালচে-সবুজ, মসৃণ, চর্ম। মঞ্জরি অনিয়ত, স্বল্পপৌষ্পিক, ২″—৩″ দীর্ঘ ফুল সোনালী-হলুদ, মৃদুসুগন্ধি, ১″—১½″ চওড়া। বৃতি ৫, মুক্ত, সবুজ, স্থায়ী। পাপড়ি ১২, মুক্ত, হলুদবর্ণ। পরাগকেশর অসংখ্য, সোনালী। ফল ৩—১০টি একগুচ্ছে। প্রতি ফলের দৈর্ঘ্য ⅓″, একটি গোলাকৃতি চাকতির উপর বসানো এবং স্থায়ী বৃতিযুক্ত, একবীজীয়, উজ্জ্বল-কালো, নরম।

কনকচাঁপা দেশী গাছ হলেও শুধু ঢাকায়ই নয়, অন্যত্রও সযত্ন লালিত অবস্থায় তেমন দেখা যায় না। দেশজ বলেই কী এই অবহেলা, নইলে রূপগুণে তার তুলনা কোথায়? আজও স্পষ্ট মনে আছে, একবার সিলেট যাবার পথে এক বিলের কাছে একটি হলুদ প্রস্ফুটন দেখেছিলাম। একান্ত অবহেলায় জন্মানো কোন বুনোফুলের এমন শোভা অকল্পিত ছিল। বিলটি ছোট, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এঁকেবেঁকে বহুদূর ছড়িয়ে ছিল। পারে অজস্র কনকচাঁপার গাছ ফুলে ফুলে চারদিক আলো করে দাঁড়িয়ে, ফুলের মধুগন্ধে বাতাস তখন উতলা আর ডালে ডালে অজস্র মৌমাছি আর ভোমরার ভিড়। ভেবে দুঃখ হলো যে, এমন একটি সুন্দর কাব্যিক যোজনা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশেষে অবসিত হবে অথচ কেউ জানবেও না লোকালয়ের এতো কাছে এমন ঐশ্বর্য বছর বছর উপেক্ষিত। মিন্টো রোডে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ফটকের কাছাকাছি যে-কনকচাঁপা গাছটি নেহাৎ সংকোচে উদ্ধত জারুল আর পেলটোফরামের আড়ালে টিকে রয়েছে, দেখলে মনে হয় সে নেহাৎই রবাহূত।

শুরুতেই বলা প্রাসঙ্গিক যে, কনকচাঁপা চাঁপা নয়। বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাসে দুয়ের পার্থক্য দুস্তর। সম্ভবত চাঁপার বর্ণ-গন্ধের সঙ্গে সাযুজ্যই এই নামকরণের হেতু।

কনকচাঁপা

ওকনা স্কোয়ারোজা

'হাঁটা না যাইতে কন্যার পায়ে পড়ে চুল
মুখেতে ফুটা উঠে কনক চাম্পার ফুল।'

মৈমনসিংহ গীতিকা

ক্ষুদ্রাকৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ পত্র লম্ব-ডিম্বাকৃতি, হ্রস্ববৃন্তক, ৩″—৫″ দীর্ঘ, কলচে-সবুজ, মসৃণ, চর্ম মঞ্জরি অনিয়ত, স্বল্পপৌষ্পিক, ২″—৩″ দীর্ঘ। ফুল সোনালী-হলুদ, মৃদুসুগন্ধি, ১″—১½″ চওড়া। বৃতি ৫, মুক্ত, সবুজ, স্থায়ী। পাপড়ি ১২, মুক্ত, হলুদবর্ণ। পরাগকেশর অসংখ্য, সোনালী। ফল ৩—১০টি একগুচ্ছে, প্রতি ফলের দৈর্ঘ্য ½″, একটি গোলাকৃতি চাকতির উপর বসানো এবং স্থায়ী বৃতিযুক্ত, একবীজীয়, উজ্জ্বল-কালো, নরম।

কনকচাঁপা দেশী গাছ হলেও শুধু ঢাকায়ই নয়, অন্যত্রও সযত্ন লালিত অবস্থায় তেমন দেখা যায় না। দেশজ বলেই কী এই অবহেলা, নইলে রূপেগুণে তার তুলনা কোথায়? আজও স্পষ্ট মনে আছে, একবার সিলেট যাবার পথে এক বিলের কাছে একটি হলুদ প্রস্ফুটন দেখেছিলাম। একান্ত অবহেলায় জন্মানো কোন বুনোফুলের এমন শোভা অকল্পিত ছিল। বিলটি ছোট, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঐঁকেবেঁকে বহুদূর ছড়িয়ে ছিল। পারে অজস্র কনকচাঁপার গাছ ফুলে ফুলে চারদিক আলো করে দাঁড়িয়ে, ফুলের মধুগন্ধে বাতাস তখন উতলা আর ডালে ডালে অজস্র মৌমাছি আর ভোমরার ভিড়। ভেবে দুঃখ হলো যে, এমন একটি সুন্দর কাব্যিক যোজনা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশেষে অবসিত হবে অথচ কেউ জানবেও না লোকালয়ের এতো কাছে এমন ঐশ্বর্য বছর বছর উপেক্ষিত। মিন্টো রোডে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ফটকের কাছাকাছি যে-কনকচাঁপা গাছটি নেহাৎ সংকোচে উদ্ভত জারুল আর পেলটোফরামের আড়ালে টিকে রয়েছে, দেখলে মনে হয় সে নেহাৎই রবাহুত।

শুরুতেই বলা প্রাসঙ্গিক যে, কনকচাঁপা চাঁপা নয়। বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাসে দুয়ের পার্থক্য দুস্তর। সম্ভবত চাঁপার বর্ণ-গন্ধের সঙ্গে সাযুজ্যই এই নামকরণের হেতু।

গাছটি আয়তনে খুবই ছোট, কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, মসৃণ, বাকল গাঢ়–ধূসর এবং মাথা ছত্রাকৃতি আর পাতা একান্তর বিন্যস্ত ও ছায়ানিবিড়। পরিণত পাতা গাঢ় সবুজ হলেও কচি পাতা উজ্জ্বল তামাটে, অত্যন্ত কোমল ও হাওয়ায় স্পন্দমান। শীতের শেষে পাতা ঝরে যায় আর বসন্তের মাঝামাঝি একই সঙ্গে ভরে ওঠে নিরাভরণ শাখাপ্রশাখা পাতা ও ফুলের প্রাচুর্যে। সারাগাছ তখন ছেয়ে যায় গাঢ় হলুদ ফুল ও তামারং পাতায়, বাতাস সুরভিত হয় মধুগন্ধে, ভোমরা বিবাগী হয় পরাগ–রেণুর প্রলোভনে, তরুতল ভরে ওঠে ঝরে–পড়া পাপড়ির হলুদে। ঠিক এমন একটি তরু সহজপ্রাপ্য নয়। সোনাইলের ফুল হলুদ, কিন্তু গন্ধহীন। পেলটোফরামের রং অবিকল কনকচাঁপার, কিন্তু গন্ধ অত্যুগ্র। কনকচাঁপা এসব ত্রুটিমুক্ত। বর্ণে–গন্ধে সে অনন্য, অনুপম, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কনকচাঁপার মঞ্জরি ছোট, কিন্তু সংখ্যায় অজস্র, সারা গাছে ঘন-বিক্ষিপ্ত। ফুলের বৃতি ৫টি মুক্ত বৃত্যংশে গঠিত, চর্মবৎ, স্থায়ী। পাপড়ি বহু, সর্বাধিক বারো, মুক্ত। হলুদ পরাগচক্র বহু কেশরের সমাহার এবং বর্ণে সোনালী–হলুদ। ফল গুচ্ছবদ্ধ, প্রতিটি ফল কাল, একবীজীয় এবং রক্তিম বৃতিমধ্য একটি উঁচু চাকতিতে বসান।

কনকচাঁপার শিকড় দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা এবং সর্পাকৃতি। সাঁওতালদের কাছে এজন্যই হয়তো এটি দংশনের প্রতিষেধক। ছালের রস হজমিকারক। কাঠ শক্ত এবং লাঠি, খুঁটি ইত্যাদির উপযুক্ত।

আদিনিবাস আমাদের দেশসহ বর্মা, সিংহল ও দক্ষিণ ভারত।

ওকনা গ্রীক শব্দ, অর্থ হলো নাসপাতি। ওর কোন কোন প্রজাতির সঙ্গে নাসপাতির পাতার সাদৃশ্য থেকেই এই নামকরণ। স্কোয়ারজা লাতিন শব্দ, অর্থ হলো রুক্ষ।

বীজ সহজেই অংকুরিত হয়, কিন্তু বৃদ্ধি মন্থর। উদ্যান ও গৃহের প্রাঙ্গণে রোপণের জন্য কনকচাঁপা আদর্শ।

পূর্বস্থানে নেই। ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য।

Family : *Ochnaceae*. Sc. name : *Ochna squarrosa* Linn. Bengali : Kanak Chapa. Place : Minto Road, near Hotel Intercontinental (1965).

তেলশুর

হোপিয়া ওডরেটা

'ওগো মহাশাল তুমি সুবিশাল কালের অতিথি;
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গিতে
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্মর সংগীতে
মঞ্জরির গন্ধের গণ্ডুষে।'

রবীন্দ্রনাথ

দীর্ঘ, পর্ণমোচী বৃক্ষ। পত্র ডিম্বাকৃতি, ৩″—৪″ × ১½″, সূক্ষ্মকোণী, মসৃণ, ঘন-সবুজ, হ্রস্ববৃন্তক। পত্রবিন্যাস একান্তর। পত্রবৃন্ত ⅜″ দীর্ঘ মঞ্জরি নিয়ত, শাখায়িত, ঈষৎ আনত। ফুল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, নবনীতাভ, মৃদু সুগন্ধি। ফুল-মুকুল ½″ দীর্ঘ, পাপড়ি ম্লান-হলুদ। ফল শুষ্ক, গোলাকৃতি, দ্বিপক্ষল, পক্ষ প্রায় ২″ দীর্ঘ, গাঢ়বাদামী এবং সমান্তরাল শিরাচিহ্নিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের উত্তরে অর্ধবৃত্তাকার ফুলার রোডের যে-অংশ আণবিক গবেষণা কেন্দ্রের কাছে বখশীবাজার রোডে মিশেছে তার দু'পাশের ছায়াঘন উন্নত তরুবীথিটি তেলশুর গাছের। এদের বলিষ্ঠ উন্নত ভঙ্গিতে তো শালেরই প্রতিচ্ছবি ব্যক্ত এবং তুলনাটি নিতান্তই কাল্পনিক নয়। তেলশুর ও শাল সমগোত্রীয়। ঢাকা শহরে শালবন কিংবা শালবীথি নেই। তাই শহরবাসীর পক্ষে তেলশুর ও শালের পার্থক্য নির্ণয় কিছুটা কঠিন। তেলশুরের কাণ্ড সরল, উন্নত, দীর্ঘ, গোলাকৃতি; বাকল গাঢ়-ধূসর, প্রায় কালো এবং অজস্র ফাটলে রুক্ষ, অমসৃণ। বহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষীপ্ত, প্রায় ভূসমান্তরালে প্রসারিত শাখায় ডিম্বাকৃতি ঘন-সবুজ পাতাগুলি সরু, দীর্ঘ প্রশাখান্তে একান্তরে ঘনবিন্যস্ত। তাই তেলশুর ছায়ানিবিড়। সব মিলিয়ে ঢাকার পথতরুর মধ্যে সে বিশিষ্ট এবং সৌন্দর্যেও আকর্ষণীয়। গাছটি পত্রমোচী। শীতের শুরুতে পাতারা ঝরে পড়ে শীতের উদাসী ব্যঞ্জনার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে ওঠে। পরিপূর্ণ নিঃস্ব, রিক্ত এই তরুশাখায় বসন্তের শেষে হঠাৎ সবুজের ঢল আসে, উদ্দীপ্ত যৌবন অবারিত হয় সারা দেহে। সমস্ত গাছ জুড়ে প্রাণবন্ত কচি সবুজের সেই ঔজ্জ্বল্য এক অনুপম দৃশ্য। তারপরই আসে প্রস্ফুটন। ফুল খুব ছোট হলেও মঞ্জরির উপচে-পড়া প্রাচুর্য এবং ম্লান-হলুদ বর্ণ-নির্ঝর যথেষ্টই আকর্ষণীয়। ফুল ধুনো-গন্ধি বিধায় পুষ্পিত তেলশুর বীথির সান্নিধ্য লোভনীয়। বছরে কয়েকবার পুষ্পিত হলেও প্রথম

প্রস্ফুটনের প্রাচুর্য গ্রীষ্মের শুরুতেই দেখা দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাতা ও ফুলের চেয়ে ফলের সৌন্দর্য কিছুমাত্র কম। উচ্ছিত প্রস্ফুটনের মতো অজস্র এই ফলেরা প্রথমে সবুজ এবং পরে বাদামী রঙে সারা গাছ ছেয়ে ফেলে। স্বল্পদিনের জন্য হলেও পাতার রং তখন চাপা পড়ে যায় পরিপক্ব ফলের শোভায়। বর্ষার শুরুতে ফলভারে আনত এ গাছের দৃশ্য যেমন আকর্ষণীয় তেমনি দুষ্প্রাপ্যও। তেলশুরের ফল অবশ্য খুব ছোট, প্রায় গোল কিংবা দণ্ডিম্বাকৃতি এবং লম্বা-চওড়া দুটি পাখাযুক্ত। পক্ষল ফলমাত্রেই বায়ুবাহী এবং বীজ ছড়ানোর পক্ষে অভিযোজনাটি খুবই ফলপ্রসূ। বীজ সহজেই অংকুরিত হয় এবং বৃদ্ধিও খুব মন্থর নয়। মূল আবাস ব্রহ্মদেশ হলেও বাংলাদেশের আবহাওয়া তেলশুরের অনুকূল। ঢাকায় বহু স্থানে ইদানিং পথপাশে নতুন গাছ চোখে পড়ে। কাঠ মূল্যবান, দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী এবং নিকট্যাম্রীয় গর্জন ও শালের মত এ থেকেও ধূনা নিষ্কাশন সম্ভব। হোপিয়া হলো এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক জন হোপের স্মরণিক। ওভরেটা অর্থ সুগন্ধি। ফুলের ধূনাগন্ধের জন্য এই নামকরণ। পূর্বস্থানে এখনও আছে। শহরে যত্রতত্র চোখে পড়ে।

Family : *Dipterocarpaceae*. Sc. name : *Hopea odorata* Roxb. Beng. : Telsur, Dhunagacha. Place : North of Jagannath Hall, Fuller Road.

কালোজাম

সাইজোজিয়াম কিউমিনি

'গ্রামকিনারে জামের বনে সবুজশোভা লাগবে ভালো
পাকবে যখন ফলের গোছা চোখ জুড়ানো চিকন কালো।'

কালিদাস

বিরাট বৃক্ষ। পাতা ডিম্বাকৃতি, ৩ ″ — ৬ ″ × ২ ″ — ৪ ″, হ্রস্ববৃন্তক, মসৃণ, চর্মবৎ, শীর্ষ সূক্ষ্ম, ঈষৎ বর্ধিত। পত্রবৃন্ত $\frac{১}{২}$ ″ — ১ ″। মঞ্জরি ক্ষুদ্রাকৃতি, শাখান্বিত, স্বল্পাপেক্ষিক। ফুল ক্ষুদ্র, সাদা, মৃদু সুগন্ধি। বৃতি যুক্ত $\frac{১}{৮}$ — $\frac{১}{৫}$ ″, নলাকৃতি, স্থায়ী, সবুজ। পাপড়ি বৃতির অনুরূপ, কিন্তু সাদা ও স্বল্পায়ু। পরাগকেশর অজস্র, বিচ্ছুরিত এবং বৃতিনলের সমদীর্ঘ। ফল ডিম্বাকৃতি $\frac{১}{২}$ ″ — ১ $\frac{১}{২}$ ″, এক-বীজীয়, মাংসল, রসালো, বেগুনি-কালো।

কালোজাম দীর্ঘাকৃতি বিরাট বৃক্ষ। বড়ো শাখারা ঊর্ধ্বমুখীন, কিন্তু প্রশাখাস্ত দীর্ঘ, আনত। কাণ্ড সরল, উন্নত, ধূসরবর্ণ এবং অমসৃণ। সে চির-হরিৎ এবং শীর্ষ ছাত্রাকৃতি কিংবা ছড়ানো। জামের পত্রবিন্যাস বিপ্রতীপ ও ঘনবিন্যস্ত, তাই ছায়ানীবিড়। পাতার সবুজ রং গাঢ়-উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়।

গ্রীষ্ম প্রস্ফুটনের কাল। অঢেল প্রাচুর্যে প্রস্ফুটিত হলেও অত্যন্ত ছোট ফুলেরা পাতার ভীড়ে প্রচ্ছন্নই থেকে যায়। ফুল মৃদু সুগন্ধি, সাদা এবং বিচ্ছুরিত পরাগচক্রেই সীমিত। পাপড়ি অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী এবং প্রস্ফুটনের শুরুতেই খসে পড়ে।

কালোজাম অন্যতম সুস্বাদু ফল। আমের প্রায় সমকালীন এই ফল পাকার দিন। এসময় চতুর্দিক বিচ্ছিপ্ত ফল, বীজ ও শাঁসে ভরে ওঠে। ফল পাকা অবস্থায় ঘন-কালো, শাঁস বেগুনি ঈষৎ মেশানো রক্তিম, লাল, টকমিষ্টি ও অত্যন্ত পুষ্টিকর।

জামকাঠ নম্র, দীর্ঘস্থায়ী এবং আর্দ্রতা-সহিষ্ণু, কিন্তু পালিশ তেমন উৎকৃষ্ট নয় বলে আসবাবে অব্যবহার্য। ঘরের কাজে জামকাঠ অত্যন্ত উপযোগী। জামের বাকল থেকে কালো ট্যানিন নিষ্কাশন সম্ভব। ফলের রস রক্তবর্ধক। পরিশ্রুত জাম-রস সিরকার

Family : *Dipterocarpaceae*. Sc. name : *Hopea odorata* Roxb. Beng. : Telsur, Dhunagacha. Place : North of Jagannath Hall, Fuller Road.

কালোজাম

সাইজোজিয়াম কিউমিনি

'গ্রামকিনারে জামের বনে সবুজশোভা লাগবে ভালো
পাকবে যখন ফলের গোছা চোখ জুড়ানো চিকন কালো।'

কালিদাস

বিরাট বৃক্ষ। পাতা ডিম্বাকৃতি, ৩″—৬″ × ২″—৪″, হ্রস্ববৃন্তক, মসৃণ, চর্মবৎ, শীর্ষ সূক্ষ্ম, ঈষৎ বর্ধিত। পত্রবৃন্ত ১/২″—১″। মঞ্জরি ক্ষুদ্রাকৃতি, শাখায়িত, স্বল্পপৌষ্পিক। ফুল ক্ষুদ্র, সাদা, মৃদু সুগন্ধি। বৃতি যুক্ত ১/৮″—১/৪″, নলাকৃতি, স্থায়ী, সবুজ। পাপড়ি বৃতির অনুরূপ, কিন্তু সাদা ও স্বল্পায়ু। পরাগকেশর অজস্র, বিচ্ছুরিত এবং বৃতিনলের সমদীর্ঘ। ফল ডিম্বাকৃতি ১/২″—১ ১/২″, এক-বীজীয়, মাংসল, রসালো, বেগুনি-কালো।

কালোজাম দীর্ঘাকৃতি বিরাট বৃক্ষ। বড়ো শাখারা উর্ধ্বমুখীন, কিন্তু প্রশাখান্ত দীর্ঘ, আনত। কাণ্ড সরল, উন্নত, ধূসরবর্ণ এবং অমসৃণ। সে চির-হরিৎ এবং শীর্ষ ছত্রাকৃতি কিংবা ছড়ানো। জামের পত্রবিন্যাস বিপ্রতীপ ও ঘনবিন্যস্ত, তাই ছায়ানীবিড়। পাতার সবুজ রং গাঢ়-উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়।

গ্রীষ্ম প্রস্ফুটনের কাল। অঢেল প্রাচুর্যে প্রস্ফুটিত হলেও অত্যন্ত ছোট ফুলেরা পাতার ভীড়ে প্রচ্ছন্নই থেকে যায়। ফুল মৃদু সুগন্ধি, সাদা এবং বিচ্ছুরিত পরাগচক্রেই সীমিত। পাপড়ি অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী এবং প্রস্ফুটনের শুরুতেই খসে পড়ে।

কালোজাম অন্যতম সুস্বাদু ফল। আমের প্রায় সমকালীন এই ফল পাকার দিন। এসময় তরুতল বিক্ষিপ্ত ফল, বীজ ও শাঁসে ভরে ওঠে। ফল পাকা অবস্থায় ঘন-কালো, শাঁস বেগুনী আঁচ মেশানো রক্তিম, লাল, টকমিষ্টি ও অত্যন্ত পুষ্টিকর।

জামকাঠ দৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী এবং আর্দ্রতা-সহিষ্ণু, কিন্তু পালিশ তেমন উৎকৃষ্ট নয় বলে আসবাবে অব্যবহার্য। ঘরের কাজে জামকাঠ অত্যন্ত উপযোগী। জামের বাকল থেকে কালো ট্যানিন নিষ্কাশন সম্ভব। ফলের রস রক্তবর্ধক। পরিশ্রুত জাম-রস সিরকার

উপাদান। জামের ভেষজমূল্যও ন্যূন নয় : বাকল অরেচক এবং ব্রংকাইটিস ও এ্যজমায় উপকারী, ফল টনিক এবং বীজ বহুমূত্রের ঔষধ।

জামপাতা তসর-পোকার খাদ্য। বৃক্ষটি হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র। আদি-আবাস ভারত, মালয় ও অস্ট্রেলিয়া। ঢাকায় জামগাছ বহু। আজিম পুর ছাড়াও বখশী বাজার রোড, মেডি-কেল কলেজের উত্তরে জামের একটি সুদৃশ্য বীথি রয়েছে (১৯৬৫)। পার্ক রোডেও আছে।

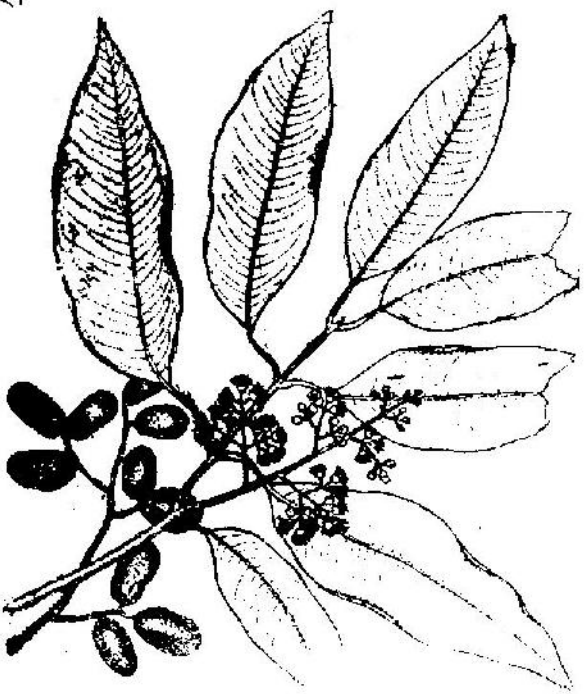

বীজ ছাড়াও কলমে বংশবিস্তার সম্ভব। সাইজেজিয়াম, গ্রিক শব্দ, অর্থ যুগ্ম। জাম্বলানা এ গাছের পর্তুগীজ নামের লাতিন তর্জমা। 'উইজেনিয়া' হলো ১৭শ শতকের তরু-অনুরাগী স্যাভয়ের প্রিন্স ইউজিনের স্মারক। কিউমিনি অর্থ জিরাগন্ধী, সম্ভবত বীজের বিশিষ্ট গন্ধের জন্যই এই নাম।

Family : *Myrtaceae*. Sc. name : *Syzygium cumini* (L) Skeels. Syn. : *Eugenia Jambolana* Lamk. Beng. : Kalojam. Eng. Java plum, Black plum . Place : Bakshi bazar Road, North of Medical College Hostel (1965).

ইউক্যালিপট্যাস সাইট্রিওডোরা

'থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো
মোদের প্রাঙ্গণে ফেল ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুম বর্ষণে। আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিও।'

রবীন্দ্রনাথ

সুউচ্চ, দীর্ঘাকৃতি, চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র দীর্ঘ, বর্শাফলাকৃতি, মসৃণ, গ্রান্থিকীর্ণ, হ্রস্ববৃন্তক, সর্বাধিক ৮" দীর্ঘ, লেবুগন্ধি, চর্মবৎ, একান্তর। পত্রবৃন্ত $\frac{১}{২}$"। মঞ্জরি ক্ষুদ্র, ছত্রাকৃতি। ফুল অতিক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ, অনাকর্ষী, সুগন্ধি। পুংকেশর অজস্র, বিকীর্ণ এবং ফুলের মূল আয়তন ও আকার এতেই সীমিত। ফল $\frac{১}{২}$" প্রশস্ত, ডিম্বাকৃতি, ধূসর।

ইউক্যালিপট্যাস্ অস্ট্রেলীয় বৃক্ষ। প্রকট ভিনদেশী আকৃতির জন্য প্রথম দর্শনেই একে আমরা আলাদা করতে পারি। এমন সুঠাম, সুন্দর আকৃতি, সবল মসৃণ সুডৌল কাণ্ড এবং স্বল্পপত্রী গাছ সহসা চোখে পড়ে না। কাণ্ডের বর্ণ ও মসৃণতা পেয়ারা গাছের খুবই ঘনিষ্ঠ এবং ওরা একই গোত্রজ, তবুও ইউক্যালিপট্যাস্‌কে দেখলে অতিযত্নে তৈরি প্লাষ্টারের বিশাল স্তম্ভের কথাই মনে আসে। ঠিক এমন সুদৃশ্য কাণ্ডের সম্পদ আমাদের দেশে কোন গাছেরই নেই।

স্বল্পবয়স্ক ইউক্যালিপট্যাস্ প্রায় পিরামিডাকৃতি, মাথা কৌণিক, গগনভেদী। শাখায়ন সত্ত্বেও কাণ্ড প্রচণ্ড বলিষ্ঠ, রঙ ম্লান ধূসর, মসৃণ এবং ঝরে পড়া বাদামী বাকলের চিহ্নে কখন কখন চিত্রবিচিত্র। মূল শাখাগুলি ঊর্ধ্বমুখীন হলেও দীর্ঘ চিকন অজস্র প্রশাখারা লকলকে, আনত। এ গাছ চিরহরিৎ, কিন্তু পত্রবিন্যাসে নিবিড়তা নেই। পাতার গঠন বর্শা কিংবা ছুরির ফলার মতো, বিন্যাস একান্তর, গ্রথণ চর্মবৎ, বর্ণ ম্লান-সবুজ, কচি অবস্থায় প্রায় তামাটে। গ্রন্থিকীর্ণ লেবুগন্ধি পাতার উদ্বায়ী গন্ধসার ইউক্যালিপট্যাসের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

বসন্তের শেষ থেকে বর্ষা অবধি প্রস্ফুটনের কাল। নিষ্পত্র শাখান্তে অতিক্ষুদ্র ফুলের প্রায় ছত্রাকৃতি মঞ্জরি অনাকর্ষী হলেও অদৃশ্য নয়। ছড়ানো পাতার মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত গুচ্ছ গুচ্ছ

ফুলের বৈশিষ্ট্যে হিজল অনন্য। এমন বহুপৌষ্পিক দীর্ঘ, ঝুলন্ত মঞ্জরি অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। ছোট অথচ উজ্জ্বল অজস্র ফুলের দীর্ঘ ঝুলন্ত মঞ্জরিতে হিজল বড়ই রূপসী। এ বৈশিষ্ট্যের জন্যই গ্রামবাংলার একান্ত আপন এই প্রিয় বৃক্ষটি কাব্যে, গল্পে এতটা সমাদৃত। ফুল স্বল্পস্থায়ী এবং মৃদু-সুগন্ধি। জলের উপর ঝরে পড়া অজস্র ভাসমান হিজল ফুলের রঙিন আস্তর গ্রামবাংলায় একটি প্রিয়দৃশ্য। গ্রীষ্ম প্রস্ফুটনের কাল।

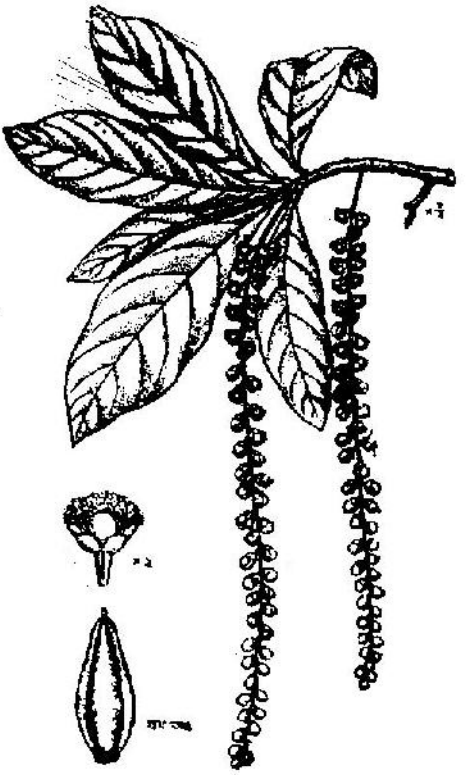

ফুল নিঃশেষে ঝরে গেলেই অজস্র ফলে শাখা নুয়ে আসে। হরিতকির আয়তন ও আকৃতির। এই ফল কঠিন এবং চারশিরাবিশিষ্ট। বীজ থেকে সহজেই চারা জন্মে।

কাঠ সাদা, নরম কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী এবং নৌকা, গরুর গাড়ি ও অন্যান্য সাধারণ কাজের বিশেষ উপযোগী।

ফল তিক্ত, বিরেচক এবং শূলবেদনা ও নাকের ঘায়ে উপকারী, শিকড় কুইনিনের বিকল্প এবং বমনোদ্রেককারী, পাতার রস অতিসার প্রতিষেধক, বাকল ট্যানিংয়ের উপাদান।

এ গাছের আদি আবাস অস্ট্রেলিয়া, মালয় ও বাংলা-ভারত। ছায়া ও প্রস্ফুটনের ঐশ্বর্যে হিজল আমাদের তরুরাজ্যে মর্যাদাবান। বিশেষত জলাভূমি অঞ্চলে রোপণের জন্য ওর নির্বাচন আদর্শ। 'ব্যারিংটনিয়া' নামাংশ ইংরেজ নিসর্গী ডি. ব্যারিংটনের (১৮০০ সাল) নামের স্মারক। 'অ্যাকুইটেংগুলা' অর্থ-সূক্ষ্মকোণী। সম্ভবত ফলের ধারালো শিরের বৈশিষ্ট্যেই নামটি অর্থবহ।

Family : *Myrtaceae*. Sc. name : *Barringtonia acutangula* Gaerln. Beng : Hijal. Hindi : Neork, Hijal, Samundar phul etc. Eng : Indian Oak. Place : Motijheel low land area (1965).

নাগলিংগম্
কুরুপিটা গুয়ানেন্সিস

'বৈশাখ এদেশে বড় সুখের সময়
নানা ফুল গন্ধেমন্দ গন্ধবহ হয়।'

ভারতচন্দ্র

সুউচ্চ বৃক্ষ। পত্র দীর্ঘ, প্রশস্ত, হ্রস্ববৃন্তক, গাঢ়-সবুজ, মসৃণ ৫″—৭″ × ৩″—৪″, পত্রশীর্ষ সুগন্ধি মঞ্জরি বহুপৌষ্পিক, বৃহৎ ও কাণ্ডজাত। পুষ্প উজ্জ্বল, আকর্ষণীয়, বৃহৎ, সুগন্ধি। পাপড়ি ৬, গোলাকৃতি, ২″ দীর্ঘ, রক্ত, ভেতরের রং গাঢ়-গোলাপী, বাহির পাণ্ডুবর্ণ, মাংসল, স্থূল। উর্ধ্বে পুংকেশরসমূহ চ্যাপ্টা একটি দণ্ডে আবদ্ধ এবং গর্ভকেশরের উপর সাপের ফনার মতো উদ্যত। বন্ধ্যা পুংকেশরসমূহ গর্ভকেশরকে ঘিরে অবস্থিত। ফল বিরাট, ৮″ পর্যন্ত প্রশস্ত, মাংসল ও গাঢ়-বাদামী। শাঁস নরম। বীজ অসংখ্য।

নাগলিংগম যে বাংলা নাম নয় তা সহজবোধ্য। কিন্তু একটি বিদেশী গাছের সংস্কৃত নামের তাৎপর্য আবিষ্কার অত্যন্ত জটিল। এ গাছের আদি আবাস দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণমণ্ডল। এতো দূর-দেশ থেকে এদেশে এর আমদানি কবে কখন ঘটেছিল আজ তা আবিষ্কার অসম্ভব। এই নামকরণ গুচ্ছবদ্ধ পরাগচক্রের আকৃতির জন্যই। গাছটি ঢাকায় প্রায় দুষ্প্রাপ্য। হেয়ার রোড ও মিন্টো রোডের সংযোগস্থলে পাকুড় গাছের পাশে এর যে গাছটি রয়েছে* তা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া হাটখোলা অঞ্চল ও তেজগাঁর কৃষিকলেজের পাশেও ক'টি গাছ রয়েছে। বসন্তের শেষে, গ্রীষ্মের শুরুতে ভোরে মিন্টো রোডে বেড়াতে গেলে একটি আশ্চর্য মধুগন্ধে অবশ্যই আপনি চকিত হবেন। একটু খুঁজে দেখলেই হেয়ার রোড ও মিন্টো রোডের সংগমস্থলের পথমধ্যবর্তী গোলাকার জায়গাটায় একটি পুষ্পিত গাছ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রথমেই মনে হবে এমন একটি গাছ আপনি কোথাও দেখেননি। কাণ্ডজাত মঞ্জরির প্রাচুর্য তরুরাজ্যে (ডুমুর, কাঁঠাল) দুষ্প্রাপ্য না হলেও এমন ফুলের ঐশ্বর্য নিঃসন্দেহে দুর্লভ। উজ্জ্বল বর্ণের বড়ো বড়ো ফুলের কাণ্ডোদ্গত মঞ্জরি তরুরাজ্যে অন্যত্র অনুপস্থিত। আপনি বর্ণে, গন্ধে, বিন্যাসে অবশ্যই মুগ্ধ হবেন।

---

* এখন নেই, কাটা গেছে কয়েক বছর আগে।

এমন আশ্চর্য ভোরের একটি মনোহর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনেকদিন আপনার মনে থাকবে।

গাছটি প্রায় চিরহরিৎ। কাণ্ড সরল, উন্নত এবং ঊর্ধ্বে শাখায়িত, শীর্ষ প্রসারিত, বহু শাখায় নিবিড়। বাকল বাদামী-ধূসর, অমসৃণ, রুক্ষ। পাতা দীর্ঘ, প্রশস্ত, বৃন্তের কাছ থেকে চওড়া হয়ে মাথায় সর্বাধিক চওড়া আগা চোখা। কচিপাতা ম্লান-সবুজ, কিন্তু পরিণত অবস্থায় রঙ গাঢ়-সবুজ, প্রায় কালোর কাছাকাছি এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল। গ্রীষ্ম পত্র-মোচনের কাল। কিন্তু বছরে কয়েকবারই পাতা ঝরে, নতুন পাতা গজায়। এদের নিরাভরণ অবস্থা খুবই স্বল্পস্থায়ী। পাতা শাখান্তে কেন্দ্রিত এবং বিন্যাস ঘন-একান্তর। একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যে নাগলিংগম অন্য গাছপালা থেকে স্বতন্ত্র : কাণ্ড থেকে ঝুলন্ত অজস্র মঞ্জরি এবং উজ্জ্বল বিরাট ফুল ও ফলের প্রাচুর্য। দীর্ঘ পুষ্পদণ্ড নিষ্পত্র, বহুপৌষ্পিক। প্রায় মাটির কাছ থেকে বহু উঁচু অবধি কাণ্ড মঞ্জরির প্রাচুর্যে আচ্ছন্ন থাকে। প্রস্ফুটিত এ তরু বর্ণে, গন্ধে উজ্জ্বলতায় তরুরাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ফুলের ব্যাস ২″ — ৩″, পাপড়ি গোল, বাঁকানো, মাংসল এবং ভেতর ও বাইরে যথাক্রমে গাঢ়-গোলাপী ও পাণ্ডুর-হলুদ।

নাগলিংগমের উল্লেখ্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সাপের ফনার মতো বাঁকানো উদ্যত পরাগচক্র। ঠিক এমনটি এদেশের অন্য কোন ফুলে নেই। পরাগদণ্ড সাদা কিংবা ম্লান-গোলাপী ও মাংসল এবং প্রান্ত গর্ভমুণ্ডের উপর উদ্যত। দণ্ডের শুরুতে আরও অসংখ্য যেসব মৃদু-হলুদ পুংকেশর রয়েছে, তারা সবাই পরাগকোষবর্জিত, বন্ধ্য। প্রায় সারা গ্রীষ্মই প্রস্ফুটনের কাল। বর্ষা এবং শরতে প্রস্ফুটনের প্রাচুর্য কমে এলেও একেবারে নিঃশেষিত হয় না।

এ গাছের ইংরেজি নাম 'কেননবল'। সন্দেহাতীত, তা ফলের বৈশিষ্ট্যের জন্যই : বিরাট, গোল, ঘন-বাদামী ফলগুলি কামানের গোলার মতোই। শাঁস প্রায় সাদা, নরম এবং বহুবীজীয়। পচে যাওয়া এই ফলের গন্ধ অত্যন্ত উগ্র ও বিকর্ষী। বীজ থেকে সহজেই চারা জন্মে, কিন্তু বৃদ্ধি মন্থর। কাঠ দক্ষিণ আমেরিকায় আসবাবপত্রে ব্যবহৃত হলেও আমাদের দেশে প্রায় মূল্যহীন। নাগলিংগম তরুরাজ্যে অনন্য বলে কোন বৃহৎ উদ্যানই এ ছাড়া পূর্ণ নয়। কুরুপেটা দক্ষিণ আমেরিকায় এ গাছটির স্থানীয় নাম। গাইনেন্সিস অর্থ—গিয়েনার।

রমনা পার্কে ইদানীং কটি গাছে ফুল ফুটছে। দুটি করে গাছ আছে নটরডাম ও সেন্ট্রাল উইম্যান্স্ কলেজে।

Family : *Lecythidaceae*. Sc. name : *Couroupita guianensis* Auld. Beng. : Nagalingam, Shibalingam. Eng. : Cannon ball tree. Place : Junction of Hare Road & Minto Road (1965).

দেশী বাদাম

টার্মিনালিয়া কাটাপ্পা

"নানা তরুবর মৌলিলরে
গঅনত লাগেলী ডালী॥"

চর্যাগীতিকা

বিরাট, পত্রমোচী বৃক্ষ। শাখাবিন্যাস ঘূর্ণিত। পত্র বৃহৎ ৬″ — ৮″ দীর্ঘ, মসৃণ, ডিম্বাকৃতি এবং শাখান্তে একান্তরে ঘনবিন্যস্ত। পত্রবৃন্ত খাটো, মাংসল, দৃঢ়। মঞ্জরি কাক্ষিক, নাতিদীর্ঘ। পুষ্প অতি ক্ষুদ্র, অনাকর্ষী, এক-লিঙ্গিক ও দ্বিলিঙ্গিক, পাণ্ডুবর্ণ। প্রান্তিক পুষ্প পুংলিঙ্গিক, মূলীয় পুষ্প দ্বিলিঙ্গিক বৃতি ৫ অংশে বিভক্ত। দল ০। ফল লম্বাকৃতি, ঈষৎ চাপা, দুই শিরাবিশিষ্ট, ২″ দীর্ঘ, মসৃণ।

দেশী বাদাম সরল, উন্নত, সুষম ও শোভন বৃক্ষ। কাণ্ড দীর্ঘ, গাঢ়যুক্ত, গাঢ়-ধূসর। ঘূর্ণিত শাখাবিন্যাস ওর আকর্ষী বৈশিষ্ট্য। একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে উদ্গত বিশাল দীর্ঘ ভূসমান্তরাল শাখারা গুচ্ছে গুচ্ছে প্রায় সমদূরত্বে কাণ্ডে বিন্যস্ত। পাতার আকৃতি অনেকটা কাঁঠাল পাতার মতো, কিন্তু আয়তনে কাঁঠাল পাতার বহুগুণ। বর্ণ ঘন-সবুজ, গ্রথন দৃঢ়, গোল কিংবা স্থূলকোণী। ঝরে পড়ার আগে পাতার রং বদলায়, ঘন-রক্তিম হয়ে ওঠে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস থেকেই পাতার রংবদল শুরু হয়। ঘন সবুজ থেকে লালে গড়িয়ে পাতারা শীতের প্রথমেই ঝরে পড়ে এবং বিশাল বাদাম গাছ নিষ্পত্র হয়। বসন্তের মাঝামাঝি গাছে নতুন পাতা গজায় এবং অল্প দিনেই সারা গাছ কচি পাতার উজ্জ্বল সবুজে ভরে ওঠে। পাতাগুলি শাখা-প্রান্তিক এবং বিন্যাস ঘন-একান্তর।

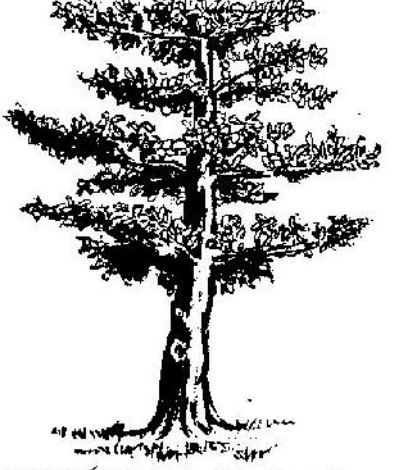

পাতা গজানোর পরই আসে ফুলের দিন অবশ্য সারা বর্ষায় বার কয়েকই ফুল ফোটে. ফুল অত্যন্ত ছোট, ম্লান-হলুদ কিংবা সাদা এবং মঞ্জরি খাটো, অত্যল্প, পাতার আয়তন ও

সৌরভ আমাদের সৌন্দর্যচিন্তার অনুষঙ্গ এবং সেজন্য প্রাচীন সাহিত্যে নাগেশ্বর বহুল-উল্লেখে নন্দিত।

ফলের রঙ প্রথমে তামাটে, পরে বাদামী এবং অনেকদিন ধরেই ফল গাছে থাকে। বীজ তৈলপূর্ণ, মসৃণ। তৈল জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার্য। কাঠ অত্যন্ত দৃঢ় তাই খুঁটি, পুল, রেলের শ্লিপার এবং ঘরের কাজে খুবই উপযোগী। ফুলের আতর সুগন্ধি। শুকনো ফুল অরেচক এবং বমি, রক্তামাশয়, কাশি এবং অর্শে ব্যবহার্য। বীজতেল বাতের মালিশ। 'মেসুয়া' নামাংশ আরবীয় চিকিৎসাবিদ 'মুসা'র স্মারক। নাগেশ্বরিয়াম দেশীয় নামের অনুকৃতি। ইদানীং ঢাকার অনেক জায়গায়ই নাগেশ্বর চোখে পড়ে।

এয়ারপোর্ট রোড ওর নিবিড় বীথি বড়ই দৃষ্টিনন্দন।

Family : *Guttiferae*. Sc. name : *Mesua nagassarium* kosterm. Syn. *M. ferrea* L. Beng. : Nageswar. Nagkeshar. Eng : Iron wood. Place : Ramkrishna Mission, Ramna Park, Notre Dame College (1965).

লিয়ুইয়া এণ্ডোপোগন

'গাছে গাছে সোনার পাতা
ফুটে সোনার ফুল।
কুঞ্জেতে গুঞ্জরি উঠে
ভ্রমরার বোল।'

ময়মনসিংহ গীতিকা

ক্ষুদ্র চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র ২″ — ৫″ × ৩″, ডিম্বাকৃতি, পত্রতল পাণ্ডুবর্ণ, রোমশ, উপরিতল ঘন–সবুজ, পত্রাগ্র সূক্ষ্মকোণী, প্রলম্বিত, প্রান্ত মৃদু–দন্তুর, বৃন্ত ১/৪ দীর্ঘ। পুষ্প একক, প্রান্তিক ৩ ১/২″ অবধি প্রশস্ত, আকর্ষণীয়, মৃদু সুগন্ধি, সাদা কিংবা ম্লান–হলুদ পুষ্পবৃন্ত ১/২″ দীর্ঘ, রোমশ, স্থূল উপবৃতি রোমশ, তামাটে, ঈষৎ যুক্ত। বৃতি ৫, প্রায় মুক্ত, সবুজাভ–হলুদ, চর্মবৎ, শিরাচিহ্নিত। পাপড়ি ৫, মুক্ত ১ ১/২″ দীর্ঘ, সাদা–ম্লানহলুদ পরাগকেশর অসংখ্য মুক্ত, মৃদু হলুদ–সাদা, পরাগকোষ বাদামী ; গর্ভদণ্ড দৃঢ়, স্থূল, শ্বেতবর্ণ ; গর্ভমুণ্ড মুকুটাকৃতি, বাসি অবস্থায় গাঢ় বাদামী।

লিয়ুইয়া ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য। রেলওয়ে হাসপাতালের সামনের ত্রিভুজ–পার্ক ও পুরনো গণভবনের সম্মুখ ছাড়া তৃতীয় বৃক্ষটি সম্ভবত বলধা উদ্যানেরই সংগ্রহ। বহু সন্ধানের পরও উন্মুক্ত স্থানে আমি দুটির বেশি এ গাছ শহরে আর খুঁজে পাই নি। এই বিদেশী তরু ফলবতী হবার জন্য এদেশের আবহাওয়া হয়ত অনুকূল নয়। এজন্য জোড়কলমই একমাত্র ভরসা এবং প্রয়াসটি আয়াসসাধ্য আর এজন্যই দুষ্প্রাপ্য। ওর ফুলের এমন একটি নম্র সুষমা রয়েছে যার আকর্ষণ অতুলন। লিয়ুইয়া পাটি–গোত্রীয় এবং তাই ফুলে পাটিফুলের ছাপ স্পষ্ট, যেন পাটফুলেরই এক বৃহৎ সংস্করণ। বর্ষা–শরতে বার কয়েকই গাছে প্রস্ফুটনের ঢল আসে। ফুল মঞ্জরিবদ্ধ (দৈবাৎ এক বোঁটায় দুটি ফুলও দেখা যায়) না হলেও প্রাচুর্য ও আয়তনে সারা গাছ প্রায় ঢেকে ফেলে। পরিপূর্ণ পুষ্পিত একটি লিয়ুইয়ার সৌন্দর্য বড়ই দৃষ্টিনন্দন। এমন নমনীয় স্নিগ্ধ শ্রীমণ্ডিত গাছ বড়ই দুর্লভ। এই ফুলের মৃদুগন্ধের নম্র মাধুর্যটি উপলব্ধির, বর্ণনার নয়।

লিয়ুইয়া ক্ষুদ্র বৃক্ষ কাণ্ড খাটো, সাদাটে ধূসর, অমসৃণ এবং শীর্ষ ছড়ানো-ছত্রাকৃতি, ছায়নিবিড়। পাতার গড়ন অনেকটা জবা পাতার মতো, কিন্তু আকারে অনেক বড়, হ্রস্ববৃন্তক এবং গ্রথন ভেলভেট-সদৃশ। পাতার উপরিতল ঘন-সবুজ, মসৃণ ও তেল-চকচকে, নিম্নতল হালকা বাদামী-পাণ্ডুবর্ণ, রোমশ এবং দৃঢ় শিরাজালে তীক্ষ্ণভাবে চিহ্নিত। গাছের পাতা একান্তর বিন্যস্ত ও চিরহরিৎ। শীতের শেষে অনেক পাতাই ঝড়ে পড়ে এবং চৈত্রের খরাদীর্ণ আকাশের নিচে তাপ ও শুষ্কতায় গাছকে খুবই বিবর্ণ দেখায়।

কিন্তু প্রথম বর্ষণের পরপরই অবস্থা বদল ঘটে। অর্ধনগ্ন লিয়্যুইয়া আবার পাতার সবুজে ঢাকা পড়ে, শ্রীমণ্ডিত হয়।

ফুল সাধারণত একক ও প্রান্তিক, খাটো রোমশ বৃন্তে যুক্ত। গাছটি জবাগোত্রের খুবই ঘনিষ্ঠ এবং জবার উপবৃতির বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। উপবৃতি রোমশ, প্রায় বৃতির সমান দীর্ঘ, বিকীর্ণ, সরু, তামাটে-সবুজ এবং শুরুতে ঈষৎ যুক্ত, স্থূল ও চর্মবৎ। পাপড়ি ৫, মুক্ত, সরু-মৃদু-হলুদ। ফুলের কেন্দ্রস্থ পরাগচক্রে আছে অজস্র বন্ধ্যা ও উর্বর পরাগকেশর এবং এদের দণ্ড এবং পরাগকোষ পাপড়ির বর্ণধর। বাসি ফুলের পরাগকোষ ও গর্ভমুণ্ড গাঢ় বাদামী।

লিয়্যুইয়া নাম অষ্ট্রীয় তরুবিদ কার্ল ভন লুই'র স্মারক।

রেলওয়ের হাসপাতালের সামনের লিয়্যুইয়া গাছটি আজ নেই। সুগন্ধ অতিথি ভবনের সামনের গাছটি আজও সুস্থ, বর্তমান।

Family : *Tiliaceae*. Sc. name : *Leuehea endopogon* Turez.
Place : Near old Gana Bhaban, Baily Road (1965).

বেরিয়া কর্ডিফোলিয়া

'নবি মঞ্জরি লিজ্জিঅ চুঅই গাছে।
পরিফুল্লিঅ কেসু-লআ বন আছে॥'

অবহট্ঠ কবিতা

মধ্যমাকৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ পত্র তাম্বুলাকৃতি, বৃহৎ, ৪″ — ৮″ দীর্ঘ, সবৃন্তক, সূক্ষ্মপ্রান্তিক, উজ্জ্বল সবুজ, প্রায় মসৃণ পত্র-বিন্যাস একান্তর পত্রবৃন্ত ২″ — ৪″ দীর্ঘ। মঞ্জরি বৃহৎ, অনিয়ত শাখান্বিত, বহুপৌষ্পিক, প্রান্তিক, ঈষৎ আনত পুষ্প শ্বেত, ক্ষুদ্র, অনাকর্ষী। বৃতি $\frac{1}{6}$″ দীর্ঘ, অসমাংগিক, স্থায়ী। পাপড়ি সংখ্যা ৫, বিকীর্ণ, মুক্ত, ক্ষুদ্র, দীর্ঘাকৃতি। পরাগচক্রের কেশর অসংখ্য, মুক্ত, $\frac{1}{2}$″ দীর্ঘ, পরাগ দ্বিকোষী ফল শুষ্ক, গোলাকৃতি, স্থায়ী বৃত্যংশে পক্ষল, পক্ষ-সংখ্যা ৬, প্রায় ১″ দীর্ঘ, বিকীর্ণ, পক্ষপ্রান্ত প্রায় গোলাকৃতি। বীজ-সংখ্যা ১—৪

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পশ্চিম পাশে বক্সীবাজার রোডের যে-অংশ রেসকোর্স রোড থেকে শুরু হয়েছে, সেখানে দাঁড়ালে যে-কটি দীর্ঘ পথতরু আমাদের চোখে পড়ে আপাতদৃষ্টিতে তাদের সবাইকে একই প্রজাতিভুক্ত বলেই মনে হয়। অবশ্যই ধারণাটি যুক্তিযুক্ত। এখানকার গাছের দুটি প্রজাতির মধ্যে সাদৃশ্য এতই স্পষ্ট যে পেশাদার বিজ্ঞানী কিংবা বর্ষব্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ ছাড়া তাদের পার্থক্য নির্ণয় কঠিন। এদের একটি বুদ্ধনারিকেল, অন্যটি বেরিয়া। ঢাকার তরুবীথির রূপকার কী উদ্দেশ্যে এমন রহস্য সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন তা দুর্বোধ্য। আপাত সাদৃশ্য যে প্রজাতি-নির্ণয়ের পক্ষে প্রধান বিচার্য নয় এবং এ-সম্পর্কে আরো গভীর অনুসন্ধান যে খুবই জরুরি, সম্ভবত এমন একটি শিক্ষণীয় উদাহরণ সৃষ্টির কথা তাঁর মনে এসে থাকবে। কিংবা হতে পারে, মিশ্রবীথি রোপণে এটি তাঁর পরীক্ষামূলক প্রয়াস। যাহোক এদের সামঞ্জস্য যতই স্পষ্ট হোক, বৈষম্যও কিছুমাত্র কম নয়। তারা শুধু দুই প্রজাতিই নয়, দুটি স্বতন্ত্র গোত্রজও। বেরিয়া পটগোত্রীয় আর বুদ্ধনারিকেল হলো জংলী বাদামের আত্মীয়। এই পার্থক্য দুস্তর।

উল্লিখিত বীথিতে বেরিয়া কিন্তু বুদ্ধনারিকেলের চেয়ে অনেক খাটো। সাদৃশ্যটি মূলত পাতার গঠন ও বিন্যাসেই লক্ষণীয়। বেরিয়ার কান্ড সরল, উন্নত, ধূসর, প্রায় মসৃণ। শাখা ঊর্ধ্বমুখীন, পত্রঘন এবং পত্র বৃহৎ, দীর্ঘবৃন্তক, তাম্বুলাকৃতি, শিরাজালে সুচিহ্নিত, পাতলা,

লম্ববৃন্ত, দন্তুরপ্রান্তিক। গ্রীষ্ম প্রস্ফুটনের কাল। নতুন পাতা গজানোর পরপরই অজস্র মঞ্জরিতে গাছ আচ্ছন্ন হয়। ফুল খুবই ছোট হলেও শাখায়িত মঞ্জরিতে সারা গাছ ঢেকে যায়।

সাদা পাপড়ির সঙ্গে সোনালি হলুদ পরাগচক্র এ ফুলের শোভা। ফল স্থায়ী বৃতিযোগে শক্ত, ঘনবাদামী এবং সংখ্যায় ফুলের মতোই অজস্র। গোলাকৃতি শুষ্ক একটি ছোট্ট ফলের চারদিকে বিক্ষিপ্ত পাপড়ির মতো ছয়টি শুকনো পাখনা ওর বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য বায়ুতাড়িত বীজ-বিক্ষেপণের জন্যই এই অভিযোজনা। বেরিয়ার বীজ রোমশ এবং স্পর্শ চর্মদাহী। কাঠ গাঢ় লাল, ভারি ও দীর্ঘস্থায়ী। ঘরের কড়ি-বরগা থেকে গরুর গাড়ি, নৌকা, চাষের যন্ত্রপাতি সবই এই কাঠে তৈরি হয়। সিংহলের এটিই প্রধান কাঠ। বাকল থেকে স্থূল আঁশ পাওয়া যায়। আদি আবাস সিংহল, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান ও দক্ষিণ-ভারত।

বেরিয়া নামাংশ ডা. এনড্রু বেরির স্মারক। কলিকাতার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্যার উইলিয়াম রক্সবার্গ গাছটির সঙ্গে এই মাদ্রাজী তরুবিদের নাম যুক্ত করেন। কর্ডিফোলিয়া অর্থ তাম্বুলাকৃতি পত্র।

ধানমণ্ডির ২২ নং রোডে আবাহনী মাঠের লাগোয়া এলাকায় বেশ বড় কয়েকটি বেরিয়া গাছ আছে।

Family : *Tiliaceae*. Sc. name : *Berria cordifolia* (willd) Burret. Eng. : Trincomali wood. Place : Bakhsi bazar Road, near Student-Teacher Centre (1965).

বুদ্ধনারিকেল
টেরিগোটা অ্যালাটা

> 'গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটে যাইতে হইবে সেই ইতিহাস অতি জটিল এবং বহু রহস্যপূর্ণ। ... এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাদের জীবনের লীলাখেলা চলিতেছে তাদের গভীর মর্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মনের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত করিল।'
>
> জগদীশ চন্দ্র বসু

দীর্ঘ,পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র বৃহৎ, লম্ব-তাম্বুলাকৃতি, স্বল্প-পৌষ্পিক ফুল বাদামী-রক্তিম, দুর্গন্ধী। পাপড়ি ৫, প্রায় ১´´ দীর্ঘ লতিযুক্ত, পাপড়িপৃষ্ঠ বাদামী-হলুদ, অভ্যন্তর রক্তিম, শিরাচিহ্নিত। পরাগকেশর ৫। ফল বৃহৎ, ৫´´ প্রশস্ত, গোলাকৃতি, কাষ্ঠকঠিন, ঘনবাদামী, দীর্ঘ বোঁটাযুক্ত। বীজ অসংখ্য, লম্বা, চ্যাপ্টা, পক্ষল। বীজপক্ষ $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$

এই শহরে দৈর্ঘ্যে বুদ্ধনারিকেলের একমাত্র তুলনা দেবদারু। এমন উঁচু একহারা গাছ ঢাকায় সহজে চোখে পড়ে না। কান্ড বিরাট, গোল এবং বহু শাখায়ন সত্ত্বেও প্রচন্ড বলিষ্ঠ, উদ্ধত। একে ঠিক কৌণিক কিংবা পিরামিডাকৃতি বলা চলে না। শীর্ষ চওড়া নয়, সারাগাছে ছড়ানো শাখারাও খাটো, এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত। অবশ্য অল্পবয়সী গাছে বৈশিষ্ট্যটি তেমন স্পষ্ট নয়। বাকল মসৃণ, ধূসর। ভূমিলগ্ন কান্ড ও গোড়া গভীর খাঁজযুক্ত।

পাতা দীর্ঘ-তাম্বুলাকৃতি, ঘন-সবুজ, মসৃণ, দীর্ঘবৃন্তক এবং শাখান্তে একান্তরভাবে ঘনবদ্ধ, শিরাবিন্যাস সুস্পষ্ট। বসন্তের প্রথমেই পত্রমোচন শুরু হয় এবং সম্পূর্ণ নিষ্পত্র না হওয়া অবধি প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে। বিলম্বিত পত্রোদ্গম অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চৈত্রশেষে প্রাণবন্ত সবুজের জমায়েতে ঢাকা নগরীতে তখনো যে কটি নিরাভরণ গাছ দুর্দিনের স্মৃতির মতোই টিকে থাকে, বুদ্ধনারিকেল তাদের অন্যতম। পত্রোদ্গম সেগুনের প্রায় সমকালীন এবং গ্রীষ্মের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কচিপাতা ম্লান-সবুজ। পরিণত বৃক্ষ ছায়াসমৃদ্ধ না হলেও নতুন গাছ পত্রনিবিড়। বসন্ত প্রস্ফুটনের কাল। ফুলের একটিমাত্র দুর্লভ বৈশিষ্ট্য : অত্যুগ্র দুর্গন্ধ। ফুলের অস্তিত্ব থেকে অবিচ্ছিন্ন সুষমা ও সৌরভ এখানে

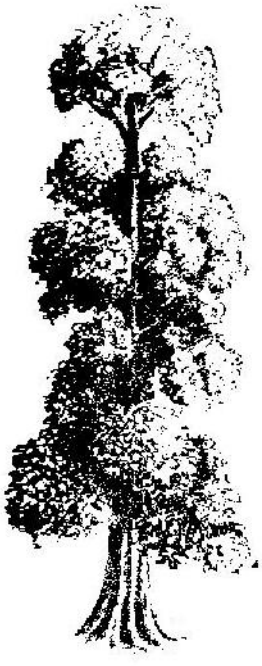

নেই। মঞ্জরি স্বল্পপৌষ্পিক এবং ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, নিতান্তই অনাকর্ষী। ফুলের পাপড়ির বাহির বাদামী, ভেতর লাল ও রেখাভরা। বুদ্ধনারিকেলের ফল নারিকেলের সঙ্গে তুলনীয় নয়। মাঝারি আয়তনের এসব ফল ঘনবাদামী, প্রায় গোল, দীর্ঘবৃন্তক এবং সবুজ পাতার পটভূমিতে সহজলক্ষ্য। পরিপক্ক ফল বহুধা বিদীর্ণ হয় এবং ফাটলের পথে সমস্ত বীজ বাহিরে ছড়ায়। বীজ পক্ষল, বাদুরেই। কাঠ মূল্যবান। বীজ কোন কোন অঞ্চলে আফিমের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত।

বুদ্ধনারিকেল দক্ষিণ-ভারত, সিকিম, চট্টগ্রাম ও অন্দামান দ্বীপপুঞ্জের স্বভাব-তরু। ঢাকায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের নিকটস্থ বক্সীবাজার রোডে কটি গাছ আজও কোনোক্রমে টিকে আছে। আজিমপুরের ইডেন গার্লস ডিগ্রী কলেজের পশ্চিম দিকে একদা বুদ্ধনারিকেলের একটি দীর্ঘ বীথি ছিল। আজ শহর সম্প্রসারণে নিশ্চিহ্ন। রাষ্ট্রপতি ভবনের দিলকুশা সংলগ্ন প্রাচীরের ধারে এক সারি পুরান গাছ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

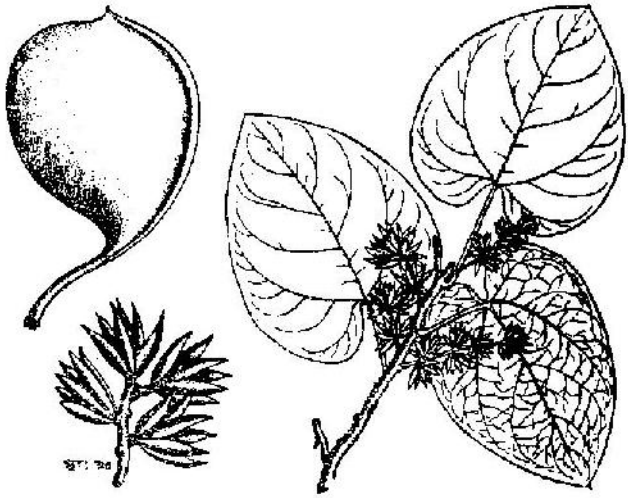

টেরিগোটা গ্রীক শব্দ, অর্থ পক্ষাকৃতি। অ্যালাটা লাতিন শব্দ, অর্থ হলো পক্ষল এবং বীজের আকৃতির জন্য এই নামকরণ।

Family : *Sterculiaceae*. Sc. name : *Pterygota alata* R. Br. Syn : *Sterculia alata* Roxb. Beng. : Budhanarikel. Eng. : Budha's Coconut. Place : Student-Teacher Centre. facing Bakhsi bazar Road.

জংলী বাদাম

স্টার্কুলিয়া ফোটিডা

'ফুলময় ক্ষিতিতল ফুলময় কুঞ্জ
ফুলময় সখী বরিখয়ে ফুলপুঞ্জ।'

যদুনন্দন দাস

দীর্ঘ, বিরাট, পত্রমোচী বৃক্ষ। শাখা ভূ-সমান্তরাল এবং ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্ট দূরত্বে গুচ্ছবদ্ধ। পত্র দীর্ঘবৃন্তক, করতলাকার-যৌগিক। পত্রিকা-সংখ্যা ৭—৯, বর্শাফলাকৃতি, ৬″ দীর্ঘ এবং প্রায় অবৃন্তক। মূল বৃন্ত ৮″ দীর্ঘ মঞ্জরি অনিয়ত, শাখায়িত, বহুপৌষ্পিক পুষ্প ক্ষুদ্র, বিমিশ্র, দুর্গন্ধী, দলহীন এবং ১/২″ প্রশস্ত। বৃতিই পাপড়ির প্রতীক, উজ্জ্বল, লাল-হলুদ কিংবা বেগুনী, ৫ বৃত্যংশে বিভক্ত, ভিতর রোমশ। স্ত্রীধর বৃত্যংশের সমান কিংবা দীর্ঘতর। পরাগকোষ ১০—১২। গর্ভকেশর ৫। ফল গুচ্ছবদ্ধ, নৌকাকৃতি, কাষ্ঠকঠিন, ঠোঁটেল, রক্তিম। বীজ ১০—১৫, প্রায় ১″ দীর্ঘ, কালো।

জংলী বাদামের সঙ্গে শিমুলের সাদৃশ্য স্পষ্ট। উন্নত দেহভঙ্গি, শাখাবিন্যাস এবং পাতার গড়নে তারা প্রায় অভিন্ন। ফুল না দেখলে জংলী বাদামকে শিমুল বলে ভুল করা যায়। অবশ্য পর্যবেক্ষণে ফুল ছাড়াও এদের কিছু কিছু পার্থক্য জানা সম্ভব। শিমুলের মতো শাখাবিন্যাস সর্বত্র ঘূর্ণিত নয়, মাঝে মাঝে এলোমেলো। পাতা করতলাকৃতি-যৌগিক হলেও পত্রিকা শিমুল অপেক্ষা বড় এবং পত্রিকাবৃন্তও খাটো কিংবা প্রায় অনুপস্থিত। তাছাড়া মূলশাখা ঊর্ধ্বমুখীন, শিমুলের মত আনম্য নয়। তদুপরি এই বাদামের কান্ড কাঁটাশূন্য, মসৃণ ও সাদাটে ধূসর।

করতলাকৃতি যৌগিক পত্র শাখান্তে একান্তরভাবে ঘনবিন্যস্ত থাকায় গাছটি ছায়ানিবিড়। শীত পত্রমোচনের কাল। এ-সময় সারা গাছে প্রকটিত রিক্ততা শিমুলের সঙ্গে তুলনীয়। এ দুই গাছের প্রস্ফুটন ও পত্রমোচনের কালও প্রায় অভিন্ন। বসন্তের শুরুতেই বাদামের শাখান্তে প্রস্ফুটনের প্লাবন আসে এবং ঔজ্জ্বল্য ও প্রাচুর্যে তা অবশ্যই শিমুলতুল্য।

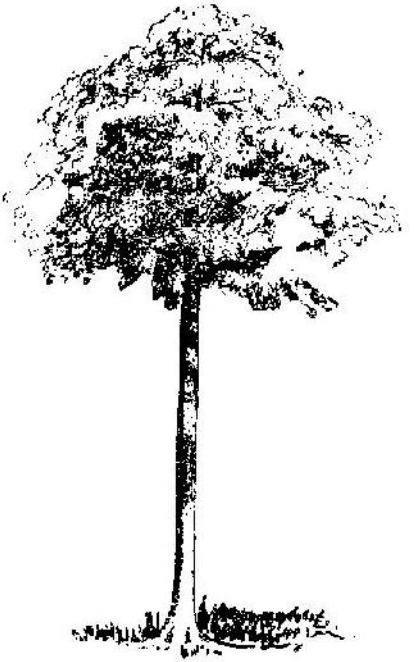

বাদামের শাখায়িত প্রান্তিক মঞ্জরি বহুপৌষ্পিক এবং বর্ণোজ্জ্বল। নিষ্পত্র পুষ্পিত এ গাছের বর্ণাঢ্যতা সমকালীন প্রস্ফুটিত অন্য গাছে অনুপস্থিত। কিন্তু সব সৌন্দর্য ছাপিয়ে ওঠে উৎকট, উগ্র, দুরবাই ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্গন্ধ। সম্ভবত এজন্যই বিরক্ত তরুবিদ নাম রেখেছেন 'স্টারকুলিয়া ফোটিডা।' দুটি শব্দই লাতিন এবং যুগপৎ সমার্থবোধক, অর্থাৎ দুর্গন্ধী। যদি কোনো লীর্ঘাকৃতি গাছের অজস্র উজ্জ্বল বাসন্তী প্রস্ফুটনে আপনি প্রথমে মুগ্ধ এবং পরে অপ্রিয় গন্ধে বিরক্ত হন, তবে নিশ্চিত জানবেন এই প্রতারণা জংলী বাদামের। প্রকৃতি আপন উদ্দেশ্যেই জীবজগতে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে, মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য নয়। তাই বর্ণের সঙ্গে গন্ধের সাযুজ্য-কল্পনায় অভ্যস্ত আমাদের মন এই ব্যতিক্রমে ক্ষুব্ধ হলেও প্রকৃতির প্রয়োজন এতে এতটুকুও ব্যাহত হয় না। লক্ষণীয়, তথাকথিত এই দুর্গন্ধেরও গুণগ্রাহীর অভাব নেই জীবজগতে। যেহেতু মঞ্জরিতে স্ত্রী, পুং, উভয়লিংগিক কিংবা নপুংসক ফুলের বিচিত্র মিশ্রণ রয়েছে, সেজন্য পরাগায়নের পক্ষে কোনো-না-কোনো পতঙ্গের সহায়তা অপরিহার্য। দুর্গন্ধ যাদের প্রিয় সেই মাছিরাই জংলী বাদামের অগুরঙ্গ সহযোগী। সুগন্ধলোভী ভোমরাবর্জিত হলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

এ ফুলের পাপড়ি নেই। পাপড়ি বলে যাদের ভুল করা সম্ভব তা আসলে রঙিন বৃতি। পাঁচ অংশে গভীরভাবে বিভক্ত এই বৃতির বর্ণবৈচিত্র্য আকর্ষণীয় : লাল-হলুদ ও বেগুনীতে

মেশানো এই রং প্রখর, উগ্র। বাদামের ফল গুচ্ছবদ্ধ, প্রতি গুচ্ছে ফলসংখ্যা এক থেকে পাঁচ। ফল মুষ্টির কিংবা নৌকার আকৃতির অত্যন্ত কঠিন এবং রঙে হালকা রক্তিম। ভাজা বীজ চীনাবাদামের আস্বাদযুক্ত ও খাদ্য হিসেবে উপাদেয়। কাঁচা বীজ বমনোদ্রেককারী। বাকল থেকে দড়ির আঁশ মেলে। কাঠ নরম ও মূল্যহীন। বীজ-তৈল রেচক ও বায়ুদোষনাশক।

জংলী বাদামের আদি আবাস নিরক্ষীয় আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল এবং মালয়েও প্রাচুর্য কম নয়।

বাংলাদেশে এটি অন্যতম পালিত তরু। ঢাকায় জংলী বাদাম দুষ্প্রাপ্য। তেজগাঁর পলিটেকনিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ফটকে ও আজিমপুর প্রসূতি সদনের সামনের দুটি গাছ শহরে এই তরুর প্রতিনিধি।

শুধু প্রস্ফুটনের অপ্রিয় গন্ধের প্রসঙ্গ বাদ দিলে ঋজু বলিষ্ঠতা ও সৌন্দর্যে ছায়ানিবিড় এই বৃক্ষটি আমাদের রূপসী তরুরাজ্যের যোগ্য প্রতিনিধি।

Family : *Sterculiaceae*. Sc. name : *Sterculia foetida* Linn. Beng. : Jangli Badam. Eng. : Dung Tree. Wild Almond. Place : In front of Maternity, Azimpur (1965).

মুচকুন্দ
টেরোস্পারমাম অ্যাসিরিফোলিয়াম

'নিতি নিতি তরুলতা
নধর নূতন পাতা
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর।'

বিহারীলাল

দীর্ঘ, চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র বৃহৎ ৬″ — ১৫″, প্রায় গোল, দীর্ঘবৃন্তক, সামান্য লম্বিযুক্ত, প্রান্ত আন্দোলিত। পত্রপৃষ্ঠ সাদাটে, রোমশ, উপরিতল উজ্জ্বল-সবুজ, চকচকে, মসৃণ। পত্রবৃন্ত ৪″ — ১২″ পুষ্প আকর্ষণীয়, দীর্ঘাকৃতি, সুগন্ধ, বৃত্যাংশ ৫″ দীর্ঘ, মুক্ত, বাদামী, স্থূল, ঘন-রোমশ, রৈখিক। পাপড়ি ৫, দীর্ঘ, নমনীয়, কোমল, সাদা। ফল দীর্ঘ-ডিম্বাকৃতি, শিরযুক্ত, ৫″ — ৬″ দীর্ঘ, ৫-অংশে বিভক্ত, বাদামী রোমাবৃত

পাতার আকৃতির জন্যই মুচকুন্দ চেনা সহজ। এই আয়তনের পাতা সেগুনের থাকলেও মুচকুন্দের পাতার আকৃতি ভিন্নতর। চিরহরিৎ এই গাছের প্রায় গোলাকৃতি কিংবা ডিম্বাকৃতি, বিরাট পাতার এক পিঠ উজ্জ্বল-সবুজ ও মসৃণ, অন্য পিঠ রুক্ষ, রোমশ ও সাদাটে-ধূসর, বৃন্ত গোল ও দীর্ঘ। হাওয়ায় আন্দোলিত এলোমেলো পাতার রুপালী-সবুজের ওলটপালট একমাত্র ঐভেলিয়া ছাড়া অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য।

মুচকুন্দের অল্পবয়সী গাছ ছত্রাকৃতি, কিন্তু পরিণত গাছ লম্বাটে ও শাখাবিন্যাস এলোমেলো। বাকল ধূসর ও মসৃণ। বসন্তের শেষ থেকে বর্ষা পর্যন্ত প্রস্ফুটনের কাল। ফুল একক, কাক্ষিক এবং সংখ্যায় স্বল্প, তাই পাতার প্রাচুর্যে প্রায়ই প্রচ্ছন্নই থেকে যায়। বর্ণে না হোক, তার পরিচয় অবারিত দূরবাহী মধুগন্ধে। পথ চলার সময় কোনো বর্ষণসিক্ত দিনে এক ঝলক আশ্চর্য গন্ধে আপনি অবাক হয়ে মুচকুন্দ গাছটি খুঁজে পেলেও হাতির কানের মতো রুক্ষ কর্কশ পাতাওয়ালা একটি গাছকে এমন ঐশ্বর্যের অধিকারী বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হবেন। তারপর তরুতলে ঝরাফুলে সত্যিকার পরিচয় জানলে হয়ত বলবেন : 'এ মণিহার তোমায় নাহি সাজে।' কিন্তু প্রকৃতির 'ন্যায়' মানুষের শিল্পজ্ঞানের রীতিলগ্ন নয়। এখানে অপ্রয়োজনের নির্বিশেষ বর্জনই ধ্রুব এবং সার্বিক প্রয়াস অস্তিত্ব, বংশরক্ষা ও বিবর্তনের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। ফুলগাছের যত শৈল্পিক অর্থই আমাদের কাছে থাকুক, প্রকৃতির রাজ্যে পতঙ্গ আকর্ষণ ও আনুষঙ্গিক প্রজননের মতো রূঢ় বাস্তবতাই তার লক্ষ্য। সুতরাং যে ফুল বর্ণহীন তার পক্ষে গন্ধের প্রয়োজন অপরিহার্য, বিশেষত ফুলটি একক

নিঃসঙ্গ হলে। মুচকুন্দের সৌরভ তাই প্রকৃতির কাছে ন্যায্য পাওনা। অন্যথা, প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে তার পক্ষে টিকে থাকাই অসম্ভব হতো। ফুলের কলি অঙ্গুলাকৃতি, দীর্ঘ, গোল ও বাদামী–হলুদ। বৈশিষ্ট্যটি মূলত বৃতির জন্যই। প্রস্ফুটিত মুচকুন্দের বৃত্যাংশ মাংসল, স্থূল, বাদামী–হলুদ, রোমশ, গ্রন্থিকীর্ণ, সুগন্ধী, মুক্ত ও সংখ্যায় পাঁচ। সুগন্ধের উৎসও এই বৃতি আর উদ্বায়ী পুষ্পসার বৃতিগ্রন্থিস্থ ও দীর্ঘস্থায়ী। শুকনো মুচকুন্দ-বৃতির সুগন্ধি দীর্ঘদিন অটুট থাকে। পাপড়ি দুধসাদা এবং নরম–কোমল, ফিতাকৃতি। পরাগচক্র বহু কেশরকীর্ণ, সোনালি–সাদা এবং একগুচ্ছ রেশমী সুতোর মতো নমনীয় ও উজ্জ্বল। ফল বৃহৎ, ডিম্বাকৃতি, কাষ্ঠকঠিন ও বাদামী রোমে ঢাকা। ফলের পাঁচটি শির। হলে ফল বিদারণের পাঁচটি অর্গল, তাই পাকা ফল পাঁচ অংশে বিভাজ্য। বীজ বাদামী, পক্ষল।

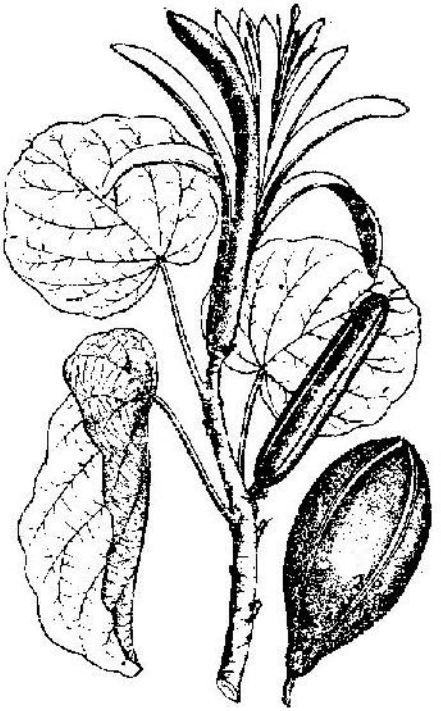

কাঠ দৃঢ়, পালিশযোগ্য, দীর্ঘস্থায়ী এবং তক্তা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য। এই পাতার প্যাকেটে গ্রামাঞ্চলে তামাক ও গুড় বিক্রি হয়। ফুল জিবাণু ও পতঙ্গ নাশক, টনিক, রক্তদোষ ও টিউমারের প্রতিষেধক। বাকল ও পাতা বসন্ত রোগের ঔষধ।

এ তরুর আদি আবাস হিমালয়ের পাদদেশ, আসাম, ব্রহ্মদেশ ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল। ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য। জগন্নাথ হলের কাছে ও হেয়ার রোডে দু একটি গাছ ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

টেরোস্পারমাম গ্রীক শব্দ, অর্থ হলো পক্ষল বীজ। অ্যাসিরিফলিয়াম অর্থ ম্যাপল-পত্রী। অন্যতম বাংলা নাম কনকচাঁপা। চিরহরিৎ, ছায়াঘন এবং ফুলের জন্য গাছটি পথপাশে ও উদ্যানে রোপণের খুবই উপযুক্ত।

Family : *Sterculiaceae*. Sc. name : *pterospermum acerifolium* willd. Syn : *P. aceroides* wall. Beng. : Kanakchapa, Muchkunda. Hindi : Kanairk, Kathchampa. Place : Near Jagannath Hall, Fuller Road.

শিমুল

বোম্বাক্স সিবা

'শিমুল বিশাল বৃক্ষ,
ক্ষতদেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
শোণিতার্দ্র।'

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিরাট পত্রমোচী বৃক্ষ। ভূমিলগ্ন কাণ্ড প্রায়শ গভীর খাঁজযুক্ত। স্বল্পবয়স্ক বৃক্ষ কন্টকিত শাখারা কাণ্ডে এলোমেলো বিক্ষিপ্ত নয়, স্থানে স্থানে ঘূর্ণিত অবস্থায় সুবিন্যস্ত। পত্র দীর্ঘবৃন্ত, যৌগিক করতলাকার ; পত্রিকাসংখ্যা ৫—৭, বর্শাফলাকৃতি, ৪″—৮″ দীর্ঘ, মসৃণ ; পত্রিকাবৃন্ত ১″। পুষ্প বৃহৎ, স্থূল, রক্তবর্ণ, দৈবাৎ পাণ্ডুবর্ণ ; বৃতি সবুজ, যুক্ত ; পাপড়ি ৫, ২″— ৩″ দীর্ঘ, মুক্ত। পরাগ বহু, গুচ্ছবদ্ধ দলমণ্ডল অপেক্ষা দীর্ঘতর। ফল লম্বাকৃতি, কঠিন, শুষ্ক, ৪″ — ৫″ × ১″ — ১½″। বীজ বাদামী, গোল, সাদা তুলায় জড়ানো।

শিমুল আমাদের অন্যতম প্রিয়, প্রয়োজনীয় বৃক্ষ। প্রিয় হবার পক্ষে উপকারী হওয়া ছাড়াও শিমুল সুশ্রী, শোভন, সুন্দর। ঋজু অথচ নমনীয় দেহভঙ্গি, উন্নত কাণ্ড এবং শাখাবিন্যাসের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে সে আকর্ষণীয়। ঘূর্ণিত শাখারা কাণ্ডের একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে প্রায় সমদূরত্বে গুচ্ছে গুচ্ছে বিন্যস্ত থাকে। অল্পবয়সী গাছের শাখারা মাটির সমান্তরাল কিংবা ঊর্ধ্বমুখী হলেও পরিণত অবস্থায় তারা ভূমুখীন এবং আনম্য। তরুণ শিমুল কন্টকিত। কাঁটা দৃঢ়, কৌণিক এবং কালোমুখ। পরিণত গাছ কাঁটাহীন, মসৃণ, রূপালী-ধূসর। বাকলের ভেতর গাঢ়-লাল।

শিমুলের পাতা করতলাকৃতি যৌগিকপত্রের এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। দীর্ঘ বৃন্তের শেষে বিচ্ছুরণের ভঙ্গিতে বিন্যস্ত এমন একগুচ্ছ পত্রিকা শুধু জংলীবাদামেই আছে। শিমুলের পত্রিকা-সংখ্যা ৫—৭, হ্রস্ববৃন্তক, মসৃণ, বর্শফলকাকৃতি ও ম্লান-সবুজ। পাতার এই আকৃতির জন্য পত্রাকীর্ণ শিমুল আকর্ষণীয়।

এই বৃক্ষ পত্রমেচী শীতের হিমেল হাওয়ার প্রথম ছোঁয়াতেই তার পাতারা ঝরে যায়। তারপর কিছুদিন নিরাভরণ শিমুল ঊর্ধ্বমুক্ত আকাশের নিচে রিক্ততার প্রতীকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে—যত দিন না আবার উচ্ছ্বসিত প্রস্ফুটনের প্রাচুর্যে তার দৈন্যমোচন ঘটে। এ

সময় পুষ্পিত শিমুলকে দেখে মনে হয় এক সন্ন্যাসী যেন যাদুমন্ত্রে সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত। পুষ্পোচ্ছ্বাস বর্ণ ও বৈচিত্র্যে অনন্য। যদিও সাধারণত এদের ফুল গাঢ়-লাল, তবু কমলা-হলুদের নানা অনুপাতের মিশ্রণও দুষ্প্রাপ্য নয়। এতো বড় বড় ফুলের এমন অজস্র প্রাচুর্য আমাদের অন্য গাছে অনুপস্থিত পুষ্পিত শিমুল যেন প্রকৃতির বহুধা নৈপুণ্যে রচিত একটি বিশাল পুষ্পস্তবক। ফুলভারে অবনত বর্ণোজ্জ্বল শিমুলের শাখার সৌন্দর্য অতুল্য।

শিমুলের ফুল বড়, পাপড়ি মুক্ত, ঘনবিন্যস্ত ও দলমণ্ডল ঘণ্টাকৃতি। বৃতির সবুজ পাপড়ির লালরঙের বৈসাদৃশ্যে আকর্ষণীয়। পরাগচক্র বহু কেশরের সমষ্টি এবং পাপড়ির বিপরীতে পাঁচটি গুচ্ছে বিভক্ত ও আংশিক যুক্ত। পরাগদণ্ড রক্তিম-হলুদ ও পরাগকোষ কালো। গর্ভদণ্ড দীর্ঘ এবং গর্ভমুণ্ড প্রকান্ড।

শালিক এবং অন্যান্য পাখির প্রস্ফুটিত শিমুলের সহযোগী। এ সময় এদের কল-কাকলিতে মুখরিত থাকে শিমুলের আবেষ্টনী। এদের ছড়নে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে তরুতল। ফুলের প্রতি পক্ষিকুলের প্রসন্ন দৃষ্টির কারণ বর্ণ কিংবা গন্ধ নয়, পরাগচক্রে লুকনো মৌ-গ্রন্থি। শিমুল মধুক্ষরা আর পাখিরা মৌ-লোভী। তাই দুয়ের এ সখ্য। এমন যোজনা অবশ্যই প্রকৃতির নিষ্কাম খেয়ালমাত্র নয়, স্পষ্টতই পরাগসংযোগ তথা গর্ভাধানই লক্ষ্য।

ফুলের পরই আসে ফল এবং এই সঙ্গে পাতার সারা গাছ সবুজে সবুজে ঢেকে দেয়। কচি শিমুল ফলের রং সবুজ; কিন্তু গ্রীষ্মের শুরুতে পাকা ফল ধূসর হয়ে ওঠে। ফল বৃক্ষ, কঠিন, ভংগুর ও বিদারী। শিমুলের পাকা ফল এক সময় ফেটে পড়ে এবং মধ্য থেকে তুলা-জড়ানো কালো বীজেরা হওয়ায় দূর-দূরান্তরে পাড়ি জমায়। বীজ-প্রক্ষেপণের এই

রীতিটি বংশরক্ষার এক অনন্য অভিযোজনা। একই জায়গায় এই বীজেরা স্তূপীকৃত হলে অংকুরোদ্গম থেকে পরিণত অবস্থায় পৌছানো পর্যন্ত এরা টিকে থাকত খুবই কম এবং ফলত প্রজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হত। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে এমন অবলুপ্তি নেহাৎই দুর্ঘটনা। যেসব অজস্র বিচিত্র পন্থায় তরুরাজ্য আত্মরক্ষা করে বীজ-প্রক্ষেপণ তার অন্যতম। এ-প্রক্রিয়ায় বীজেরা দূর-দূরান্তরে বিক্ষিপ্ত হয় এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা ও আনুষঙ্গিক মৃত্যুকে এড়ানোর চেষ্টা করে। শিমুলের এই অভিযোজনা সার্থক। গ্রীষ্মের প্রচন্ড ঝড়ে চৌচির ফল থেকে বের-হওয়া তুলো-জড়ানো বীজেরা কোথায় কতদূরে উড়ে যায় তার হদিস কে জানে!

শিমুল-কাঠ নরম ও অস্থায়ী। কিন্তু প্যাকিং, চায়ের বাক্স, দেশলাইয়ের খোল ও কাঠি, কাগজের মন্ড এমনি বহু প্রয়োজনীয় কাজে বহুলব্যবহার্য। আমাদের দেশলাই শিল্প আজ অনেকাংশেই শিমুল-নির্ভর। তাই ইদানীং শিমুল চাষের প্রতি সরকার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে তৎপর। ওর ব্যাপক চাষের মাধ্যমেই আজ দুর্মূল্য বিদেশী মুদ্রার অপব্যয় রোধ সম্ভব। বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত বিধায় চাষ লাভজনক। শিমুলতুলা বালিশ, গদি ও কার্পাস তুলার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় তোষক ও জাজিমে ব্যবহার্য। শিমুল ফুল কোনো কোনো অঞ্চলে সব্জি হিসেবেও ব্যবহৃত। শিকড় টনিক এবং ফুল চর্মরোগের উপকারী। আঠা বই-বাঁধাইয়ের কাজে ব্যবহার্য।

আদি আবাস ভারত উপমহাদেশ ও মালয়। ঢাকায় শিমুলের সংখ্যা কম। গাছটি ভংগুর এবং পথতরু হিসেবে আদর্শ নয়। শাহবাগের কাছে আজও যে-কটি শিমুল বেঁচে আছে

তাদের প্রস্ফুটনেই আমরা শহরে বসন্তের আগমনী লক্ষ্য করি। 'সালমালিয়া' শিমুলের সংস্কৃত নাম থেকে গৃহীত। 'মালাবারিকা' অর্থ হলো মালাবার থেকে উৎপন্ন। শহরে না হয়ে অন্যত্র অবশ্যই শিমুল রোপণ প্রয়োজন।

ইন্দিরা জাদুঘরের আশেপাশে অনেকগুলি শিমুল লাগানো হয়েছে।

Family : *Bombacaceae.* Sc. name : *Bombax ceilba* L. Syn. *Salmalia malabarica* Schot ; *Bombax malabaricum* DC. Beng. : Shimul, Rakta shimul, Tula. Hindi : Semur, Shimbal. Eng. : Silk Cotton .

Place : Near Hotel Shabagh (1965).

পরশপিপুল

থেস্‌পেসিয়া পোপুলনিয়া

'শিরিষের ডালপালা লেগে আছে
বিকেলের মেঘে
পিপুলের ভরাবুকে চিল নেমে এসেছে এখন,
বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে
করুণ হয়েছে ঝাউবন।'

জীবনানন্দ দাশ

মধ্যম চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র সবৃন্তক, ৩″ — ৫″ দীর্ঘ, তাম্বুলাকৃতি, মসৃণ, ঘন-সবুজ, বর্ধিতশীর্ষ; বৃন্ত ১″ — ৪″ দীর্ঘ। ফুল একক কিংবা সজোড়। ফুলের ব্যাস ২″ — ৩″, ম্লান হলুদ এবং অভ্যন্তর গাঢ়-লাল। পরাগচক্র বহু পুংকেশরের মিলিত দণ্ডের সমাহার গর্ভকেশর যুক্ত এবং পরাগচক্রে প্রায় পরিপূর্ণ আবৃত, গর্ভমুণ্ড মুক্ত এবং দৃশ্যমান। ফল ডিম্বাকৃতি কিংবা গোলাকৃতি, কঠিন, ১½″ লম্বা এবং ৫-অংশে বিভক্ত।

পরশপিপুল বাংলার গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত সমুদ্রকূলের জেলাসমূহে খুব পরিচিত হলেও ঢাকায় হাল আমলের আমদানি। ঢাকার প্রথম বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনায় গাছটি নির্বাচিত হয় নি। সম্ভবত শহরের রূপকার পরশপিপুলের স্বল্পায়ুর জন্যই একে বর্জন করেছিলেন। নিরক্ষীয় সমুদ্রকূল আদি আবাস এবং এ থেকে দূরত্ব তাদের দীর্ঘ জীবনের পক্ষে অনুকূল নয়। ইদানীং ঢাকার সর্বত্র গাছটি চোখে পড়ে। বিশেষত বঙ্গবন্ধু এভিনিউ'র অংশবিশেষে (স্টেডিয়ামের বিপরীতে) পথমধ্যে ওর একটি সুদৃশ্য বীথিকা রয়েছে।*

কান্ড নাতিদীর্ঘ, ধূসর, অমসৃণ, গাটযুক্ত এবং শীর্ষ বহু শাখায় ছত্রাকৃতি, ছায়াঘন, সুশ্রী। পরশপিপুল চিরহরিৎ। আমাদের চিরহরিৎ তরুদের দীন প্রস্ফুটনে এটি এক দুষ্প্রাপ্য ব্যতিক্রম। পরশ পিপুল শুধু পর্ণে নয়, পুষ্পেও সুশ্রী।

এই পাতার সঙ্গে অশ্বত্থের পাতার ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। অবশ্য, অশ্বত্থ পাতার সেই লম্বা লেজটি এখানে নেই। অশ্বত্থেরও আরেক নাম পিপুল। সম্ভবত পাতার মিলই সদৃশ নামের কারণ। পাতার বৃন্ত দীর্ঘ এবং পাতারা একান্তরে বিন্যস্ত। বসন্ত পত্রোদ্গমের কাল। গ্রীষ্ম পরশপিপুলের প্রস্ফুটন কাল হলেও প্রায় সারা বছরই শাখায় ফুলের রেশ অব্যাহত থাকে।

---

* এখন নেই।

ফুল কাক্ষিক, একক কিংবা সজোড় এবং স্বল্পায়ু। একদিন পরই ঝরে পড়ে। ফুলের গড়ন ডেরস, তুলা কিংবা মেস্তার অনুরূপ : সেই একই মৃদু-হলুদ বর্ণ, নরম কোমল পাপড়ি, বাটির আকৃতির যুক্ত ঘনবদ্ধ দল, ভেতরের সেই ঘনলাল চিহ্ন ও যুথবদ্ধ পরাগচক্র। তারা সমগোত্রজ। সারা গাছে এলোমেলো

পাতার আড়ালে লুকনো ফুলেরা অজস্র ও উজ্জ্বল না হলেও সবুজের পটভূমিকায় এই ম্লান-হলুদ আকর্ষণীয়। বাসিফুল রক্তিম। ফল গোল, অনেকটা ডুমুরের মতো, কিন্তু কঠিন এবং পাঁচ অংশে বিভাজ্য। বীজ থেকে সহজেই চারা জন্মে এবং বৃদ্ধিও দ্রুত।

কাঠ দৃঢ়, কঠিন, স্থায়ী এবং নৌকা, বন্দুকের বাট, গরুর গাড়ি ও চাষের যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার্য। বাকল থেকে আঁশ এবং ফুল থেকে হলুদ রং সংগ্রহ সম্ভব। শিকড় টনিক, বাকল অরেচক, আমাশয় ও চর্মরোগের ঔষধ। বীজতৈল জ্বালানী। গাছের সকল অংশই ভেষজগুণসম্পন্ন।

হিবিস্‌ক্যাস নামাংশ 'মেলো' (Mallow) গাছের লাতিন নাম। পপুলন্যাস্ অর্থ পপলারপত্রী। বর্তমানে আছে সোহরাওয়ার্দ্দি উদ্যানে।

Family : *Malvaceae*. Sc. name : *Thespesia populnea*. Syn. : *Hibiscus populneus* Linn : Bengali : Paras Pipal. Hindi : Parsipul. Eng. : Partia tree. Place : Bangabandhu Avenue Near Stadium (1965).

পুত্রঞ্জীব

ড্রাইপেটেস রক্সবার্গিয়া

'পরার্থে আপন সুখ দিয়া বিসর্জন
তুমিও হওগো ধন্য তরুর মতন।
জড় ভেবে তাহাদের করিও না ভুল
তুলনায় তারা বড়, মহত্ত্বে অতুল।'

ফজলুল করিম

মধ্যম, চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্রবিন্যাস একান্তর। পত্র একক, লম্ব-ডিম্বাকৃতি, ২″—৩″ দীর্ঘ, মসৃণ, চর্মবৎ, ঘন-সবুজ। পত্রবৃন্ত $\frac{১}{৪}$″। পুষ্প অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ম্লান-হলুদ, দলহীন এবং ক্ষুদ্র মঞ্জরিতে ঘনবদ্ধ, এক-লিঙ্গিক। পুং-পুষ্পের মঞ্জরি বহুপোষ্পিক। স্ত্রী-পুষ্প একক কিংবা অল্পসংখ্যায় মঞ্জরিবদ্ধ। ফল লম্বাটে, সূক্ষ্মকোণী $\frac{১}{২}$″—১″ দীর্ঘ বৃন্তে বদ্ধ, কঠিন এবং এক-বীজীয়।

গাছের নামটি উপমহাদেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যচিহ্নিত। পুত্রঞ্জীব সংস্কৃত নাম, পুত্রদের দীর্ঘজীবন কামনার শাশ্বত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত। প্রেতযোনীর কোপদৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য শিশুদের এই ফলের কবজ পরানোর প্রাচীন রীতিই সম্ভবত নামকরণের হেতু। তবু গাছটির বিশেষ কোনো ভেষজ-মূল্য নেই। শুধু জ্বর ও সর্দিতে বীজ দৈবাৎ ব্যবহৃত হয়। কাঠ দৃঢ় ও স্থায়ী, তাই জ্বালানী ছাড়া ঘরের কাজ ও চাষের যন্ত্রপাতী নির্মাণের উপযোগী। বীজতৈল নিকৃষ্ট জ্বালানী। অবশ্য একটি মাত্র গুণের জন্যই গাছটি সমাদরযোগ্য : নিশ্ছিদ্র চিরসবুজ পাতার মনোহারী বিন্যাস।

ঢাকায় এই গাছের সংখ্যা বহু। শেরেবাংলার মাজার, কলেজ রোড, আবদুল গণি রোড, টেলিফোন হাউসের আশেপাশে এবং আরও অনেক জায়গায়ই ওরা চোখে পড়ে। এদের আয়তন সীমিত বিধায় অনেক সময় ঝোপ-জংগলে আড়াল থেকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

পুত্রঞ্জীব আমাদের দেশজ তরু। কান্ড নাতিদীর্ঘ, মসৃণ, ধূসর এবং বহু শাখা-প্রশাখায় নিবিড়। ওর দীর্ঘ নমিত শাখাও অত্যন্ত সুদৃশ্য। গাঢ়-সবুজ পাতার নিশ্ছিদ্র সজ্জা এবং

নিবিড় ছায়াই প্রধান আকর্ষণ। মাথা থেকে আভূমি আনত এমন পত্রসজ্জা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। ফুল অত্যন্ত ছোট, ম্লান-হলুদ ও এক-লিঙ্গিক। যদিও অনেক সময় একই গাছে স্ত্রী ও পুং-পুষ্প জন্মে, তবু ক্ষেত্রবিশেষে পৃথক স্ত্রী ও পুরুষ গাছ দুর্লভ নয়। ফল সবুজ এবং আকৃতিতে ছোট কুলের মতো। প্রায় ডিম্বাকৃতি, কৌণিক ফল একবীজীয়। গ্রীষ্মেই গাছে ফুল ফোটে এবং প্রায় একবছর পর ফল পাকার সময় আসে।

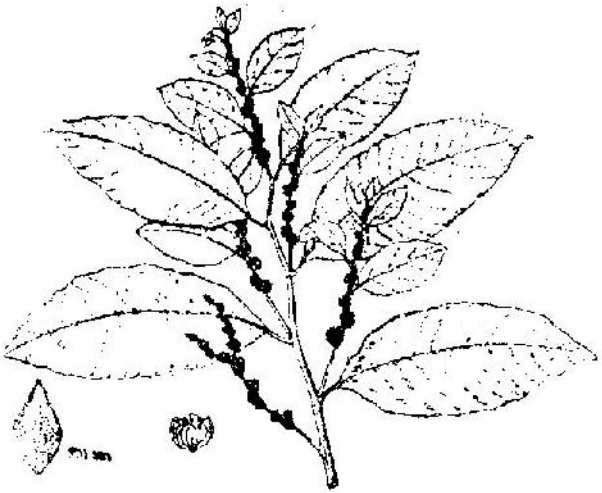

বীজ থেকে সহজেই চারা জন্মে। বৃদ্ধি মন্থর। ছায়াতরু ও সুদৃশ্য সবুজ ঝোপ তৈরির জন্যই ওর রোপণ প্রশস্ত।

গাছের নামের শেষাংশে কলিকাতা রয়েল বোটানিকেল গার্ডেনের প্রথম অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত তরুবিদ উইলিয়াম রক্সবার্গের স্মরণিক। চিরহরিৎ সজ্জা ও মনোরম দেহভঙ্গিতে আমাদের দেশী গাছপালার মধ্যে পুত্রঞ্জীব একটি উল্লেখ্য নাম।

এখনও পূর্বস্থানে পর্যাপ্ত আছে।

Family : *Euphorbiaceae*. Sc. name : *Drypetes roxburghii* (wall) Hurusawa. Syn. : *Putranjiva roxburghii* wall. *Nagela Putranjiva*. Roxb. Bengali : Putranjiba. Eng. : Indian amulet ; wild olive. Place : College Road (1965).

আমলকি

এম্‌ব্লিকা ওফিসিনেলিস্

'আমলকি শোভে আও গুঞ্জরী বকুলে
শত বনগুল নানা লবঙ্গলতা দোলে।'

মুহম্মদ কবীর

পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র $\frac{১}{৩}''$ — $\frac{১}{২}''$ × $\frac{১}{৮}''$, প্রায় অবৃন্তক, অয়তাকার, স্থূলকোণী এবং পাতী, কাণ্ডকণিকায় ঘনবিন্যস্ত। পুষ্প অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং কাণ্ডকণিকার তলে পত্রকক্ষে যুক্ত, একলিঙ্গিক। পুং-পুষ্প সবৃন্তক স্ত্রী-পুষ্প অবৃন্তক। ফল গোলাকৃতি, মাংসল, ঈষদচ্ছ, অস্পষ্টভাবে ৬-শিরবিশিষ্ট, $\frac{১}{২}''$ — $\frac{৩}{৪}''$ চওড়া, পক্কাবস্থায় মৃদু-হলুদ।

আমলকি বাঙালির অন্যতম প্রিয়তরু এবং শুধু ভেষজগুণেই নয়, সৌন্দর্যেও। আমলকি মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ, শাখা-প্রশাখা স্বল্প, আনম্য এবং বাকল স্থূল, নরম, মসৃণ, ম্লান-ধূসর, ভেতরে গাঢ় লাল। কান্ড গাঁটযুক্ত। পাতাকে আপাতদৃষ্টিতে যৌগিক, একপক্ষল বলে ভুল করা সম্ভব। কারণ, যে-কাণ্ডকণার দুপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকা পরস্পর উল্টোভাবে সাজানো থাকে, পত্রাক্ষের সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুবই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আমলকির পাতা একক এবং তথাকথিত পত্রাক্ষ আসলে পতনশীল কাণ্ডকণিকা মাত্র।

শীত আমলকির পাতাঝরার কাল। এ-সময় গাছের তল ঝরে-পড়া বিবর্ণ পাতা আর চিকন কঞ্চিতে ভরে ওঠে। শীতকাতুরে গাছের মধ্যে আমলকি খুবই সংবেদনশীল। শীতের ছোঁয়া মাত্রেই ওর পাতারা খসে পড়ে। কবির ভাষায় এভাবে রূপ পেয়েছে আমলকির এই স্পর্শকাতরতা :

'শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আসবে বলে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে।
আমলকি ডাল সাজল কাঙাল
খসিয়ে দিল পল্লব জাল ...,

বসন্তের আগমনীতে আমলকির শূন্য শাখা আবার কচি পাতার কোমল-সবুজে ভরে ওঠে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে আবার সজ্জিত হয় গাছের এলোমেলো ডালপালারা। বসন্তের প্রসন্নতায় কচি পাতার কোল ভরে আসে মৃদু-হলুদ প্রস্ফুটনের প্লাবন। অতি ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও ফুলের প্রাচুর্যে আচ্ছন্ন আমলকি গাছ আকর্ষণীয়।

আমলকি ফুল এক-লিংগিক। স্ত্রী ও পুরুষ ফুল স্বতন্ত্র হলেও তারা এক সঙ্গে একই শাখায় প্রস্ফুটিত হয়। ফুল এতো ছোট যে খালি চোখে ঠিকমতো দেখাও যায় না। এ গাছের ফলই তার সেরা বৈশিষ্ট্য। মৃদু শিরাল এই গোল, মাংসল, রসাল, প্রায়-স্বচ্ছ ফলেরা শুধু শিশুদের নয়, সবার কাছেই সুস্বাদু, মুখরোচক ও উপাদেয়। একটি মাত্র কঠিন আঁটি আসলে ছয়টি বীজের সমষ্টি। শীতই আমলকি পাকার দিন।

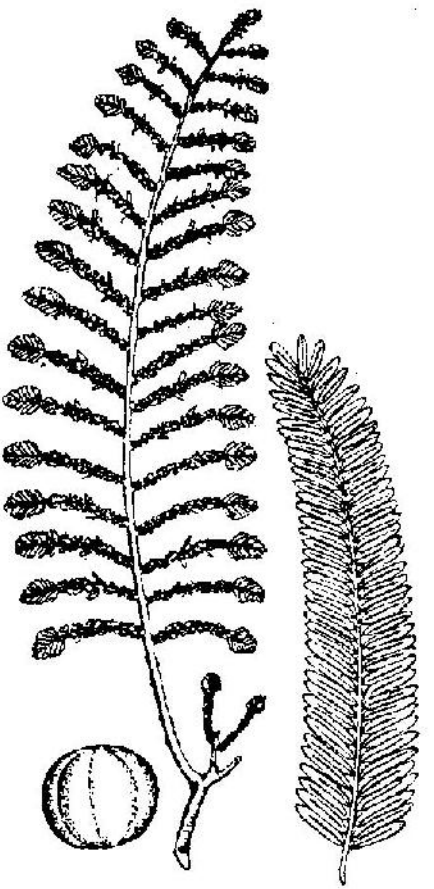

ফল টক, তাই চিনি কিংবা লবণসহ কাচা কিংবা শুকানো অবস্থায় সেব্য। আমলকি পশু-পাখি, বিশেষত হরিণের প্রিয় খাদ্য। সুপারির বিকল্প হিসেবে শুকনো আমলকির ব্যবহার প্রচলিত। আমলকির আচার মুখ-রোচক।

আমলকির ভেষজগুণ আমরা প্রাচীনকাল থেকেই অবহিত। চরকের মতানুসারে এই ফল চল্লিশ দিন সেবনে পুনর্যৌবন প্রাপ্তি সম্ভব। আমলকির ফল ভিটামিন 'সি'র সমৃদ্ধ উৎস। রস যকৃৎ ও পেটের পীড়া, অজীর্ণ, জন্ডিস ও কাশিতে বিশেষ উপকারী, পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক ও টনিক।

আমলকির বাকল, ফল ও পাতা ট্যানিংয়ে ব্যবহার্য। বাকল থেকে রঞ্জক সংগ্রহ সম্ভব। কাঠ রক্তবর্ণ, দৃঢ় এবং কৃষির যন্ত্রপাতী নির্মাণের উপযোগী। শুকনো ফল ক্ষারগুণসম্পন্ন এবং শ্যাম্পু, কল্প ও কালির উপাদান। হিন্দুদের পবিত্র তরুদের মধ্যে আমলকিও অন্যতম।

এই গাছ ইন্দো-মালয়ীয়। পাকিস্তান, ভারত, সিংহল, চীন, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে জন্মে। ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য রমনা-গ্রীনের উত্তর-পূর্ব কোণের হেয়ার রোডের একটিমাত্র আমলকি গাছ সহজে চোখে পড়ার মতো নয়। এ্যমব্লিকা নামাংশ ভারতীয় আমলকির লাতিন রূপ। ওফিসিনেলিস্ লাতিন শব্দ, অর্থ— ভেষজ। আমলকির নিকটাত্মীয় নোয়ারীর পত্রিকা

আমলকি অপেক্ষা বড় এবং পত্রিকার আগা চোখা, ফল গোল, চ্যাপ্টা, ম্লান-হলুদ, ৬—৮ শিরবিশিষ্ট, অত্যন্ত টক এবং গুণের বিচারে আমলকি থেকে নিকৃষ্ট।

Family : *Euphorbiaceae* Sc. name : *Emblica officinalis* gaertn. Syn : *Phyllanthus emblica* Linn. Bengali : Amlaki, Amla, Awola. Hindi : Amla, Amlika. English : Emblic myrabolan. 2. Sc. name : *Cicca acida* (L) Merr. Syn : C. *distichainn* ; *Phyllanthus distichus Muell-Ang.* Bengali : Noari, Nori. Eng. : Star-gooseberry.

কৃষ্ণচূড়া
ডেলোনিক্স রিজিয়া

'বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি
রাগে তারে গালি দিয়া লয়েছি
আমি কাড়িয়া
মোর কৃষ্ণচূড়া কেনে পরিবে ধরণী।'

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মধ্যম বৃক্ষ। পত্র যৌগিক, দ্বিপক্ষল, পত্রদৈর্ঘ্য ১ — ১½″; পত্রিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ⅛″ × ⅛″ এবং অসংখ্য। পুষ্পমঞ্জরি অনিয়ত। প্রস্ফুটিত ফুলের ব্যাস ২″ — ৩″। বৃতির বহিরাংশ সবুজ, অন্তর্দেশ রক্তিম। দলে পাপড়ির সংখ্যা ৫, গাঢ় লাল থেকে কমলা। বৃহত্তম পাপড়ি হলুদ কিংবা সাদা রেখায় চিহ্নিত। পুংকেশর সংখ্যা ১০, লাল। ফলের দৈর্ঘ্য ১২″ — ২৪″, প্রস্থ ২″, কঠিন। কচি ফলের রঙ সবুজ, পাকা ফল গাঢ়-ধূসর। বীজ অসংখ্য, লম্বাকৃতি।

কৃষ্ণচূড়া এদেশে সুপরিচিত। বৈশাখের খরাদীর্ণ আকাশের নিচে প্রচণ্ড তাপ ও রুক্ষতায় ওর আশ্চর্য প্রস্ফুটনের তুলনা নেই। নিষ্পত্র শাখায় প্রথম মুকুল ধরার অল্পদিনের মধ্যেই সারা গাছ ফুলে ফুলে ভরে যায়। তখন তো 'পুষ্পপাগল কৃষ্ণচূড়ার শাখা'। এতো উজ্জ্বল রং, এতো অক্লান্ত প্রস্ফুটন তরুরাজ্যে দুর্লভ।

কৃষ্ণচূড়া ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। গাঢ়-লাল, লাল, কমলা, হলুদ, হালকা-হলুদ পর্যন্ত এক দীর্ঘ বর্ণালীতে বিস্তৃত এই পাপড়ির রং। প্রথম প্রস্ফুটনের উচ্ছ্বাস পরবর্তীকালে ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলেও বর্ষার শেষেও কৃষ্ণচূড়াগাছ থেকে ফুলের রেশ শেষ হয় না। শুধু ফুল নয়, পাতার ঐশ্বর্যেও কৃষ্ণচূড়া অনন্য। এই পাতার কচি সবুজ রং এবং সূক্ষ্ম কারুকর্ম আকর্ষণীয়। নম্র, নমনীয় পাতাদের আন্দোলন দৃষ্টিশোভন। এই গাছে ছায়ায় নিবিড়তা নেই, তবু ওর লঘু আস্তরণই রৌদ্রশাসনে সক্ষম।

মধ্যমাকৃতি গাছের কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, দেহবর্ণ লঘু-ধূসর, মাথা নোয়ানো এবং সেজন্য কিছুটা ছত্রাকৃতি। শাখারা দীর্ঘ ও আভূমি আনত।

কৃষ্ণচূড়া সীমজাতীয় উদ্ভিদের গোত্রভুক্ত, তাই ফলের সঙ্গে চ্যাপ্টা সীমের সাদৃশ্য স্পষ্ট। অবশ্য ফলেরা আকারে সীমের চেয়ে বহুগুণ বড়। কৃষ্ণচূড়ার কচি ফলেরা সবুজ, তাই পাতার ভীড়ে সহজে দেখা যায় না। শীতের হাওয়ায় পাতা ঝরে গেলেই ফল চোখে পড়ে। পাকা ফল গাঢ়-ধূসর ও কাষ্ঠকঠিন। নিষ্পত্র কৃষ্ণচূড়ার শাখায় যখন ফল ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তখন তাকে বড়ই শ্রীহীন দেখায়। অবশ্য এ দুর্দিন ক্ষণস্থায়ী। বসন্তে কৃষ্ণচূড়ার দিন ফেরে, একে একে ফিরে আসে পাতার সবুজ, প্রস্ফুটনের বহুবর্ণ দীপ্তি, নিঃশব্দে ঝরে পড়ে বিবর্ণ ফলেরা। কৃষ্ণচূড়া দৃষ্টিনন্দন শোভা আবার ফিরে পায়।

গাছটি আমাদের দেশে সহজপ্রাপ্য হলেও আদিনিবাস মাদাগাস্কার। ১৮২৪ সালে সেখান থেকে প্রথমে মুরিটাস, পরে ইংল্যাণ্ড এবং শেষ অবধি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তার ঘটে।

'পইনসিয়ানা' হলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক আঞ্চলিক গভর্নর এম. ডি. পইনসির স্মারক। ডেলনিক্স গ্রীক শব্দ, অর্থ—থাবার মতো। সম্ভবত কৃষ্ণচূড়া ফুলের পাপড়ির গঠনবৈশিষ্ট্যেই নামটি অর্থবহ। 'রিজিয়া' অর্থ রাজকীয়। নামের এ-অংশে কৃষ্ণচূড়ার ঐশ্বর্য পরিস্ফুট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষ্ণচূড়া নামে একে চিহ্নিত করা যায় কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ বর্তমান। কৃষ্ণচূড়া আসলে 'সিসালপিনিয়া পালচেরিমা'। সে একটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতের গাছ। ডেলনিক্সকে তাই অনেকে রক্তচূড়া বলার পক্ষপাতী। কেউ কেউ মনে করেন এই ফুলকে বায়ান্ন সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলীর আবেগাশ্রিত করার জন্য কৃষ্ণচূড়া নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধারণাটি সত্যায়নের জন্য কবি শামসুর রাহমানের কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিমালা উদ্ধৃত হতে পারে :

'আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা

একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয় — ফুল নয়, ওরা
শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।'

আজ কৃষ্ণচূড়া নামটি প্রতিষ্ঠিত, এটি বদলানোর চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই ভালো। সিসালপিনা পালচেরিমার অন্য নাম রাধাচূড়াই ওর জন্য নির্দিষ্ট থাক।

বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত বিধায় গ্রামাঞ্চলে জ্বালানী হিসেবে গাছটির নির্বাচন আদর্শ বটে। ওর কাছাকাছি এমন গাছ লাগানো দরকার যারা প্রস্ফুটনে ওদেরই সমকালীন এবং বর্ণে কিছুটা নমনীয় ও মধুর। কৃষ্ণচূড়ার প্রকট ঔজ্জ্বল্যকে সহনীয় ও শোভন করার পক্ষে এরূপ রোপণ খুবই জরুরি।

কৃষ্ণচূড়ার কান্ড ও শাখা-প্রশাখা তেমন শক্ত নয়। ঝড়ে এই গাছ সহজেই ভেঙ্গে পড়ে। এদের নিচে ঘাস কিংবা অন্য কোন গুল্মজাতীয় গাছপালা জন্মানো কঠিন। রোপণকালে এসব ত্রুটির প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন। কোনো দারুমূল্য নেই, কাঠ হালকা এবং জ্বালানী হিসাবেই প্রধানত ব্যবহার্য।

কৃষ্ণচূড়া ঢাকার অন্যতম প্রধান বীথিতরু। পার্ক এভিনিউ, ময়মনসিংহ রোডে অঢেল কৃষ্ণচূড়া। শেরে বাংলা নগরে এখন একটি সুদৃশ্য বীথি আছে।

বীজ থেকে চারা জন্মানো সহজ। তিন-চার বছরেই গাছে ফুল ধরে। পথ ছাড়া বিস্তৃত অঙ্গন, বাড়ির সীমানা, লেকের পারেও রোপণ প্রশস্ত। অন্তত সিকি বিঘা চওড়া সবুজ তৃণাচ্ছন্ন দীর্ঘ এক ফালি জমির উপর সারিবদ্ধভাবে কৃষ্ণচূড়া লাগানোই আদর্শ রোপন। এতে এই গাছে চেরির সৌন্দর্য ফোটে।

Family : *Leguminosae*. Sub. fam : *Caesalpinieae*. Sc. name : *Delonix regia* Raf. Syn : *Poinciana regia* Boj. Bengali : Krishnachura, Raktachura. Hindi : Gulmohar, Gulimohar. Eng. : Flame tree, Peacock tree. Place : Near Hotel Shahbug, Park Avenue, etc. (1965)

ক্যাশিয়া নডোজা

'ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত
নিখিল বাণীর রসের পরশামৃত
গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত
ধরিতে না পারে তারে।'

রবীন্দ্রনাথ

মধ্যম বৃক্ষ। শীর্ষ বিস্তৃত, ছত্রাকৃতি। শাখা-প্রশাখা দূরপ্রসারিত, আনত, প্রায় ভূস্পর্শী। পত্র যৌগিক, এক-পক্ষল, জোড়পক্ষ, ৬″ — ১২″ দীর্ঘ পত্রিকাসংখ্যা ১২ — ২৪। মঞ্জরি ঊর্ধ্বমুখীন, অনিয়ত। ফুলের রং পাংশু গোলাপী কিংবা মৃদু-রক্তিম। বৃতি সবুজ ১/৫″ পাপড়ি ৩/৪″ — ১″ দীর্ঘ। পুংকেশর ১০, অসমান, হলুদ, বৃহত্তম কেশরদণ্ডের মধ্যাংশ স্থূল। ফল দীর্ঘ, গোলাকৃতি, গাঢ়-ধূসর ১২″—১৮″ × ১″। বীজ গোলাকৃতি, কালচে-হলুদ, অসংখ্য।

গাছটি আমাদের দেশী অথচ কোনো বাংলা নাম নেই। আদি আবাস মালয়, বার্মা, আসাম, শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামের অরণ্যাঞ্চল। ইংরেজি নাম পিংক ক্যাশিয়া। অবশ্য অন্যান্য সাধারণ নামের মতো এই নামের অর্থও অস্পষ্ট। কারণ, রক্তিম ক্যাশিয়ার সংখ্যা বহু এবং তারা বিভিন্ন প্রজাতিভুক্ত। ক্যাশিয়া নডোজা ছাড়াও ক্যাশিয়া জাভানিকা, ক্যাশিয়া গ্রানডিস, ক্যাশিয়া মার্জিনেটা — সবারই প্রস্ফুটন রক্তিম। ঢাকায় এই ক্যাশিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র 'নডোজা'ই সহজলভ্য, অন্যরা দুষ্প্রাপ্য। হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ, শাহবাগ এভিনিউ, রমনা পার্ক এবং আরো বহু জায়গায় নডোজার গাছ চোখে পড়ে।

আমাদের সবচেয়ে পরিচিত কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে নডোজার সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। একই গোষ্ঠীভুক্ত হলেও স্বতন্ত্র গণ বিধায় তাদের স্বাতন্ত্র্যও কম নয়। এদের চারা পাশাপাশি লাগালে দেখা যায় কৃষ্ণচূড়ার তরুণ কাণ্ড যখন দ্রুত উপরে বেড়ে ওঠে তখনো মাটির কাছাকাছি থেকে যায় নডোজার ডালপালা। কৃষ্ণচূড়ার কাণ্ড শাখায়িত হয় গাছ বেড়ে ওঠার বেশকিছু পরে; কিন্তু, নডোজার এ লক্ষণটি দেখা দেয় একেবারে শুরু থেকেই। এজন্যই ওর স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির পক্ষে অঢেল জায়গা প্রয়োজন। নডোজার পাতা এক পক্ষল, কিন্তু কচি ডালের চেহারা

একটি বড় দ্বিপক্ষল পাতার মতোই। নডোজার শাখা ছত্রাকারে ছড়ানো, অনত এবং কৃষ্ণচূড়ার চেয়ে অধিক ছায়াঘন।

নডোজার ফুল কৃষ্ণচূড়ার চেয়ে অনেক ছোট, বর্ণেও সেই প্রকট ঔজ্জ্বল্য নেই, আছে স্নিগ্ধতা। শেষ বসন্তের সূর্যের আলোয় কৃষ্ণচূড়ার প্রখর রক্তরঙের একঘেয়েমী থেকে প্রস্ফুটিত নডোজার হালকা গোলাপী অবশ্যই স্বস্তিপ্রদ। এ গাছের কাণ্ড খাটো, ধূসর,

অমসৃণ ও গাঁটযুক্ত। গাছটি যৌগিক পত্রে ছায়ানিবিড়। নডোজা পূর্ণ পত্রমোচী। ফাল্গুনে পাতা-ঝরার দিনে উদোম শাখাগুলিকে খুবই হতশ্রী দেখায়। কিন্তু, বসন্তের শেষে শাখা-প্রশাখা মঞ্জরি ও মুকুলে পরিপ্লাবিত হয়। প্রস্ফুটন পত্রোদ্গমের সমকালীন বিধায় সবুজের পটভূমিকায় রক্তিম মঞ্জরির উচ্ছ্বয় বড়ই আকর্ষী হয়ে ওঠে। মঞ্জরি অনিয়ত, উর্ধ্বমুখীন এবং শাখার উপর লম্বালম্বি সারিবদ্ধ। এই প্রস্ফুটন স্বল্পস্থায়ী নয়। প্রথম প্রস্ফুটনের প্রাচুর্য শেষ অবধি কমে এলেও কমবেশি বর্ষার মাঝ পর্যন্ত গাছে ফুলের রেশটুকু লেগে থাকে। ফুল মৃদু-সুগন্ধি, তাই শাখায় মৌমাছিদের ভিড় জমে। ফল দীর্ঘ, লাঠির মতো গোল, লম্বা এবং গাঢ় ধূসর। ফলটি সোনাইলের ঘনিষ্ঠ।

ক্যাশিয়ার শাখা-প্রশাখা কৃষ্ণচূড়ার মতো ভংগুর নয়, শক্তসমর্থ এবং ঝড়-সহিষ্ণু। প্রশ্নাতীত সৌন্দর্যসহ বহু গুণান্বিত এ-গাছ আদর্শ তরু। বীজ থেকে সহজেই চারা জন্মে। কিন্তু স্থানের দাবি অধিক বিধায় রোপণকালে প্রসঙ্গটি বিবেচ্য। অন্যথা, নির্দয় কাটছাঁটে না-থাকে স্বাভাবিক আকৃতি, না-থাকে ভূস্পর্শী পুষ্পিত শাখার সৌন্দর্য। অন্তত সিকিবিঘা চওড়া জমির উপর লাগান উচিত।

কাঠ জ্বালানী ব্যতীত অন্য কাজে অব্যবহার্য। ক্যাশিয়া নডোজার নামের শেষাংশ লাতিন শব্দ, অর্থ গাঁটযুক্ত। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই নামকরণ। নডোজা ও জাভানিকার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। জাভানিকার পত্রিকা নডোজা অপেক্ষা ছোট, পত্রিকার আগা গোল এবং ফুলও ছোট, ফোটে নডোজার আগে। নডোজার প্রস্ফুটন শুরু হবার আগেই ওর ফুলে ঝরে যায়। একদা আবদুল গনি রোডের মোড়ে নতুন ডি.পি. আই অফিসের কাছে (এখন শিক্ষাভবন) জাভানিকার দুটি গাছ ছিল, বর্ধিষ্ণু শহর তাদের গ্রাস করেছে। নডসার সুদীর্ঘ সারি আছে শেরে-বাংলা নগরে জিয়া উদ্যানের পাশে খালপাড়ে।

Family : *Leguminosae*. Sub. fam : *Caesalpinieae*. 1. Sc. name : *Cassia nodosa* Buch-Ham. Eng. : Pink Cassia. Place : High Court Campus ; in front of Bishop's house, Ramna Park. 2. Sc. name : *Cassia Javonica* Linn. : Syn. *C. bacillus* Roxb. Eng. : Java Cassia.

সোনাইল
ক্যাশিয়া ফিস্টুলা

হাসে বনফুল মুকুলিয়া মুখে পরিয়া রঙের টিপ
পাহাড়িয়া পথে জ্বলে উঠে যেন কোন অমরার দীপ।

জসিমউদ্দীন

ক্ষুদ্র বৃক্ষ। পত্র যৌগিক, এক-পক্ষল, ১৫″ পর্যন্ত দীর্ঘ পত্রিকা-সংখ্যা ৮—১৬, জোড়পক্ষ, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ, ৫″ পর্যন্ত দীর্ঘ। মঞ্জরি ২০″ অবধি দীর্ঘ। ফুলের রং গন্ধক-হলুদ, ১$\frac{১}{২}$″ প্রশস্ত। পাপড়ি-সংখ্যা ৫, পুংকেশর-সংখ্যা ১০, অসমান, বৃহত্তম ৩টি বক্র, ৪টি মাঝারি আকারের এবং সবচেয়ে ছোট ৩টি ক্ষয়িষ্ণু, বন্ধ্যা। গর্ভকেশর মধ্যবর্তী, কাস্তের মতো বাঁকানো, সবুজ। ফল গোল, লাঠির মতো, ২৪″ — ৩৬″ পর্যন্ত লম্বা এবং ১″ চওড়া, ঘন-ধূসর প্রায় কালো এবং বহুকোষে বিভক্ত। বীজসংখ্যা ৪০—১০০, বাদামী, শাঁস কালো।

চৈত্রের রৌদ্রদগ্ধ আকাশের নিঃসীম শূন্যতায় পর্ণমোচী বৃক্ষরাজ্যে সোনাইলের হতশ্রী রিক্ততার বুঝি তুলনা নেই। সমগোত্রীয় অন্য তরুদের পাতা না থাকলেও আকার আয়তনে আভিজাত্য থাকে, কিন্তু সোনাইল একেবারেই সাধারণ : না আছে মহীরুহের বিশালতা, না আছে নিবিড় শীর্ষের ঐশ্বর্য। ছিপছিপে চেহারা, শাখা-প্রশাখার দৈন্য এবং নিরাভরণ দেহে শুকনো ধোঁয়াটে ফলের বোঝা—সব মিলিয়ে তখন সোনাইলের বড়ই দুর্দিন। কিন্তু কিছুদিন পর প্রথম বৃষ্টিতে মাটি সিক্ত ও বাতাস নির্মল হলে দীর্ঘ অনিয়ত মঞ্জরিতে ঢাকা পড়ে নিরাভরণ দেহ। এ-গাছের সেরা বৈশিষ্ট্য তার ঝুলন্ত দীর্ঘ মঞ্জরি এবং গন্ধক-হলুদ ফুল। এমন মণিকাঞ্চনযোগ বড়ই দুষ্প্রাপ্য। পুষ্পিত সোনাইলের হলুদ নির্ঝর তুলনাহীন। ইংরেজি নাম 'গোল্ডেন শাওয়ার' নিঃসন্দেহে সার্থক উপমা।

গাছটি ছোটখাটো এবং শাখা-প্রশাখা নিবিড় নয়। বাকল ম্লান ধূসর এবং মসৃণ। পাতা যৌগিক, এক-পক্ষল এবং জোড়পক্ষ, পত্রিকা বৃহৎ ডিম্বাকৃতি এবং সূক্ষ্মকোণী, বর্ণে গাঢ়-সবুজ। গ্রীষ্মের শুরুতেই পাতা গজায় আর ফুল ফোটার পরপরই কচি সবুজ পাতায় শাখা-প্রশাখা ভরে ওঠে। সে ছায়ানিবিড় নয়, পথতরুর অনুপযুক্ত। ফুল প্রায় ১″ চওড়া, মধ্যবর্তী

পরাগকেশর আয়তন ও আকৃতিতে বিশিষ্ট। একমাত্র গর্ভকেশরটি কাস্তের মতো বাঁকা, রঙ সবুজ। সোনাইলের ফুল লম্বা, লাঠির মতো গোল এবং সেজন্যই নাম হলো বান্দরলাঠি। কচি ফল সবুজ, পাকা ফলের রং গাঢ়-ধূসর।

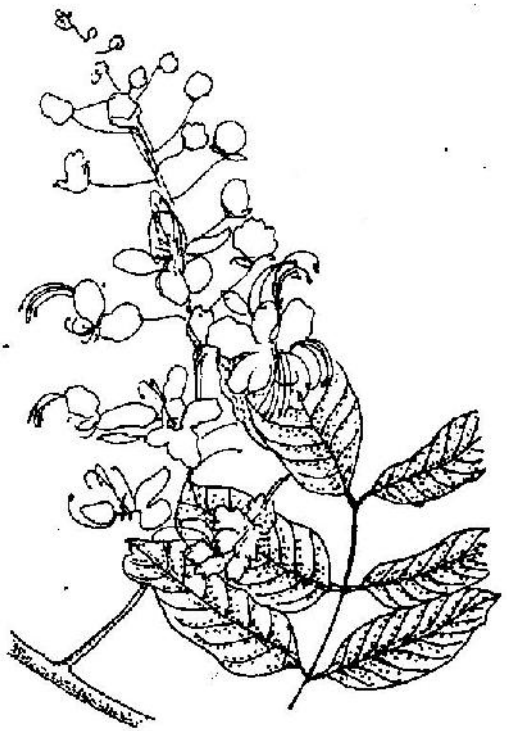

সোনাইলের কাঠ জ্বালানী ছাড়া অন্য কাজেও ব্যবহার্য। ফলের শাঁস রেচক। বাত, বমনোদ্রেক এবং রক্তস্রাব রোধে বিভিন্ন অংশ উপকারী। ফল, ফুল, পাতা বানরের প্রিয় খাবার। ফলের শাঁস অল্প মিষ্টি এবং তামাকের ভেজাল, হাল রঙের কাজে এবং ট্যানিংয়ে ব্যবহার্য. বীজ সহজেই অংকুরিত হয়, কিন্তু বৃদ্ধি মন্থর। বাগান এবং বাড়ির প্রাঙ্গণে লাগান যায়।

ঢাকায় গাছটি দুষ্প্রাপ্য জি.পি.ও-র পশ্চিম, মতিঝিল, রেডিও অফিসের প্রাঙ্গণে দুএকটি গাছ চোখে পড়ে। এখন সুদীর্ঘ বীথি আছে শেরে-বাংলা নগরে পার্লামেন্ট ভবনের দুপাশে। আদি আবাস পূর্ব-এশিয়া। ক্যাশিয়া গাছের গ্রীক নাম। ফিস্টুলা অর্থ বাঁশী। ফলের আকৃতিই এই নাম। ঢাকায় হলুদ ক্যাশিয়ার আর একটি অন্তরঙ্গ প্রজাতি আছে, নাম ক্যাশিয়া স্যায়ামিয়া। নামের শেষাংশের অর্থ শ্যামদেশীয়। ঢাকায় গাছটি সহজদৃষ্ট। কার্জন হল প্রাঙ্গন, মতিঝিল, ভিক্টোরিয়া পার্কের এলাকা এবং ডি.আই.টি. এভিনিউতে এই গাছ অঢেল। এটি চিরহরিৎ এবং মঞ্জরি আনত নয়, ঊর্ধ্বমুখীন আর যৌগিক পথের পত্রিকাসমূহ সোনাইল অপেক্ষা অনেক ছোট, অনেকটা তেঁতুলের মতো, ডিম্বাকৃতি ১$\frac{১}{২}$″ — ২″ দীর্ঘ, ফল চ্যাপ্টা, ৬″ — ৯″ × $\frac{৫}{২}$″ — $\frac{৩}{৪}$″, বাদামী। ছায়ানিবিড় এই গাছটির প্রস্ফুটনে প্রাচুর্য না থাকলেও সৌন্দর্য আছে। কিন্তু শাখা-প্রশাখা যথেষ্ট শক্ত নয়, ঝড়ে সহজে ভেঙ্গে পড়ে।। বীজ থেকে সহজেই চারা জন্মে এবং বৃদ্ধিও দ্রুত। আছে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে নজরুল ইসলাম রোডের লাগোয়া অংশে।

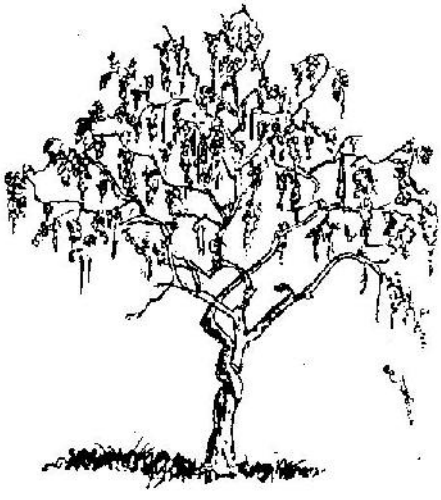

Family : *Leguminosae*. Sub. fam : *Caesalpinieae* 1. Sc. name : *Cassia fistula* Linn. Bengali : Sonail, Bandar lathi, Amaltos. Hindi : Girmalah. Urdu : Amaltas. English : Indian laburnum, Golden Shower. 2. Sc. name : *Cassia siamea* Lam. Syn : *Senna sumatrana* Roxb (1965).

পেল্টোফোরাম ইনার্মি

'শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত

ক্লান্তিহীন সৌন্দর্যের আত্মহারা

অজস্র অমৃত

করেছে নিঃশব্দ নিবেদন।'

রবীন্দ্রনাথ

বিরাট বৃক্ষ। পত্র দ্বিপক্ষল, বৃহৎ পত্রিকা ক্ষুদ্র, ১/২″ — ৩/৪″, ডিম্বাকৃতি ও অসংখ্য। অনিয়ত মঞ্জরি শাখায়িত, ৫″ — ৬″ দীর্ঘ। ফুলের পাপড়িসংখ্যা ৫, মুক্ত, সোনালী-হলুদ, সুগন্ধি। পরাগকেশর ১০, অসমান, হলুদ। পরাগকোষ গাঢ়-কমলা। ফল পাতলা চ্যাপ্টা, ২″ — ৪″, তামাটে, ঢালের আকৃতির।

ঢাকায় রূপসী তরুকুলে পেলটোফোরামের সুউচ্চ স্থান। মিন্টো-বেলী রোড অঞ্চল, রমনার মাঠের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ এবং বি. আর. টি. সি-র গুলিস্তান বাস-টার্মিনালের কাছের পার্কে* এই গাছের ঘনবদ্ধ সারি রয়েছে।

তিনটি মূল বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্য গাছপালা থেকে এটি খুঁজে বের করা সহজ। প্রথমত, বিরাট দ্বিপক্ষল পত্র, দ্বিতীয়ত, শাখায়িত দীর্ঘ হলুদ মঞ্জরি এবং শেষত, চ্যাপ্টা তামাটে ফলের অজস্রতা। এই শেষতম বৈশিষ্ট্যটি ঢাকার তরুরাজ্যে অন্যত্র নেই। জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি থেকে সারা বর্ষাকাল অবধি পেল্টোফরামের গাঢ়-তামাটে ফলের প্রাচুর্য বহু গাছের প্রস্ফুটনের চেয়েও অধিকতর আকর্ষণীয়। পেলটোফোরাম কৃষ্ণচূড়ার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এদের পত্রের সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। অসংখ্য ছোট্ট, চিকন পত্রিকায় গঠিত এই দ্বিপক্ষল পত্র আকৃতি ও আয়তনে প্রায় অভিন্ন। অবশ্য সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দুয়ের মধ্যকার বহু পার্থক্যই ধরা পড়ে। পেল্টোফোরামের পাতা কালচে-সবুজ এবং রুক্ষ। কৃষ্ণচূড়ার পাতার পেলব কোমলতা পেল্টোফোরামে নেই। তাছাড়া ওর পত্রিকাসমূহ ছোট এবং

* বীথিটি এখন নেই, কেটে ফেলা হয়েছে পাকিস্তান আমলে, কাক তাড়ানোর জন্য! কাকতালীয় যুক্তি বটে

অধিকতর ঘনবিন্যস্ত। কৃষ্ণচূড়ার মতো শাখাগুলি এলায়িত নয়, ঊর্ধ্বমুখীন এবং সেজন্য গাছগুলি কৃষ্ণচূড়ার চেয়ে অনেকটা উঁচু। এদের প্রস্ফুটনের কাল এক, তাই কৃষ্ণচূড়ার ঘন রক্তিম প্রস্ফুটনের প্রেক্ষিত হিসেবে ওর হলুদ খুবই আকর্ষণীয়।

পেল্টোফোরামের আকৃতি বিরাট, কণ্ডু ধূসর, অমসৃণ, আগা ডিম্বাকৃতি কিংবা ছত্রাকার, শাখা বহু প্রশাখায় বিভক্ত, ঘনবিন্যস্ত এবং ছায়ানিবিড়। এই গাছ পত্রমোচী। শীতের শেষে পাতা ঝরে গেলে বিবর্ণ ডালপালায় প্রাণের কোনো চিহ্নই থাকে না, শুধু চোখে পড়ে শাখা-প্রশাখার ভীড়ে পাখিদের অজস্র পরিত্যক্ত বাসা। বসন্তে মুকুলিত হবার আগেই কচি পাতায় সবুজে গাছ সম্পূর্ণ ঢেকে যায়।

পেল্টোফোরামের পত্রাক্ষ রোমশ এবং পত্রিকার পিঠ পাণ্ডুর-সবুজ, ফুল গাঢ়-হলুদ, সুগন্ধি এবং শাখায়িত মঞ্জরি ঊর্ধ্বমুখী। প্রস্ফুটনের প্রাচুর্যে এই গাছ কৃষ্ণচূড়ার সমতুল্য। গ্রীষ্মের শুরু হলো প্রস্ফুটনের কাল। পাতার গাঢ়-সবুজের পটভূমিকায় ফুলের উচ্ছ্রিত হলুদ বড়ই দৃষ্টিনন্দন। শুধু বর্ণে নয়, গন্ধের দুর্লভ ঐশ্বর্যেও সে গরিয়সী। এই মৃদু সুগন্ধ দূরবাহী এবং সেজন্য শাখায় জমে ওঠে মৌমাছির ভীড়।

উষ্ণমণ্ডলীয় তরুদের মধ্যে পেল্টো-ফোরাম সৌন্দর্য উল্লেখযোগ্য।

বীজ থেকে সহজেই চারা জন্মে এবং বৃদ্ধিও দ্রুত। ছায়াতরু ছাড়া সুগন্ধি উজ্জ্বল প্রস্ফুটনের জন্যও সে সমাদরযোগ্য। শুধু একবার নয়, সারা বর্ষায় বার কয়েকই বিক্ষিপ্তভাবে এই গাছে ফুল ফোটে। কাঠ তেমন দামী নয়, সারাংশ আসবাবপত্রে ব্যবহার্য, কিন্তু পলকা নরম এবং জ্বালানী ছাড়া অন্য কাজের পক্ষে অনুপযোগী। আন্দামান, সিংহল, মালয় ও উত্তর অস্ট্রেলিয়া আদি আবাস।

পেল্টোফোরাম অর্থ ঢালবাহী। ফলের ঢালের আকৃতিই নামের কারণ। ইনর্মি অর্থ — কাঁটাহীন।

Family : *Leguminosae*. Sub. fam : Caesalpinieae. Sc. name : *Peltophorum inerme* (Roxb) Lanos. Syn. : P. *ferrugineum* Benth. *Caesalpinia inermis* Roxb. English : yellow goldmohur, Rusty shield bearer. Place : Minto Road (1965).

অশোক

স্যারকা ইণ্ডিকা

'আসত তারা কুঞ্জবনে চৈত্র জ্যোৎস্নারাতে
অশোক শাখা উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে।'

রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুদ্র বৃক্ষ। পত্র এক-পক্ষল, জোড়পক্ষ, বিরাট। পত্রিকা-সংখ্যা ৬—১২, ৩″ — ৯″, দীর্ঘ, বর্শাফলাকৃতি, মসৃণ, দৃঢ় এবং পত্রাক্ষে বিপরীতভাবে বিন্যস্ত মঞ্জরি বহুপৌষ্পিক, ছত্রাকৃতি, ৩″ — ৯″ প্রশস্ত। পুষ্পবৃন্ত $\frac{1}{8}$″ — $\frac{1}{2}$″। বৃতি $\frac{1}{2}$″, বৃত্যংশ $\frac{1}{8}$″ — $\frac{1}{0}$″ দল ০। উর্বর পুংকেশর সংখ্যা ৭—৮, ১″ দীর্ঘ, গাঢ়- লাল। ফল ৮″ — ১″ × ২″, চ্যাপ্টা। বীজ-সংখ্যা ৪ — ৮।

অশোক অর্থ দুঃখহরী। নামটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। রোগ উপশমে ভেষজ গুণ, শীতল ছায়া, মধুগন্ধ এবং প্রস্ফুটনের ঐশ্বর্য ইত্যাদির জন্যই এমন নাম। অশোক সত্যিই দুঃখহরী। আমাদের এই দেশী বৃক্ষটির খ্যাতি সুপ্রাচীন কাব্যে বহুল ব্যবহার ছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে অশোক যুক্ত। এই তরুতলেই ভগবান বুদ্ধের জন্ম। এই একটিমাত্র ঘটনাই অশোকের স্থায়ী খ্যাতির পক্ষে যথেষ্ট। অশোক-ফুল প্রেমের প্রতীক। কামদেবের পঞ্চশরের অন্যতম শর এই ফুলে সজ্জিত। বন্দিনী, শোককুলা রাঘববাঞ্ছা সীতার বেদনার সঙ্গে অশোক তরুর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুন্দরী রমনীর পদস্পর্শে এই তরু প্রস্ফুটিত হয়—সংস্কৃত কবিদের এই কল্পনা অশোককে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে।

অশোক মঝারি বৃক্ষ। কান্ড মসৃণ, ধূসর, উন্নত ও শাখায়িত। পাতা পত্রক্ষের দুপাশে যুক্ত, গাঢ়-সবুজ পত্রিকাগুলি দীর্ঘ, চওড়া ও বর্শাফলাকৃতি। কচিপাতা কোমল, নমনীয়, ঝুলন্ত এবং তামাটে। অশোক চিরহরিৎ, ছায়নিবিড়।

অশোক-ফুল ছোট, কিন্তু বহু পৌষ্পিক ছত্রাকৃতি মঞ্জরি আকারে বড়। অজস্র ফুলে ঘনবদ্ধ অশোকমঞ্জরি বর্ণ ও গড়নে আকর্ষণীয়। নতুন ফোটা ফুলের রং কমলা, কিন্তু বাসি ফুল লাল। কলির আকৃতি গদার মতো এবং রঙ হালকা হলুদ। অশোকের পরাগকেশর দীর্ঘ, উৎক্ষিপ্ত এবং পরাগকোষ গাঢ় লাল, কিংবা প্রায় কালো। মঞ্জরি পিপড়ের প্রিয় আবাস।

প্রায় সারা বছরই প্রস্ফুটনের কাল। তবু বসন্ত হেমন্তেই মূলত প্রস্ফুটনের প্রাচুর্য থাকে। অশোক মধুগন্ধি। পাতার আধিক্য সত্ত্বেও প্রস্ফুটন উজ্জ্বল, আকর্ষণীয়। অশোকের নিষ্পত্র কাণ্ড অনেক সময় থোকা থোকা ফুলের বড় বড় স্তবকে ভরে থাকে।

ফলের আকৃতি ও আয়তন রাক্ষুসে সীমের সঙ্গে তুলনীয়। এই ফল চ্যাপ্টা, চর্ম এবং হালকা বেগুনী বীজ থেকে সহজেই চারা জন্মে, কিন্তু বৃদ্ধি মন্থর।

হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে এ-তরু অত্যন্ত পবিত্র। এই ফুল সজ্জা ও পূজার উপকরণ বলেই বাগান ও মন্দির প্রাঙ্গণে লাগান হয়। ভেষজমূল্যেও অশোক শ্রেষ্ঠ। বিবিধ স্ত্রীরোগে, অন্তস্থ রক্তক্ষরণ এবং আমাশয়ে ছালের রস ব্যবহার্য। কাঠ নরম ও মূল্যহীন।

অশোক ভারত-উপমহাদেশ ও মালয়ের তরু। ঢাকায় অশোকের সংখ্যা খুবই কম। ইস্কাটন এবং সেক্রেটারিয়েটের কাছে ওর দু'একটি গাছ কদাচিৎ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রমনা পার্কে এখন অনেক আছে।

স্যারাকা অশোকের পশ্চিম ভারতীয় নাম। ইণ্ডিকা অর্থ—ভারতীয়। সীমিত আয়তন এবং উজ্জ্বল প্রস্ফুটনের জন্য অশোক বাগানের পক্ষে আদর্শ।

Family : *Leguminosae*. Sub. fam : *caesalpinieae*. Sc. name : *Saraca indica* Linn. Syn : *Jonesia asoca* Roxb. Bengali : Asoka. Hindi : Asoka. Eng. Asoka tree. Place : Iskaton Road (1965).

রক্তকাঞ্চন

বুহেনিয়া ভ্যারিগাটা

'নৃপ-আসন নব পাটল পাত
কাঞ্চন কুসুম ছত্রধরু মাথ।'

বিদ্যাপতি

ক্ষুদ্র পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র ৩″ — ৪″ দীর্ঘ, সবৃন্তক, আংশিক দ্বিধাবিভক্ত, মসৃণ, ১১ — ১৫ শিরাবিশিষ্ট, দ্যুতি-সবুজ। মঞ্জরি অনিয়ত, স্বল্পপৌষ্পিক। ফুল উজ্জ্বল-মেজেন্টা, বেগুনী কিংবা সাদা, ৩″ প্রশস্ত বৃতি যুক্ত, ৫-বৃত্তাংশচিহ্নিত দল মুক্ত, পাপড়ি ৫, লম্বা, ২″ দীর্ঘ, মৃদু-সুগন্ধি পুংকেশর ৫, অসমান। গর্ভকেশর ১। ফল ৩″ — ১০″ × ১″, ঈষৎ বাঁকানো, গাঢ়-বাদামী। বীজ গোল, মসৃণ-বাদামী, সংখ্যা ৫ — ১০

ঢাকায় কাঞ্চনের তিনটি প্রজাতি রয়েছে। দুটি ছোট গাছ আর একটি গুল্ম। গাছ দুটির মধ্যে একটির ফুল হালকা-বেগুনী, অন্যটি গাঢ় মেজেন্টা কিংবা একেবারে সাদা। প্রথমটির নাম দেবকাঞ্চন। অবশ্য রক্তকাঞ্চনের নামের সঙ্গে গাঢ় মেজেন্টা রঙের মিল কিছুটা থাকলেও সাদা জাতের জন্য নামটি একেবারেই বেমানান। অথচ এই সাদা ও লাল জাতের কাঞ্চন একই প্রজাতিভুক্ত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ফুলের বর্ণভেদ শ্রেণীনির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এড়িয়ে সাধারণভাবে চেনার জন্য এই তিনটি প্রজাতির নামকরণের আমরা চেষ্টা করি, তবে মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। যথা : বুহেনিয়া অ্যাকুমিনেটা—কাঞ্চন (গুল্ম, ফুল সাদা), বুহেনিয়া পাপুরিয়া –দেবকাঞ্চন (বৃক্ষ, ফুল সাদাটে কিংবা হালকা বেগুনী, প্রস্ফুটনকাল শরৎ-হেমন্ত), বুহেনিয়া ভেরিগাটা—রক্তকাঞ্চন (বৃক্ষ, ফুল মেজেন্টা, প্রস্ফুটনকাল বসন্ত), বুহেনিয়া ভেরিগাটা –শ্বেতকাঞ্চন (বৃক্ষ, ফুল সাদা, প্রস্ফুটনকাল বসন্ত)। রক্তকাঞ্চনের চেয়ে দেবকাঞ্চনই এই শহরে সহজপ্রাপ্য। তবু রক্তকাঞ্চনই বইতে বর্ণিত হচ্ছে, কারণ সৌন্দর্যে রক্তকাঞ্চন দেবকাঞ্চনের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। কাঞ্চন গাছ সাধারণত ছোট আকারের। তবু দেবকাঞ্চনকে উচ্চতায় মাঝারি আকারের বৃক্ষ বলা গেলেও রক্তকাঞ্চন ছোটোখাটো গাছ। দৈবাৎ এগুলি লম্বা হয়। কান্ড নীচু, বহুশাখী এবং উপর ছত্রাকৃতি কিংবা এলোমেলো। অর বাকল ধূসর, অমসৃণ। কাঞ্চনের পাতা তার অনন্য

বৈশিষ্ট্য। একান্তরে বিন্যস্ত সবৃন্তক পাতারা অসম্পূর্ণভাবে সজোড়। পাতার এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বুহেনিয়া নামের সংযোগ রয়েছে। জন বুহিন এবং ক্যাসপার বুহিন ষোড়শ শতাব্দীর দুজন বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাঁরা যমজ। কাঞ্চনের প্রায়-যুক্ত দুটি ফলক যমজ দুই বিজ্ঞানীর অভিন্ন জ্ঞানান্বেষার প্রতীক। তাই নাম হলো বুহেনিয়া।

কাঞ্চন পত্রমোচী। শীতের শেষেই পাতা ঝরে যায়, আর বসন্তের শুরুতে নিষ্পত্র শাখা জুড়ে প্লাবন আসে ফুলের। ঘন মেজেন্টা রঙের রক্তকাঞ্চন এবং দুধসাদা সাদা-কাঞ্চনে ফুল ফোটে একই সময়ে। বর্ণের পার্থক্য ছাড়া আর সব কিছুতেই তারা অভিন্ন। পাঁচটি পাপড়ির মধ্যে একটির বর্ণবিন্যাস একটু স্বতন্ত্র। লালের উপর সাদায় কিংবা সাদার উপর মৃদু গোলাপী রেখায় চিহ্নিত এই বিশেষ পাপড়িটি কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে তুলনীয়। এই সামঞ্জস্য নিতান্তই বাহ্যিক নয়। কৃষ্ণচূড়া ও কাঞ্চন আসলে সমগোত্রীয়। চৈত্র প্রস্ফুটনের কাল। কাঞ্চন ফুলের বর্ণ ও গন্ধ আকর্ষক। একটি পুষ্পিত কাঞ্চন গুচ্ছ সৌন্দর্যে অতুলন।

দেবকাঞ্চন ফোটে হেমন্তের শেষে। পাপড়ি সাদা, মৃদু-রক্তিম কিংবা ম্লান-বেগুনী, এবং আকারে রক্তকাঞ্চনের চেয়ে লম্বা ও উগ্রগন্ধি। এই প্রস্ফুটন ততটা আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু গন্ধের তীব্রতা একটি বিশেষ গুণ।

ফল সীমের মতো চ্যাপ্টা এবং প্রথমে বাদামী-সবুজ, পরে গাঢ়-বাদামী ও শুকনো ফল কঠিন। ফল ফেটে পড়ার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য হলো : হঠাৎ সশব্দে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং বীজেরা বহুদূরে ছিটকে পড়ে। বীজ সহজেই অংকুরিত হয় এবং বৃদ্ধিও খুব দ্রুত। এক বছর বয়সের চারাতে অনেক সময় ফুল ফোটে।

ভারতের শুষ্ক অঞ্চলের অরণ্যভূমি এদের আদি আবাস। সৌন্দর্যের জন্য কাঞ্চনের সমাদর ব্যাপক। শ্বেত ও রক্তকাঞ্চন আমাদের রূপসী তরুদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। সীমিত আয়তনের জন্য ছোট বাগানেও এদের স্থানসংকুলান সম্ভব। নামের শেষাংশ ভ্যারিগাটা অর্থ-চিত্রিত। ঢাকায় পরীবাগ অঞ্চল ও হেয়ার রোডে দুএকটি কাঞ্চন দৈবাৎ চোখে পড়ে। ইদানিং রমনা পার্কে গাছটি উল্লেখ্য সংখ্যায় রোপিত হচ্ছে। দেবকাঞ্চন বাংলা একাডেমী চত্বরে অঢেল। আছে আজিমপুর রোড ও সংসদ অ্যাভিন্যুতে।

বাকল ট্যানিং, রং ও দড়ির উপকরণ। বীজ-তৈল সস্তা জ্বালানী। শিকড় বিষাক্ত এবং সর্পদংশনের প্রতিষেধক। হাঁপানী, ক্ষত এবং পেটের পীড়ায় গাছের নানা অংশ উপকারী।

Family : *Leguminosae*. Sub. fam. : *Caesalpinieae* 1. Sc. name : *Bauhinia variegata* Linn. Hindi : Kachnar. Eng. : Bauhinia. 2. Sc. name : *B. purpurea* Linn. Syn. : B. *triandra* Roxb. Beng. : Debkanchan Eng. : Mountain ebony. Place : Paribagh ; Hare Road (1965).

তেঁতুল

ট্যামারিণ্ডাস্ ইণ্ডিকা

আম ধরে ঝোপা ঝোপা তেঁতুল ধরে বেঁকা
দেশের বন্ধু বিদেশ গেলে আর নি অইব দেখা।'

লোকগীতি

বিরাট বৃক্ষ পত্র একপক্ষল, জোড়পক্ষ, প্রায় ৫" দীর্ঘ পত্রিকা সংখ্যা ২০—৪০, ডিম্বাকৃতি, ½" দীর্ঘ, পত্রিকা-বিন্যাস বিপ্রতীপ। মঞ্জরি ক্ষুদ্র, অনিয়ত, কুলন্ত পুষ্প ক্ষুদ্র, ম্লানহলুদ। বৃত্যংশ ৪ পাপড়ি ৩, লাল শিরাচিহ্নিত। পুংকেশর ৩। ফল মাংসল, ঈষৎ বঁকানো, বাদামী। শাঁস টক। বীজ ৩—১২, গাঢ়-বাদামী, উজ্জ্বল, কঠিন।

তেঁতুলের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তেঁতুলের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন লোক এদেশে বিরল। এই গাছ বহু গুণের অধিকারী এবং এজন্যই এতটা সমাদৃত। দীর্ঘ জীবন, দৃঢ়তা, নিবিড় ছায়া এবং ব্যবহারিক মূল্যে তেঁতুল আমাদের তরুরাজ্যের মধ্যমণি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সর্বত্র সহজলভ্য হলেও মূল আবাস আফ্রিকা। গাঢ় ধূসর বাকল, বিরাট আকৃতি এবং লৌহকঠিন দৃঢ়তায় তেঁতুল স্পষ্টতই আফ্রিকার আদিম প্রকৃতির প্রতীক।

কান্ড সরল, নাতিদীর্ঘ, শাখায়িত আর বাকল স্থূল, অমসৃণ, শীর্ষ অজস্র শাখা-প্রশাখায় নিবিড় এবং প্রায় গোলাকৃতি। পূর্ণবিয়স্ক তেঁতুল মহীরুহ। সিংহলে দুশো বছরের বেশি পুরনো এক তেঁতুল গাছের কান্ডের বেড় প্রায় বিয়াল্লিশ ফুট। ঢাকায় রমনা গ্রীণের দক্ষিণ ফটক থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট পর্যন্ত প্রসারিত তেঁতুল বীথির সবগুলি মধ্যমাকৃতি।* সম্ভবত ঘন বোপণই কারণ। বৃটিশ কাউন্সিলের কাছে শহরের বৃহত্তম তেঁতুল গাছটি আজও বেঁচে আছে।

এ গাছ চিরহরিৎ। পত্র যৌগিক, একপক্ষল, ঘন-সবুজ, আকর্ষণীয় এবং কচি তেঁতুলপাতা হালকা সবুজ। গ্রীষ্ম প্রস্ফুটনের কাল। ফুলের আকৃতি, আয়তন ও বর্ণের কোনটি আকর্ষণীয় না হলেও সবুজের পটভূমিতে ম্লান-হলুদের এই প্রাচুর্যে একটি শান্ত শ্রী ফুটে

* দুঃখের বিষয় বীথি নেই। অবশিষ্ট হিসাবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের চত্বরে দু-তিনটি আজও টিকে আছে।

ওয়ে। মঞ্জরি ছোট, ঝুলন্ত এবং প্রায় প্লাবনের মতো অবস্থিত। ফুলের রঙ হলুদ কিংবা প্রায় সাদা, পাপড়ি লাল শিরায় চিত্রিত আর ফল মাংসল, বাঁকানো।

তেঁতুলের সংখ্যাধিক্য স্বাস্থ্যহানীর কারণ বলে অনেকেই ওর ব্যাপক রোপণের বিরোধী। ধারণাটি প্রশ্নসাপেক্ষ। যে-কার্বনডাইঅক্সাইড সম্পর্কে কথাটি প্রযোজ্য তা ত্যাগ

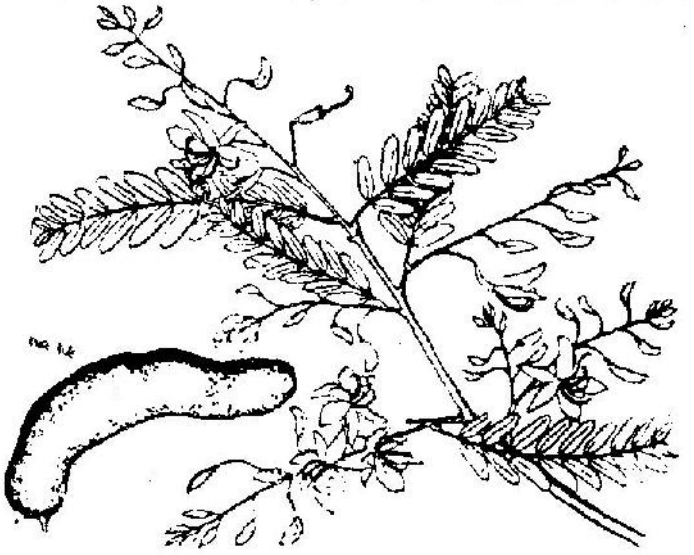

উদ্ভিদমাত্রেরই মৌলধর্ম। তাই এজন্য তেঁতুলকে দোষারোপ অর্থহীন। তেঁতুল সুদৃশ্য তবু এমন আকৃতির অভিজাত্য ও আকার, ঝালরের মতো করুময় পক্ষল পত্র এবং ছায়ানিবিড় সবুজ তো সহজলভ্য নয়। গ্রীষ্মে কচি পাতার সবুজ এবং প্রস্ফুটনের প্রাচুর্যে উজ্জ্বল তেঁতুল গাছ অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

তেঁতুলের শাঁস খাদ্য হিসেবে ব্যাপক আদৃত। শুধু পাক-ভারত-বাংলাদেশেই নয়, ইউরোপেও তেঁতুল রপ্তানি হয়। টক ও সরবতে ওর ব্যবহার বহুল। বীজের গুঁড়া এবং কচি পাতা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার্য। কাঠ অত্যন্ত দৃঢ়, গাঁটযুক্ত এবং এজন্য ব্যবহার খুবই সীমিত। ভেষজ গুণের জন্যও তেঁতুল বিখ্যাত। ফলের শাঁস রেচক, বাকল টনিক এবং পক্ষাঘাতে উপকারী, বীজচূর্ণ অমশয় প্রতিষেধক। ঔষধ হিসেবে তেঁতুলের ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন। সম্ভবত ওর আবিষ্কার আরবদের অবদান।

ট্যামারিন্ডাস গাছের আরবি নামের লাতিন তর্জমা। ইন্ডিকা অর্থ—ভারতীয়।

Family : *Leguminosae*. Sub fam. : *Caesalpinieae*. Sc. name : *Tamarindus Indica* Linn. Bengali : Tentul. Hindi : Amil, Nuli. Urdu : Imli. Eng. : Tamarind. Place : South of Ramna green (1965).

রেইনট্রি

এণ্টারোলোবিয়াম সামান

'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ।'

রবীন্দ্রনাথ

বিশাল পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র দ্বিপক্ষল, ১৫″ অবধি দীর্ঘ, রোমশ, স্ফীত-বৃন্ত। পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, বিপ্রতীপ, প্রায় ১½″ দীর্ঘ। মঞ্জরি ক্ষুদ্র, ছত্রাকৃতি, সর্বাধিক ২৫ পৌষ্পিক, ২″ প্রশস্ত ; মঞ্জরিবৃন্ত ৪″ — ৫″, কেন্দ্রীয় পুষ্প বৃহত্তম। দল বহু, নলাকৃতি, ½″ দীর্ঘ, ম্লান হলুদ। পুং-কেশর সংখ্যা ২০, রক্তিম, দলের বন্ধনী থেকে বহির্গত। ফল ৬″ — ৮″ × ½″ — ১″, বহুকোষে বিভক্ত, গাঢ়-ধূসর।

সংখ্যাধিক্য ও বিশালতায় বট ও অশ্বত্থের পর এই শহরে রেইনট্রিই উল্লেখ্য। উচ্চতা ও ব্যাপ্তির আভিজাত্যে তরুরাজ্যে সে বিশিষ্ট। দিগন্তের পারে ঘনবিন্যস্ত রেইনট্রির সমারোহ যেন বিশাল অরণ্যের ছায়া। ঢাকার বহু পথ এ ওধুতে আচ্ছাদিত। এস.এম. হলের সামনের ফুলার রোডের রেইনট্রির ছায়াচ্ছন্ন অংশটিকে অনেকটা তোরণের মতোই দেখায়। পিলখানা, পার্ক-এভিনিউ, তোপখানা রোড এবং আরো অনেক জায়গায়ই এই গাছের প্রচন্ড অস্তিত্ব চোখে পড়ে।

রেইনট্রির কান্ড বিশাল, উন্নত শাখায়িত, বাকল গাঢ়-ধূসর, প্রায় কালোর কাছকাছি, অজস্র ফাটলে চিহ্নিত, অমসৃণ, রুক্ষ, অনেকটা পোড়া কাঠের মতো। শাখারাও বিশাল, ঊর্ধমুখীন, কিন্তু প্রশাখারা অনত, তাই শীর্ষ ছত্রাকৃতি। পত্র যৌগিক, ঘন-সবুজ এবং ছায়ানিবিড়। কষ্টকল্পিত হলেও লজ্জাবতীর সঙ্গে ওর নিকট আত্মীয়তা বৈজ্ঞানিক সত্য এবং তা ফল ও মঞ্জরির সাদৃশ্যে সহজলক্ষ্য। লজ্জাবতীর মতো রেইনট্রির পাতার স্পর্শকাতর না হলেও আলো ও অন্ধকারে সংবেদনশীল। বিকেলের ম্লান আলোয় ছোট ছোট অসংখ্য পত্রিকারা আকাশ থেকে মুখ ফিরিয়ে যেন ধীরে ধীরে চোখ বোঁজে। আলোর উত্তপ্ত স্পর্শ ছাড়া মুখ তোলে না। এই পত্রিকা-বৈশিষ্ট্য শুধু রেইনট্রিরই নয়, শিরীষ-কুলেরই স্বাভাবিক ধর্ম। শীত এদের পাতা ঝরানোর দিন। বসন্তের শুরুতে এই গাছ পরিপূর্ণ

নিষ্পত্র হয়। অবশ্য এই শূন্যতা স্বল্পস্থায়ী। প্রথম বর্ষনেই বৃক্ষ আবার সবুজে প্লাবিত হয়, প্রস্ফুটন এতে রং ছড়ায়, মহীরুহ আপন মহিমায় অবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রস্ফুটিত রেইনট্রির মাথা যেন অজস্র বিক্ষিপ্ত রক্তিম বিন্দুতে চিত্রিত এক বিশাল সবুজ ক্যানভাস। এই সময় বিস্তৃত এই চন্দ্রাতপের শোভা বড়ই দৃষ্টিনন্দন।

ফুল ও মঞ্জরির মধ্যে পার্থক্য টানা কঠিন বৃন্তপ্রান্তে একগুচ্ছ ছোট ফুলের এই গ্রন্থনায় মঞ্জরির বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন। এই মঞ্জরি অন্যূন বিশটি ফুলের সমাহার। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলেই শুধু প্রত্যেকটি ফুল সনাক্ত করা যায়। মঞ্জরির রক্তিম বর্ণে পাপড়ির চেয়ে অজস্র উৎক্ষিপ্ত লালিম পরাগ-কেশরের অবদান বেশি উৎক্ষিপ্ত পরাগ কেশরেই মঞ্জরির সৌন্দর্য। এই পুষ্পগুচ্ছের মধ্যমণি হিসেবে একটি বিশেষ ফুলের আয়তন ও আকৃতি সহযোগীদের চেয়ে স্বতন্ত্র। এই ফুলটি স্পষ্টতই সবচেয়ে বড় এবং সজ্জিত। ফল চ্যাপ্টা, দীর্ঘ, মাংসল এবং চর্মদৃঢ়। কচি ফল সবুজ, পাকা ফল প্রায় কালো। শাঁস মিষ্টি এবং কাঠবিড়ালীর জন্য মুখরোচক।

রেইনট্রি এদেশের আপন তরুদের মতোই স্বাভাবিক হলেও আদি আবাস হলো দূর দক্ষিণ ব্রাজিল। কাঠ তেমন মূল্যবান নয় এবং মূলত জ্বালানী হিসেবেই ব্যবহার ছায়া ও ঝড় প্রতিরোধের জন্য সে সমাদৃত। এই গাছের বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত। ইদানীং এদেশের কাঠের ব্যাপক অভাবের জন্য রেইনট্রির উৎসাদন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বলা বাহুল্য, তরু-উচ্ছেদ এবং তরু-রোপণের মধ্যে আমরা ভারসাম্য রক্ষায় অমনোযোগী বিধায় এই বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

বীজ ছাড়া কলম থেকেও বংশবৃদ্ধি সম্ভব। এন্টারোলোবিয়াম গ্রীক শব্দ, অর্থ অন্ত্রবৎ ফল। সমান এই গাছের আমেরিকান নাম। আমাদের বর্তমান কাষ্ঠদুর্ভিক্ষে এই গাছের ব্যাপক চাষের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত

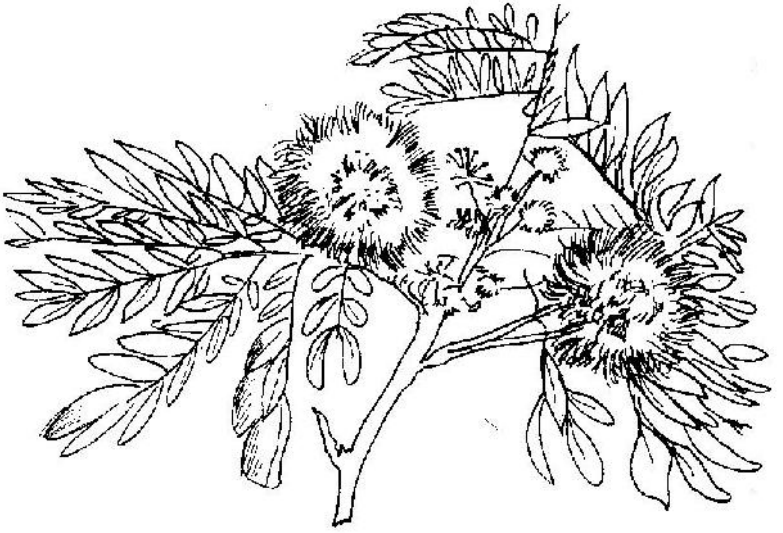

বৃদ্ধি ও বিশালতায় এই বৃক্ষ তরুরাজ্যের মরুজয়ী প্রবল প্রাণের অন্যতম সার্থক প্রতীক।

Family : *Leguminosae*. sub fam. : *Mimosae*. Sc. name : *Enterolobium saman* Prain. Syn : *Pithecolobium saman* Benth, *Samanea saman* Merrill. English : Rain tree. Place : Fuller Road, in front of S.M. Hall (1965).

শিরীষ

আলবিজিয়া লেবেক

'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটানোর খেলা।'

রবীন্দ্রনাথ

বিশাল পএমোচী বৃক্ষ। পত্র দ্বিপক্ষল, পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, ১″ — ১½″ দীর্ঘ, হালকা সবুজ। মঞ্জরি ২″ প্রশস্ত, ম্লান-হলুদ, সুগন্ধি, মঞ্জরিদণ্ড ২″ — ৪″ দীর্ঘ। পৌষ্পিক দৈর্ঘ্য ১½″। ফল ৮″ — ১০″ × ১½″ — ২″, চ্যপ্টা, বীজচিহ্নিত খড়সাদা।

শিরীষ ফুলের সৌন্দর্য সম্পর্কে এদেশীয় কবিকুলের সচেতনতা সুপ্রাচীন। কালিদাস শিরীষকে চারু কর্ণের অলংকার বলে মেঘদূতে (চারুকর্ণে শিরীষং) উল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণব কবি রাধামোহনের কাছে শিরীষ কোমলতার প্রতীক, তাই লিখেছেন, 'শিরীষ কুসুম জিনি কোমল পদতল।' আর রবীন্দ্রনাথ তো প্রশংসায় অসম্ভব উচ্ছ্বসিত, না হলে ফাল্গুনেই শিরীষের প্রস্ফুটনে এতো ঐশ্বর্য খুঁজে পেতেন না।

ঢাকায় ফাল্গুনে প্রস্ফুটিত শিরীষের সাক্ষাৎ মেলে না। চৈত্রের শেষে বৃষ্টিস্নাত ধরিত্রীর স্নেহস্পর্শ ব্যতিরেকে এদেশে শিরীষ প্রস্ফুটিত হয় না। ফাল্গুনে পত্রমোচী অন্যান্য তরুদের মতো শিরীষও হতশ্রী, রিক্ত থাকে।

পরিণত শিরীষ বিশাল তরু কিন্তু ঢাকার এই গাছ সবই স্বল্পবয়স্ক এবং এজন্য। জি.পি.ও.র পশ্চিম, কাওরান বাজার এবং কুর্মিটোলার পথের পাশে শিরীষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এসব গাছে ইতিমধ্যেই ফুল ফুটেছে বহুবার, তবু বিশাল শিরীষের তুলনায় আজও শিশু। কিছু বয়সী শিরীষ আছে মহম্মদপুর মডেল স্কুলের চত্বরে আওরঙ্গজেব রোডের কোল ঘেঁষে। ঢাকার তরুবীথির প্রথম রূপকার তাঁর নির্বাচন থেকে গাছটি বর্জন করেছিলেন, না-হলে শহরে পরিণত শিরীষের অভাব হত না। এই গাছের মূল মাটিতে দৃঢ়বদ্ধ হয় না, ঝড় প্রতিরোধে শক্ত অসমর্থ। এজন্যই পথতরু হিসেবে শিরীষ আদর্শ নয়।

কাণ্ড সরল, উন্নত, গোলাকৃতি, দীর্ঘ, পাঁশুটে কিংবা সাদা এবং প্রায়-মসৃণ। শীর্ষ ছত্রাকৃতি এবং সঘন পত্রবিন্যাসে ছায়ানিবিড়। পাতা দ্বিপক্ষল এবং আলোসংবেদী, সন্ধ্যায় পাতারা

তাই বুঁজে যায়। বসন্তের শেষ পাতা গজানো ও ফুল ফোটার সময়। কচি পাতা পাণ্ডুর সবুজ। পল্লবিত শিরীষ পাতার ঐশ্বর্যে আকর্ষী।

শিরীষ মঞ্জরির আকৃতি রেইনট্রির অনুরূপ হলেও আয়তনে তা বড়, রঙেও আলাদা। এই ফুলের সৌন্দর্যটুকু বিকীর্ণ পরাগ-কেশরেই নিহিত এবং তার কোমলতা পালকের সঙ্গে তুলনীয়। শিরীষ-মঞ্জরি হালকা হলুদ এবং পরাগকেশরের আগা সবুজ। ফুলের গন্ধ দূরবাহী, উগ্র এবং ঈষৎ কটু। গন্ধমদির প্রস্ফুটিত শিরীষ বীথির সান্ধ্য সান্নিধ্য বড়ই উপভোগ্য।

শিরীষের অন্যতম ইংরেজি নাম 'উইম্যানস্ ট্যাংগ'। নারীর জিহ্বার মতো প্রশস্ত এবং 'ধারালো' ফলের আকৃতিই এই নামকরণের হেতু। ফল চ্যাপ্টা, সীমের চেয়েও বড়, খড়-সাদা।

শিরীষ উপমহাদেশের মূল্যবান গাছপালার অন্যতম। কাঠ দৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী এবং এজন্য নির্মাণে ব্যবহার্য। শিকড় অরেচক, ছাল চর্মরোগের ঔষধ এবং পাতার রস রাতকানারোগে উপকারী। এ আমাদের দেশজ তরু। সিংহল, বার্মা, মালয় এবং চিনেও গাছটি জন্মে। ইদানীং আফ্রিকা ও আমেরিকায় চাষ হচ্ছে।

শিরীষের সমগোত্রীয় করই দারুমূল্যে মোটেই ফেলনা নয়। করই-মঞ্জরি শিরীষের চেয়ে ছোট, ফলের রং তামাটে ও শিরীষের ফল অপেক্ষা ছোট। করই ঢাকা শহরে দুষ্প্রাপ্য। শিববাড়ি রোড ও বেলী রোডে দুএকটি করই আজো কোনো রকমে বেঁচে আছে। তেজগাঁ ও কুর্মিটোলায় এদের প্রাচুর্য চোখে পড়ে।

আলবিজিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতালীয় তবুবিদ অ্যালবিজির স্মারক। লোবেক শিরিষের আরবি নাম। বীজ থেকে চারা করা সহজ এবং বৃদ্ধিও দ্রুত। পথের পাশে না হোক নিরাপদ দূরত্বে এই গাছ রোপণ করা উচিত। শিরীষ সৌন্দর্যে, সুগন্ধে যেমন আকর্ষণীয়, কাব্য-সাহিত্যে বহু উল্লেখে সে আমাদের নন্দনিক চেতনারও অঙ্গীভূত।

Family : *Leguminosae*. Sub fam. *Mimosae*., Sc. name : *Albizzia lebbek* Benth. Syn : *Mimosa sirissa* Roxb. Beng. : Sirish. Hindi : Sirish, Garso etc. Eng. : Parrot tree, Women's tongue. 2. Sc. name : *Albizzia procera* Benth. Syn : *Mimosa alata* Roxb. Beng. : Karai. Eng. : White Siris. Place : Kurmitola, Kawran Bazar, etc. (1965).

অ্যালবিজিয়া রিচার্ডিয়ানা

'চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উত্তাপ ও শৈত্য, আলো ও অন্ধকার, মৃদুসমীরণ ও ঝটিকা, জীবন ও মৃত্যু ইহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, বিবিধ শক্তি দ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতের কোনো ক্রন্দন উত্থিত হইতেছে না। এই অতি সংযত, মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে।'

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

ঢাকার সুন্দরতম তরুবীথি নির্বাচনে মতানৈক্যের অবকাশ নেই। মেডিকেল কলেজের মুখোমুখি সেক্রেটারিয়েট রোডের দুপাশের যে-গাছের সারি আমরা নিত্য দেখি, তাদের সৌন্দর্যে অমুগ্ধ লোক দুষ্প্রাপ্য। আমি তখন ঢাকা হলের ছাত্র। জানাল খুললেই সবার আগে এ তরুবীথিই আমার চোখে পড়তো। সেই থেকেই এদের সাথে আমার সখ্য। দিনের আলোয় অজস্র কোলাহলের ভীড়ে প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণলীর যে-অংশ অদৃশ্য থেকে যায়, রাত্রির নৈশব্দেই তার সাক্ষাৎ মেলে। তাই আমি অনেকদিন গভীর রাতে আমার জানালায় দাঁড়িয়ে এদের দেখতাম। বিশালদেহী এই তরুদের উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের আলোয় অদ্ভুত রহস্যময় দেখতো। কেবলই মনে হতো এদের এই নিস্পন্দ নিয়মানুবর্তী অবস্থান শুধু ক্ষণিকের জন্যই, যেন একটু পরেই এদের যাত্রা শুরু হবে কোন দূর লক্ষ্যে। দিনের আলোয় অবশ্য তাদের এতো রহস্যময় মনে হতো না। কেবলই ভাবতাম এরা যেন আমাদের পরিচিত প্রকৃতির আত্মজ নয়, কোনো খেয়ালী ভাস্করের বিশাল কল্পনার এক অপূর্ব সৃষ্টি, পরাবাস্তববাদী চিত্রকলার আধান। অ্যালবিজিয়া বীথি ঢাকার তরুরাজ্যে একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এদের কোনো নির্দিষ্ট বাংলা নাম নেই। বিলাতী আমলকী বলে একটি বাংলা নামের যে-উল্লেখ কোনো কোনো বইতে মেলে তার যাথার্থ সন্দেহযোগ্য। প্রথম দর্শনেই এ গাছের বিদেশীত্ব সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হই। কারণ, এদের কোনো প্রতিনিধিই এদেশের পাহাড়-পর্বত, মাঠে-ঘাটে চোখে পড়ে না। এ গাছের মূল আবাস সুদূর মাদাগাস্কার। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে সেখান থেকেই মঁসিয়ে রিচার্ড কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনে এদের বীজ পাঠান এবং তখন থেকেই এদেশে এই বৃক্ষ রোপণের সূচনা। পরে সূত্রটি বিস্মৃতিতে

হারিয়ে গেলে এ গাছের আদি আবাস সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরে ১৯০১ সালে স্যার জর্জ কিং এবং স্যার ডেভিড প্রেইনের চেষ্টায় এই ছিন্নসূত্র পুনঃগ্রথিত হয় এবং সমস্ত অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে। মঁসিয়ে রিচার্ডের স্মরণে রিচার্ডিয়ানা নামটি রাখেন এই শেষোক্ত বিজ্ঞানীরা।

আলবিজিয়া মহীরুহ। বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত এবং দেহভঙ্গি অনন্যসুন্দর। মূলকাণ্ড শুরুতে দ্বিধা কিংবা ত্রিধা বিভক্ত হয় এবং বিভাজন ক্রমাগত প্রসার লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বিপুলসংখ্যক শাখা-প্রশাখার সুশোভন বিন্যাস হলো তরুটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শীর্ষ ছত্রাকৃতি এবং ক্ষীণ পত্রসজ্জা শুধু ওখানেই সীমাবদ্ধ। বাকল প্রায় মসৃণ এবং পাঁশুটে। এই তরু শিরীষের নিকট আত্মীয়, তাই উভয়ই আলো-সংবেদী অর্থাৎ যখন নিষ্পত্র হয়, তখন আলবিজিয়ার মাথার অজস্র চিকন ডাল-পালার ঠাসবুনুনীকে বড় অদ্ভুত দেখায়। পাতা দ্বিপক্ষল, কিন্তু পত্রিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও চিকন। চৈত্র-বৈশাখের কচি পাতার উজ্জ্বল-সবুজে আচ্ছন্ন আলবিজিয়া আকর্ষণীয় পাতার পরই ফুল ফোটার দিন মঞ্জরি ও ফুল অত্যন্ত ছোট, সাদা এবং মঞ্জরি-দণ্ডের প্রান্তবিন্দুতে ছত্রাকারে গুচ্ছবদ্ধ। গাছের উচ্চতার জন্যই প্রস্ফুটনের সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। ফল চ্যাপ্টা, হালকা বাদামী, অত্যন্ত পাতলা এবং বায়ুবাহী। ফুলের দৈন্য সত্ত্বেও দেহ-সৌষ্ঠবে আলবিজিয়া অভিজাত বৈকি।

শহরের আকাশচুম্বী প্রাসাদের জন্য প্রয়োজনীয় সজীব পটভূমি রচনায় এ গাছের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। সে ছায়নিবিড় নয়। গাছের নিচে ঘাস এবং অন্য গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। এই অতিরিক্ত গুণের জন্য পার্ক এবং অন্য উন্মুক্ত স্থানেও আলবিজিয়ার রোপণ সুবিধাজনক।

মেডিকেল কলেজের সামনের অ্যাভিনুটির এখন ভগ্নদশা। কিন্তু এই প্রজাতিটির সদম্ভ অস্তিত্ব আছে সারা শহরে—কার্জন হলের সামনে, ধানমণ্ডি, গুলশানে ও শেরে-বাংলা নগরে।

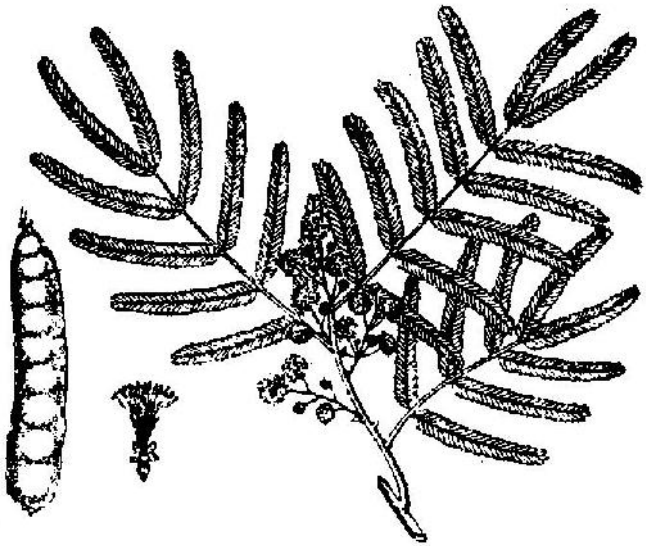

Family : *Leguminosae*. Sub fam. : *Mimosae*. Sc. name : *Albizia richardiana* King and Prain. Place : In front of Medical College (1965).

অ্যাকাশিয়া মনোলিফর্মিস
সোনাঝুরি

'বাবলা ফুলের নাকফাবি তার
গায়ে শাড়ি নীল অপরাজিতার
চলেছি সই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে।'

নজরুল

মধ্যম, চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র ৩। পর্ণবৃন্ত সবুজ, প্রশস্ত ছুরির ফলার আকৃতিবিশিষ্ট, সমান্তরালপ্রায় শিরাচিহ্নিত, ঘন-সবুজ, ৮″ × ২″, চর্মবৎ, ঈষৎ বাঁকানো। মঞ্জরি ৩½″ দীর্ঘ, ঝুলন্ত, বহুপৌষ্পিক, সোনালী-হলুদ। ফুল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ½″ দীর্ঘ, সুগন্ধি। ফল ½″ চওড়া, চক্রাকারে পাঁচানো, ম্লান-ধূসর। বীজ কালো এবং সোনালী শাঁসের সুতোয় ফলের সঙ্গে জড়ানো।

অ্যাকাশিয়া বাবলারই দেশের। গুলিস্তানের সম্মুখস্থ বঙ্গবন্ধু এভিনিউর মধ্যবর্তী তরুবীথি, রমনাগ্রীন, সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা ঢাকায় কম নয়। আনত প্রশাখান্তে এদের ঘন সবুজ পত্রসজ্জা অবশ্যই আকর্ষণীয়। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, সবুজের এই ঐশ্বর্য পাতার বদলে বৃন্তেরই সৃষ্টি। আসলে ওর কোনো পাতাই জন্মে না, বোঁটা চ্যাপ্টা হয়ে পাতার বিকল্প হিসেবে ঘন-সবুজ প্রতঙ্গে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরিত বৃন্তের নাম পর্ণবৃন্ত, অর্থাৎ পর্ণাকৃতি বৃন্ত। অথচ কে বলবে যে এই সুন্দর সবুজের উচ্ছ্বাস পাতার নয়। অবশ্য অন্য পাতার সঙ্গে ওর বৈসাদৃশ্য খুব দুর্লক্ষ নয়। প্রথমে এদের তথাকথিত পাতার শিরাবিন্যাস দেখুন। সাধারণত বহুশাখী বৃক্ষকুল দ্বিবীজপত্রী এবং জালিকা শিরাবিন্যাসই তাদের মৌলধর্ম। অথচ এই অ্যাকাশিয়া দ্বিবীজপত্রী হলেও শিরাবিন্যাসটি সমান্তরাল। এ গাছে পাতা আসলে তো পাতা নয়, পর্ণবৃন্ত এবং তাই ব্যতিক্রম। সম্ভবত শুকনো আবহাওয়ায় অভিযোজনের জন্যই এমন রূপান্তর।

ঢাকায় অ্যাকাশিয়া ইদানীং আমদানি, তাই পরিণত গাছ দুষ্প্রাপ্য। অস্ট্রেলিয়ার উষ্ণমণ্ডল আদি আবাস হলেও আমাদের আবহাওয়াও এদের নিরঙ্কুশ বৃদ্ধির অনুকূল। গাছের কান্ড

সরল, উন্নত, মসৃণ এবং ম্লান-ধূসর। বহু শাখায় বিভক্ত ওর শীর্ষ ছত্রাকৃতি, ছায়াঘন এবং সুশ্রী।

অ্যাকাশিয়া চিরহরিৎ পর্ণবৃন্ত ছুরির ফলার মতো চ্যাপ্টা, বাঁকানো, ধারালো এবং গাঢ় সবুজ। লম্বা শাখান্তে একান্তরে বিন্যস্ত পর্ণবৃন্তের উজ্জ্বল সজ্জা গাছটিকে সৌন্দর্য দিয়েছে। শাখায় হাওয়ার মৃদু স্পন্দন শ্রুতিমধুর। বৎসরব্যাপ্ত এই গাছের প্রস্ফুটন। ফুল অত্যন্ত ছোট, গাঢ়-সোনালী এবং দীর্ঘ প্রলম্বিত মঞ্জরিতে বহু সংখ্যায় ঘনবদ্ধ ভাদ্র-আশ্বিনে প্রস্ফুটনের প্লাবন এলে অ্যাকাশিয়ার কোমল হলুদ পাতার গাঢ়-সবুজের পটভূমিতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ফুলের সুগন্ধ মৃদু ও মনোহারী।

ফল ছোট্ট ফিতার মতো চ্যাপ্টা ও আঁকাবাঁকা, জড়ানো জড়ানো। সোনালী শাঁসের সুতোয় বাঁধা মূল্যবান পাথরের মতো উজ্জ্বল কালো বীজ, যেন মূল্যবান কণ্ঠহার। 'মানোলিফর্মিস' নামের অর্থও তাই। বাগান ও পথপার্শ্বে রোপণের জন্য এ তরুর নির্বাচন রুচিসম্মত।

অ্যাকাশিয়া এ গাছের গ্রীক নাম। মনোলিফরমিস অর্থ হারে ... নাবুরি নামে এখন এটি সমধিক পরিচিত ঢাকায় সর্বত্র বহুলদৃষ্ট ম ... থেকে বনানীর

BANSDOC Library
Accession No. 17918

চেয়ারম্যান বাড়ি পর্যন্ত এয়ারপোর্ট রোডের ডানপাশে একটি বড় বন আছে এই প্রজাতির। শেরে-বাংলা নগরের জিয়া-উদ্যানে অঢেল।

Family : *Leguminosae*. Sub fam. *Mimosae*. Sc. name : *Acacia monoliformis*, Griseb. Place : Ramna green : Bangabandhu Avenue (1965).

দক্ষিনী বাবুল
পিথেসেলোবিয়াম ডুলসি

'দুএকটা সজারুর আসা যাওয়া ; উচ্ছল কলার
ঝাড়ে উড়ে চুপে সন্ধ্যার বাতাসে
লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার
গলিতে নেমে আসে।'

জীবনানন্দ দাশ

মধ্যম, চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র দ্বিপক্ষল। পত্রভিত্তি দুটি তীক্ষ্ণ দৃঢ় কাঁটাচিহ্নিত। পত্রিকা-সংখ্যা ৪, বিবর্ণ সবুজ, ১″—২″ দীর্ঘ। ফুল অত্যন্ত ছোট, মঞ্জরিবদ্ধ, সাদা। মঞ্জরির ব্যাস $\frac{১}{২}$″। ফল ৪″—৫″ × $\frac{১}{২}$″ আঁকাবাঁকা, ধূসর।

বাবলা আমাদের সুপরিচিত তরু। উত্তর বঙ্গের শুষ্কতায় অভ্যস্ত বাবলা সেখানকার সাধারণ গাছপালারই অন্যতম। ঢাকায় বাবলা নেই, কিন্তু দক্ষিণী বাবুলের সংখ্যা বহু। দুটি গাছের বাংলা নামের সাদৃশ্য সত্ত্বেও তারা ভিন্ন গণভুক্ত। বাবলার বৈজ্ঞানিক নাম 'অ্যাকাশিয়া অ্যারাবিকা'। দক্ষিণী বাবুল অ্যাকাশিয়ার কোনো প্রজাতি নয়। তার গণ ভিন্ন, তবে বাবলা আর দক্ষিণী বাবুল সমগোত্রীয় : 'মাইমোজি' গোএজ। রূপসী তরুদের মধ্যে দক্ষিণী বাবুল স্থান পাবার যোগ্য কিনা জানি না, তবু দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আগন্তুক এই গাছটির এলায়িত ভঙ্গি, পাতার ব্যতিক্রমী গড়ন ভালোই লাগে।

কান্ড দীর্ঘ, শীর্ষ এলোমেলো, বাকল ধূসর, অমসৃণ এবং সারা দেহ তীক্ষ্ণ কাঁটায় গাছটি দুর্ভেদ্য। দ্বিপক্ষল পাতা মাত্র দুজোড়া পত্রিকাতেই সীমিত এবং বিন্যাসও খুবই অদ্ভুত। কচি পাতা প্রথমে তামাটে, পরে নীলাভ-সবুজ। সারা গাছে বিক্ষিপ্ত এই সরু সরু পাতার নির্ঝর গাছটিকে সৌন্দর্য দিয়েছে। তাই কবির ভাষায় একেও বলা যায় :

'সচকিয়া চিকনিয়া কাঁপে তব কিশলয়রাজি
সর্ব অঙ্গে নিমেষে নিমেষে।'

ফুল অত্যন্ত ছোট, অনাকর্ষী এবং সাদাটে। শাখাপ্রান্তিক মঞ্জরি শিরীষ ফুলের মতোই, তবু এত ছোট ও ম্লান যে উৎসাহী নিসর্গী ব্যতীত তা কারও চোখে পড়ার মতো নয়। ফল চ্যাপ্টা, লম্বা এবং আঁকাবাঁকা, শাঁস মিষ্টি। এ গাছ অযত্নে অকাতর, সর্বসহিষ্ণু, দৃঢ়।

আমাদের দেশে সাধারণত বুর্ভেদ্য বেড়ার জন্যই সমাদর। অতি সহজে বীজ কিংবা ডাল থেকেই চারা জন্মায়। ঢাকার সর্বত্র গাছটি সহজলভ্য। মিন্টো-বেলী রোড এবং তেজগাঁর হলিক্রস কলেজের কাছে সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ে।

কাঠ তেমন মূল্যবান নয়, তবু চাষের যন্ত্রপাতি, গরুর গাড়ি ও প্যাকিং বাক্সে ব্যবহার্য। জ্বালানী হিসেবেও সমাদর রয়েছে। বর্ষা ফল পাকার সময়। পিথেসেলোবিয়াম গ্রীক শব্দ, অর্থ বানরের ফল 'ডুলসি' মিষ্টির লাতিন প্রতিশব্দ এবং তা ফলের মিঠা শাঁসের জন্যই।

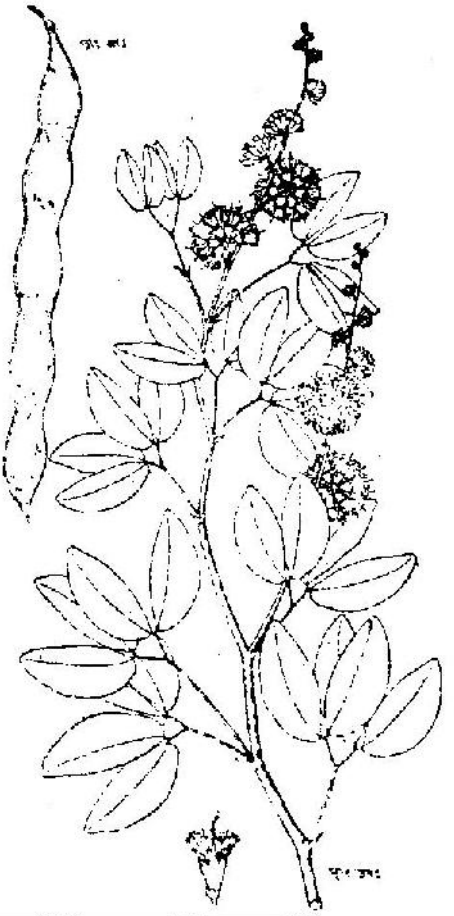

Family : *Leguminosae*. sub fam. *Mimosae*. Sc. name : *Pithecolobium dulce* Benth. Syn. : *Mimosae dulcis* Roxb ; *Inga duscis* willd. Beng. : Dakshini Babul. Hindi : Bilati imli. Eng. : Madras thorn. Manila Tamarind. Place : Minto & Baily Road, Near Holy Cross College, Tejgaon (1965).

পলাশ

বুটিয়া মনোস্পার্মা

আগুন-জ্বালা রং না হয় কিংকা।
পলাশ-কলি ওই আগুন-শিখা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মধ্যম বৃক্ষ। পত্র যৌগিক, ত্রিপত্রিক, পত্রিকা ৪″ — ৮″, শীর্ষপত্রিকা বৃহত্তম মঞ্জরি অনিয়ত, প্রায় ৬″ দীর্ঘ। পুষ্পবৃন্ত বাদামী, মখমল-কোমল, $\frac{১}{২}$″ — ১″ দীর্ঘ বৃতি বাদামী, $\frac{১}{২}$″, মখমল কোমল। পাপড়ি ২″ — ৩″, কমলা-লাল, সীমবৎ। ফল ৬″ — ৮″ × ১$\frac{১}{২}$″ — ২″ রূপালী, রোমশ।

পলাশের গুণগানে বাংলা ও সংস্কৃত বাক্য মুখর। কিন্তু সত্যি কি পলাশ এতই সুন্দর? ঢাকা এবং দেশের অন্যত্র পলাশের প্রস্ফুটন দেখা যায়। শাখা-প্রশাখা কেমন যেন জীর্ণ, আঁকাবাঁকা, ক্ষয়গ্রস্ত। প্রস্ফুটনেও প্রচুর্য নেই, আর সারা গাছের রিক্ততাকে ঢেকে দেবার পক্ষে আয়োজনটি খুবই দীন। এটা সম্ভবত এজন্য যে, পলাশ অপেক্ষাকৃত শুষ্কতায় অভ্যস্ত, তাই বাংলাদেশের বর্ষণপ্লাবিত মাটিতে তার পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ব্যাহত। তাছাড়া নিঃসঙ্গ পলাশের শোভা কোনোদিনই তেমন আকর্ষণীয় নয়। পলাশবন হলো ওর পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের উন্মোচক।

উজ্জ্বল প্রস্ফুটনের জন্যই পলাশের ইংরেজী নাম : 'ফ্লেইম অব দি ফরেস্ট' বা অরণ্যের অগ্নিশিখা। এমনি কোনো পলাশ-অরণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রস্ফুটনের সৌন্দর্য নিশ্চয়ই এক আশ্চর্য দৃশ্য। এজন্যই হয়তো তরুরাজ্যে তার ব্যাপক প্রতিষ্ঠা। শোনা যায় পলাশ-অরণ্যের জন্যই নাকি ঐতিহাসিক পলাশী মাঠের এই নাম। কিন্তু, ঢাকার পলাশী ব্যারাকের সঙ্গে এই গাছের সংযোগ ছিল কিনা আমার জানা নেই।

পলাশ মাঝারি আকারের গাছ, ২৫–৩০ অবধি উঁচু। কান্ড বহু শাখায় বিভক্ত, আঁকা-বাঁকা গাঁটযুক্ত, বাকল স্থূল, অমসৃণ ধূসর। পাতা যৌগিক, তিনটি পত্রিকার সমাহার, চর্ম, গাঢ়-সবুজ। পলাশ পত্রমোচী। শীতের শেষে গাছটি নিষ্পত্র হলে বিবর্ণ, আঁকাবাঁকা শাখা-প্রশাখার রিক্ততা খুবই করুণ হয়ে ওঠে। বসন্তে যখন ফুল-কলিরা রক্তিম পাখনা মেলে

প্রজাপতির মতো উদ্ভাসিত হয়, মৌমাছির ভীড় জমায় ডালে ডালে, তখনই পলাশ সর্বাধিক সুশ্রী। ফুলের পরপরই পাতার সবুজ আবার ফিরে আসে এবং অল্প সময়েই ঢেকে যায় উদোম ডালপালা, ঝরে-পড়া ফুলের রিক্ততা। পলাশের পাতার প্রচ্ছদ নিশ্ছিদ্র এবং ছায়াঘন।

ফুল কাঁকড়ার পাঞ্জার মতো দ্বিধাবিভক্ত। এ গাছ শিমগোত্রীয়, তাই পাপড়ি-বিন্যাসও তদ্রূপ। পাঁচটি মুক্ত পাপড়ির একটি সবচেয়ে বড়, সামনে প্রসারিত, অন্য চারটি পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো এবং বাঁকা। পলাশের পাপড়ি গাঢ়-কমলা, লালের কাছাকাছি। বৃতি বাদামী, রোমশ এবং পাপড়ি বর্ণের সঙ্গে সুস্পষ্ট বৈসাদৃশ্যে আকর্ষণীয়। ফল চ্যাপ্টা, একবীজীয়, রোমশ, শির চিহ্নিত, প্রথমে সবুজ এবং পরে হালকা হলুদ কিংবা পাণ্ডুটে, পাতলা, বায়ুবাহী।

লাক্ষাকীট পালনে কুসুমের পরই পলাশের স্থান। ফুল থেকে হলুদ রং মেলে, কিন্তু টেকসই নয়। বাকল মোটা আঁশসমৃদ্ধ এবং দড়ির উপকরণ। কাঠ নরম, তাই আসবাবপত্রে ব্যবহার্য। আঠা অরেচক হিসেবে বহুল ব্যবহৃত, বীজচূর্ণ চর্মরোগের

শ্যামলী নিসর্গ

প্রতিষেধক। হিন্দুদের কাছে গাছটি অত্যন্ত পবিত্র ; কাঠ হোম ও উপনয়ন অনুষ্ঠানের উপকরণ। হিন্দু ধর্মমতে ওর ত্রিপত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রতীক।

পলাশের পরাগায়ণের মাধ্যম মূলত পাখি। বীজ সহজেই অংকুরিত হয়, কিন্তু বৃদ্ধি মন্থর। চারার কচি শিকড় খুল, মাংসল।

ঢাকায় পলাশের প্রাচুর্য নেই। জগন্নাথ হলের কাছে এবং মতিঝিলে বৈধাৎ দুএকটি পলাশ গাছ চোখে পড়ে। বুটিয়া নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর উদ্ভিদবিজ্ঞানের লেখক 'আর্ল অব বুটির স্মারক। মনোস্পার্মা অর্থ এক বীজীয়। পলাশের সংস্কৃত নাম কিংশুক।

Family : *Leguminosae*. Sub fam. : *Papilionaceae*. Sc. name : *Butea monosperma* ktz. Syn : *B. frondosa* koen. Beng. : Palas, Pslashi. Hindi : Dhak, Tesu etc. Urdu : Palashpupra. Eng. : Flame of the forest. Place : Jagannath Hall and Motijheel (1965).

গ্লিরিসিডিয়া ম্যাকুলাটা

'নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরই দ্বারে
আয় আয় আয়
পরিবি গলার হারে।'

রবীন্দ্রনাথ

মধ্যম, পত্রমোচী বৃক্ষ। শীর্ষ ছত্রাকৃতি, প্রশাখাস্ত আনত। কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, বহুশাখী। পত্র একপক্ষল, বিজোড়পক্ষ, ১২´´ পর্যন্ত দীর্ঘ। পত্রিকা সংখ্যা ৯ — ১০, পত্রাক্ষে বিপ্রতীপে বিন্যস্ত, ঘন-সবুজ ; পত্রিকাপৃষ্ঠের বর্ণ ঈষৎ ম্লান, মৃদু রোমশ। মঞ্জরি অনিয়ত, বহু পৌষ্পিক, প্রলম্বিত্তে এবং প্রায় ৪´´ দীর্ঘ। বৃতিযুক্ত, $\frac{১}{৪}$´´ দীর্ঘ, প্রায় অখণ্ডিত, রক্তিম। পাপড়ি শিমগোত্রীয়, সাদা কিংবা মৃদু-রক্তিম। সম্মুখস্থ ধ্বজা হলুদ চিহ্নে চিত্রিত। পরাগ-কেশর দ্বিগুচ্ছ। ফল চ্যাপ্টা, ৮´´ × $\frac{৫}{৪}$´´ খড়বর্ণ। বীজ-সংখ্যা সর্বাধিক ১০

বসন্ত আমাদের প্রিয়তম ঋতু। আমাদের চিন্তায় বসন্তের আগমন ও তরুর প্রস্ফুটন অচ্ছেদ্য। আমাদের পলাশ, শিমুল, মাদার বসন্তের নকিব। তাদের পাপড়ির রক্তিম নির্ঝরেই আঁকা হয় ঋতুরাজের আগমনীর আলপনা। কিন্তু এ পর্যায়ে যার প্রস্ফুটন স্বকীয় স্বতন্ত্র্যে সর্বাধিক আকর্ষী, সে হলো গ্লিরিসিডিয়া। নাম থেকেই বোঝা যায় গাছটি পরদেশী। দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণমণ্ডলই মূল আবাস। কিন্তু আমাদের আবহাওয়ায় অভিযোজনা এতই সম্পূর্ণ যে দেশের দূরদূরান্তরেও আজকাল গাছটি চোখে পড়ে। ঢাকার কার্জন হল প্রাঙ্গণ এবং শেরে বাংলার মাজারের পূর্ণবয়স্ক গ্লিরিসিডিয়া ছাড়া শহরের আর সব কটি গাছই তরুণ। ইস্কাটনের হোলি ফ্যামিলি রোডে এদের একটি সুন্দর বীথি রয়েছে।*

এই বীথিতরু মধ্যমাকৃতির। বহু শাখায় বিভক্ত বৃক্ষশীর্ষ ছত্রাকৃতি, শাখা-প্রশাখা দীর্ঘ, নমনীয় ও আনত। বাকল নরম, স্থূল, ধূসর ও অসংখ্য সাদা সাদা ফোঁটায় চিহ্নিত। এই শেষতম বৈশিষ্ট্যের জন্যই নামের শেষাংশ ম্যাকুলাটা, অর্থ-তিলকিত এবং তা কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখার সর্বত্র ছড়ান।

---

* কোনোটিই বর্তমানে নেই।

ওর পাতার সৌন্দর্যও কম নয়। যৌগিক পত্র একপক্ষল এবং পত্রিকাসমূহ পত্ররক্ষে বিপ্রতীপভাবে বিন্যস্ত। শীর্ষপত্রিকা একক। ফলকের বুক গাঢ়-সবুজ কিন্তু বুকের সবুজ ঈষৎ ম্লান, বিবর্ণ। গাছ ছায়ানিবিড়। উদ্দাম পর্ণের প্রাচুর্যে, সবুজের উজ্জ্বল ঐশ্বর্যে এবং আন্দোলিত শাখার মর্মরে গ্লিরিসিডিয়া তরুর আদর্শ। শীত পাতা খসানোর সময়। হিমেল হাওয়ায় একদিন পর্ণের সজ্জা ঝরে পড়ে, এলায়িত তরুদেহ উদোম হয়, কিন্তু খুবই অল্পদিনের জন্য। বসন্তের শুরুতেই প্রস্ফুটনের ঐশ্বর্যে সব রিক্ততা, সব শূন্যতা মুছে যায়। নমনীয় বর্ণের এমন আশ্চর্য অবারিত পুষ্পোচ্ছ্বাস বিরল। পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত গ্লিরিসিডিয়া যেন প্রকৃতির সযত্নরচিত এক বিশাল পুষ্পস্তবক। ফুলে ফুলে সাদা এলায়িত দীর্ঘ শাখার এ সৌন্দর্যের তুলনা নেই। ফুলের বর্ণে কৃষ্ণচূড়ার ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু এমন অনুপম চন্দনস্নিগ্ধ প্রশান্তি অবশ্যই উজ্জ্বল বর্ণের চেয়ে কম সংবেদী নয়। ফুল মধুগন্ধী, তাই শাখায় শাখায় মৌমাছিদের ভীড়। বসন্তের ভোরে এ তরুর ঘনবিন্যস্ত বীথিকার সান্নিধ্য নিসর্গীদের পরম আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত তুলনাহীন এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় গ্লিরিসিডিয়া তরুরাজ্যের সুষমার প্রতীক।

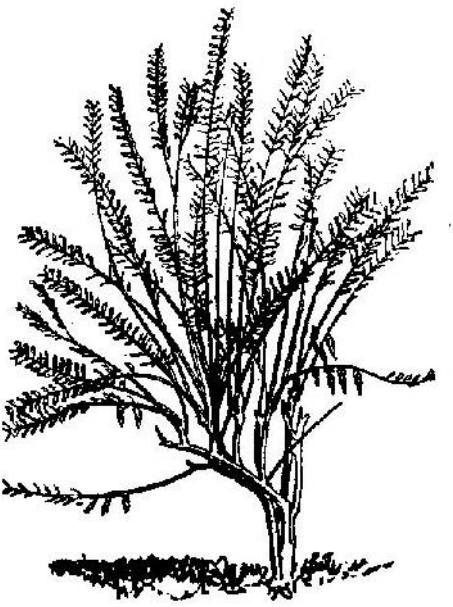

মঞ্জরি অনিয়ত, নাতিদীর্ঘ এবং বহুপৈপ্পিক। ফুল সীমগোত্রীয়, মৃদু-গোলাপী এবং আয়তন ও আকৃতিতে শিম কিংবা মটরশুঁটির খুবই ঘনিষ্ঠ। ফুলের সামনের প্রসারিত ধ্বজাটি হলুদাচিহ্নিত। পরাগকেশর গুচ্ছবদ্ধ এবং দ্বিধাবিভক্ত। ফুলের পর পরই পাতা ও ফলের সময়। ফল চ্যাপ্টা, লম্বা এবং পাকা অবস্থায় খড়-সাদা। বীজ থেকে খুব সহজেই চারা জন্মে এবং বৃদ্ধিও দ্রুত। ডাল কেটে লাগালেও অনেক সময় বেঁচে যায়। তিন বছর বয়সেই গাছে ফুল হয়। কোকো ক্ষেতে ছায়া দেবার জন্য দক্ষিণ আমেরিকায় ওর চাষ। গাছটি নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ, তাই পাতা সবুজ সারের উৎকৃষ্ট উপাদান।

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে গাছটি প্রথমে সিংহলে এবং পরে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় আমদানি হয়। ইদানীং ঢাকার বাইরেও বহুস্থানে গ্লিরিসিডিয়া চোখে পড়ে। ঢাকায় বেগম রোকেয়া হলের বিপরীতে লাইব্রেরি চত্বরে কয়েকটি অল্পবয়সী গাছ আছে।

গ্লিরিসিডিয়া লাতিন শব্দ, অর্থ—ইঁদুর-মারা বীজ ইঁদুরের বিষ, তাই এমন নামকরণ। ম্যাকুলাটা অর্থ—তিলকিত। সারা গাছে ছড়ানো তিলের জন্যই এ নাম। পথপার্শ্ব, উদ্যান ও বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণের জন্য গাছটি খুবই মানানসই।

Family : *Leguminosae*. Sub fam. : *Papilionaceae*. Sc. name : *Gliricidia maculata* H.B.K. English : Madre tree, Mother of Cocoa. Place : Holy Family Hospital Road (1965).

মিলেশিয়া ওভেলিফলিয়া

'হীরামুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা।'

রবীন্দ্রনাথ

দীর্ঘাকৃতি পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র যৌগিক, একপক্ষল। পত্রিকা ৭, ডিম্বাকৃতি, ২″ দীর্ঘ, মসৃণ বৃন্ত $\frac{১}{৮}$″ — $\frac{১}{৬}$″। মঞ্জরি অনিয়ত, বহুপৌষ্পিক, আনত। বৃতি যুক্ত, রঞ্জীন। পাপড়ি শিমগোত্রীয়, রক্তাভ-বেগুনী, $\frac{১}{৪}$″ দীর্ঘ। ফল ২″ — ৩″ × $\frac{১}{৩}$″, চ্যাপ্টা, সম্মুখ ও প্রান্ত সরু, খড়বর্ণ।

১৯৬২ সালের একটি বসন্ত-দিনের কথা মনে পড়ে। জি.পি.ও-র সামনের এভিনিউর মাঝখানের একসারি গাছ সেদিন হঠাৎ নীলাভ ফুলের স্তবকে স্তবকে আপনার পরিচয় অবারিত করেছিল। মুহূর্তের জন্য হলেও সেদিন সবচেয়ে ব্যস্ত পথিকও এদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপনে ব'রেক না দাঁড়িয়ে পারেন নি। কারণ, এমন ফুলের রং, মঞ্জরির এমন সজ্জা ঢাকবাসীর কাছে একেবারেই নতুন। আমি নিজেও দাঁড়িয়েছিলম। মনে হয়েছিল যেন মণি-মাণিক্যে রচিত এই মঞ্জরি স্বপ্নলোকের, পৃথিবীর নয়। এই ঔজ্জ্বল্য, সুষমা ও বর্ণবিন্যাসের তুলনা নেই। তাই কবিগুরুর প্রশস্তি এদেরও প্রাপ্য :

'তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছ নীলমণি
স্বচ্ছ নীলাম্বর সম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।'

গাছটি এদেশে নতুন। ব্রহ্মদেশের শুধুমাত্র প্রোম জেলাতেই একদা সে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন অবশ্য ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দূরদূরান্তরে। এসব অঞ্চলের আবহাওয়ার আনুকূল্যেই তা ঘটেছে।

গাছটি নাতিদীর্ঘ, কান্ত মসৃণ, কিংবা সাদাটে। শীর্ষ একটু লম্বাটে ধরনের, শাখাবহুল এবং প্রশাখাগুলি আনত। যৌগিক পাতাগুলি ঘন-সবুজ, মসৃণ, পত্রিকাসংখ্যা সাত, শীর্ষপত্রিকা বেজোড়, ডিম্বাকৃতি। মিলেশিয়া পত্রমোচী। শীত পাতা ঝরার কাল। নতুন পাতা গজায় বসন্তের শেষে

প্রায় নিষ্পত্র মিলেশিয়ার অজস্র চিকন শাখা-প্রশাখায় নীলাভ ফুলের অবারিত উচ্ছ্বয় এক আশ্চর্য দৃশ্য। অনিয়ত মঞ্জরি বহুপৌষ্পিক, দীর্ঘ এবং ঝুলন্ত গাছটি শিগোত্রীয় বিধায় ফুলের গঠনভঙ্গি শিম কিংবা মটরশুটির অনুগ। ফুলের এমন রঙের তুলনা দেশীয় তরুতে নেই। জারুলের বেগুনীতে লাল মিশলে যে-রং খোলে তাই মিলেশিয়ার । এ লাইলাকের রং। ছোট অথচ উজ্জ্বল ফলে আচ্ছন্ন এই নিষ্পত্র গাছের বর্ণচ্ছটা শুধু একটি

নীলাভ আলোকসজ্জার সঙ্গেই তুলনীয়। এই নীলাভ-লালিমের ঝর্ণাধারার বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। এই উচ্ছ্বাস কিন্তু ক্ষণিকের। হঠাৎ যেমন এই রং একদিন জ্বলে ওঠে, তার সমাপ্তিও ঘটে তেমনি অকস্মাৎ।

ফুল ঝরে পড়ার পরই কচি ফল আর সবুজ পাতায় গাছটি ঢেকে যায়। ফুলের ঐশ্বর্য ছাড়াও পাতার সবুজে ছায়াঘন মিলেশিয়া কম আকর্ষণীয় নয়। ফল চ্যাপ্টা ও ধারালো। খুব সহজেই চারা জন্মে এবং যেকোনো স্থানেই লাগানো চলে। কোনো দেশী নাম নেই। বৈজ্ঞানিক নামের প্রথমার্ধ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী সি. মিলেটের (১৮২০) স্মরণিক। শেষাংশ লাতিন শব্দ, অর্থ—ডিম্বপত্রী।

পূর্বস্থনে গাছগুলি নেই আছে শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, রমনা পার্কে, সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে একটি বড় গাছ আছে সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে অধ্যক্ষার বাসার সামনে।

Family : *Leguminosae*. sub fam : *Papilionaceae*. Sc. name : *Millettia ovalifolia* Kurz. Place : Infront of G.P.O. (1965).

শিশু

ড্যালবার্জিয়া শিশু

'পুনরপি নরয়ায় শিংশপা বৃক্ষেতে যায়
বেতাল ধরিয়া পুনঃ নামে।'

বেতাল পঞ্চবিংশতি

বিরাট পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র একপক্ষল, বিজোড়পক্ষ; শীর্ষপত্রিকা ১"—৩" লম্বা, পত্রাক্ষে একান্তরে বিন্যস্ত, ডিম্বাকৃতি, শীর্ষপত্রিকা বৃহত্তম কচি পাতা রোমশ, কিন্তু পরিণত অবস্থায় মসৃণ, পত্রাক্ষ আঁকাবাঁকা। মঞ্জরি নাতিবৃহৎ। ফুল শিমগোত্রীয়, ননীশুভ্র, $\frac{1}{3}$" দীর্ঘ। পুংকেশর ৯, এক-গুচ্ছ। ফল ঈষৎ দীর্ঘ, চ্যাপ্টা, পাতলা। কচি ফল হালকা সবুজ, পক্ব ফল খড়বর্ণ, ১—৪ বীজীয়।

শিশু ভারত উপমহাদেশের অন্যতম মূল্যবান বৃক্ষ। দারুমূল্যে সেগুনের পরই তার স্থান। গাছের আকৃতি বিরাট, কাণ্ড দীর্ঘ, ধূসর এবং বাকল অজস্র লম্বা ফাটলে রুক্ষ। শীর্ষ উন্নত কিন্তু শাখাপ্রশাখার প্রান্ত আনত। পত্র যৌগিক, আকৃতি আয়তন ও বিন্যাসে মিলেশিয়ার ঘনিষ্ঠ, ম্লান সবুজ। এ গাছ তেমন ছায়ানিবিড় নয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সরু সরু পাতার এলোমেলো বিক্ষেপ, হালকা সবুজ রঙ এবং হাওয়ায় মৃদু স্বনন একে আকর্ষণীয় করেছে। পত্রাক্ষ আঁকাবাঁকা এবং পত্রিকাবিন্যাস একান্তর। গাছটি পত্রমোচী। পাতা ঝরে শীতে আর নতুন পাতা গজায় বসন্তে। পত্রমোচী অন্যসব গাছের মতই কচি পাতার সবুজে ঢাকা শিশুও সুদর্শন। বসন্ত প্রস্ফুটনের কাল। ফুলের উদ্দাম প্রাচুর্য সত্ত্বেও প্রস্ফুটন নিষ্প্রভ। ফুলেরা আকারে যেমন ছোট, বর্ণেও তেমনি ম্লান-সাদা। পাতার আড়ালে ফুলেরা প্রচ্ছন্ন থাকে। শিমগোত্রীয় ফুলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে শিশুফুল আকার ও আয়তনে মিলেশিয়ার খুবই ঘনিষ্ঠ। ফুলের রঙ বাদ দিলে অল্পবয়স্ক শিশু আর মিলেশিয়ার সাদৃশ্য খুবই নিকট। তাদের পাতা এবং শাখা-প্রশাখার আনত ভঙ্গি অভিন্নপ্রায়। শিশুফুল মৃদু সুগন্ধি। ফুল ঝরার পরই সারা গাছ ফলের ঢল নামে কচি সবুজ, পাতলা, চ্যাপ্টা ফলের অজস্র প্রাচুর্যে বলতে গেলে শিশুর শ্রীবৃদ্ধিই ঘটে। ফল হাওয়াবাহী এবং দূরবিক্ষেপণের জন্য তার পাতলা, চ্যাপ্টা গড়ন খুবই উপযোগী। অতি সহজেই চারা জন্মে এবং বৃদ্ধিও দ্রুত। শিশু গাছের প্রসারিত মূল থেকেও বহু চারা জন্মে এবং এগুলিও রোপণ করা চলে।

কাঠ খুবই মূল্যবান, দৃঢ়, স্থায়ী এবং জলে-রৌদ্রে ফাটে না। আসবাব, গৃহের সরঞ্জাম, নৌকা এবং খোদাই কাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বীজতৈল চর্মরোগে উপকারী, কাঠের গুঁড়ো কুষ্ঠের ঔষধ।

হিমালয়ের পাদদেশ আদি-বাসস্থান। ঢাকায় শিশু খুব বেশি নেই। কার্জন হলের সামনে গভর্নমেন্ট হাউস রোডে দু'টি শিশু গাছ আছে। ড্যালবার্জিয়া নাম সুইডিশ উদ্ভিদবিদ

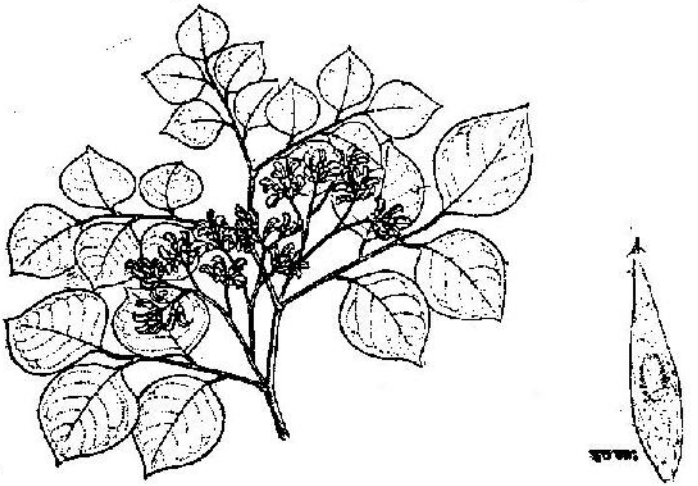

নিকোলাস ডালবার্গের (১৮২০) স্মৃতিজড়িত। শিশু দেশীয় নাম। সংস্কৃত নাম শিংশপা। পথের পাশে এবং বিস্তৃত প্রাঙ্গণে রোপণ প্রশস্ত। বিহারে ক্ষেতের জমির আইলে লাগান হয়।

বর্তমানে ঢাকায় অঢেল শিশু লাগান হয়েছে। শান্তিনগর পুলিশ লাইনে পথপাশে ও শেরে বাংলা নগরের পশ্চিমের মঠপাবে অনেকগুলি শিশুগাছ রয়েছে।

Family : *Leguminosae*. Sub. family : *Papilionaceae*. Sc. name : *Dalbergia sissoo* Roxb. Bengali : Sisu. Hindi : Shisam, Tali etc. English : South Indian Red wook. Place : In front of Curzon Hall (1965).

করনজা

পংগামিয়া পিনাটা

'মাণ্ডার পাণ্ডার কাটে শতমূলী।
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলী॥
তমাল অর্জুন করঞ্জা বন।
কাটে কোকিলাক্ষ চিরতা কানন॥'

কবিকঙ্কন চণ্ডী

মধ্যম, পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র একপক্ষল, বিজোড়পক্ষ, ৮″ — ১৪″ দীর্ঘ। পত্রিকা-সংখ্যা ৫ কিংবা ৭, মসৃণ, ২″ — ৫″, কালচে সবুজ। মঞ্জরি অনিয়ত, কাক্ষিক, শাখায়িত এবং নাতিদীর্ঘ। ফুল শিমগোত্রীয়, হালকা-বেগুনী কিংবা প্রায় সাদা, $\frac{১}{২}$″ দীর্ঘ। ফল ১$\frac{১}{২}$″ — ২″ দীর্ঘ, ঈষৎ বাঁকানো, স্থূল, একবীজীয় এবং কঠিন। ফলের বোঁটা $\frac{১}{৪}$″ দীর্ঘ

ঢাকায় করনজার সংখ্যা কম না হলেও সুবিন্যস্ত কোনো বীথিকা নেই। অথচ এই ছায়াতরুটি বহু আকর্ষণীয় গুণধর। মিন্টো-বেলী রোড অঞ্চলের কোনো কোনো বাড়ির সীমানায়, মতিঝিল ও কাওরান বাজারের জলাভূমির কিনারে এবং শহরের পড়ো জমিতে করনজা প্রায়ই চোখে পড়ে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এ-গাছ ঢাকায় এক সময় অঢেল ছিল, কিন্তু বর্ধমান শহরের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষার জন্যই যেন তারা ক্রমাগত স্থান বদলে কোনোক্রমে বেঁচে রয়েছে। অনাদর অবহেলায় অভ্যস্ত এ গাছের প্রাণশক্তি অঢেল বলেই সে টিকে আছে।

করনজার আকার মাঝারি, কান্ড ধূসর বর্ণ, গিঁটযুক্ত, মসৃণ ও খাটো। শাখা-প্রশাখা বহু এবং ভূ-মুখীন, তাই মাথা ছাতার মতো ছড়ানো। যৌগিক পত্র বৃহৎ এবং একপক্ষল, শীর্ষপত্রিকা বিজোড়। কচি পাতা উজ্জ্বল সবুজ, কোমল এবং নমনীয়, পরিণত পাতার গ্রথন দৃঢ় এবং বর্ণ কালচে সবুজ। এ গাছ ঘনবদ্ধ পাতায় নিশ্ছিদ্র, ছায়ানিবিড়।

করনজা পত্রমোচী। শীত পাতা ঝরার দিন। বসন্তের শেষে নতুন পাতার প্রাচুর্যে তার শ্যামলী উজ্জ্বলতা ফেরে। কচি পাতার কোমল সবুজে করনজা গাছ তখন মনোহারী। পাতা গজানোর পরপরই ফুল ফুটানোর দিন। ছোট ছোট মঞ্জরি পাংশু ফুলের বৈন্যে নিষ্প্রভ

হলেও পাতার ঘন সবুজ পটভূমিতে সেগুলিকে যথেষ্ট সুন্দর দেখায়। ফুল শিমজাতীয় ফল খাটো চ্যাপ্টা ঈষৎ বাঁকানো, স্থূল, কঠিন। পাতা-ঝরার পর শাখায় গুচ্ছে গুচ্ছে ঝুলে থাকা অজস্র ফল দেখা যায়। বছর শেষ না হলে ফল পাকে না। ফল ফেটে বীজ ছড়ানোর শিমগোত্রীয় রীতি করনজায় অনুপস্থিত। এই ফল না পচলে বীজ অংকুরিত হয় না। গাছ জলের ধারে জন্মে বলে ফল জলে ভেসে স্রোতের টানে দূরদূরান্তর ছড়ায়।

এক সময় বীজতেল জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হত। বাকলের আঁশ থেকে দড়ি তৈরি হয়। কাঠ শক্ত কিন্তু আসবাবে ব্যবহার্য নয়। তাই জ্বালানী হিসেবেই ব্যবহৃত। বীজতেল চর্মরোগে উপকারী।

আদি জন্মস্থান চীন, মালয়, সিংহল, অস্ট্রেলিয়ার উষ্ণমণ্ডল এবং ভারত-বাংলাদেশ। যদিও সমুদ্রকূল এবং জলাভূমি এ গাছের প্রিয় আবাস, তবু শুষ্কতায়ও ওরা অনভ্যস্ত নয়। পথতরু হিসেবে করনজা ভালই। বীজ ছাড়াও কলমে চাষ সম্ভব। 'পংগামিয়া' এ গাছের তামিল নাম পিনাটা অর্থ পক্ষলপত্রী।

Family : *Leguminosae*. Sub. fam. : *Papilionaceae*. Sc. name : *Pungamia pinnata (Linn) Merr*. Syn. : *P. glabra* vent . Hindi : Karanja Pahari. English : Indian beech. Bengali : Karanja, Dahur, Karnuj. Place : Minto-Baily Road. Motijheel & Kawran bazar etc. (1965).

মান্দার

ইরিত্রিনা ভ্যারিগাটা, ভ্যার. ওরিয়েন্টালিস

'অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটির প্রাঙ্গণে
পিতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মান্দারমঞ্জরি।'

রবীন্দ্রনাথ

মধ্যম, পত্রমোচী, কণ্টকিত বৃক্ষ। সর্বমোট উচ্চতা অনধিক ৫০ ফুট। পত্র যৌগিক, ত্রিপত্রিক। পত্রিকা প্রায় ত্রিভুজাকৃতি, ৪″ — ৬″ দীর্ঘ। অনিয়ত মঞ্জরি বহু পুষ্প সম্বদ্ধ, প্রায় ১৫″ দীর্ঘ। বৃন্ত যুক্ত, ১″ দীর্ঘ। পাপড়ি শিমগোত্রীয়, সিঁদুর-লাল ; সমনের বৃহত্তম পাপড়ি-দৈর্ঘ্য প্রায় ২″, অন্যেরা ১ ½″। পুংকেশর গুচ্ছবদ্ধ, দীর্ঘ। ফল ৬″ — ৮″, বাঁকানো, গাঁটযুক্ত এবং গাঢ়-ধূসর। বীজ-সংখ্যা ১—৮, মসৃণ, লাল।

ইরিত্রিনা গ্রীক শব্দ, অর্থ লাল রঙ। মান্দার ফুলের রক্তিম ঔজ্জ্বল্যের জন্যই এই নাম, সার্থক নাম। ঠিক এমন সিঁদুর-লাল ফুলের তুলনা আমাদের দেশে বিরল। অথচ মান্দার নেহাৎই অনাদরে অবহেলায় পড়োজমি, খালের ধার, বাড়ির সীমানায় আমাদের অলক্ষ্যে বেড়ে ওঠে! একদিন বর্ণের দুর্লভ ঐশ্বর্যে প্রস্ফুটিত হলে আমরা চলার পথে বারেক তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেই এবং দ্রুত ভুলে যাই।

কোনো বৃক্ষই তো মানুষের প্রশংসার প্রত্যাশী নয়, তাই মান্দারও প্রস্ফুটন অব্যাহত রাখে বহুদিন। এই বহুপৌষ্পিক অগ্রোন্মুখী মঞ্জরির পরমায়ু দীর্ঘ, সৌন্দর্যে তুলনাহীন। কণ্টকিত শরীর, এলোমেলো শাখা প্রশাখা, ছড়ানো পাতার সঙ্গে এমন পুষ্পসজ্জাকে হঠাৎ বেমানান ঠেকে। সে উজ্জ্বল বর্ণের ধ্বজা উড়িয়ে বসন্তকে স্বাগত জানায়। ওতো আমাদের দেশজ তরু। বিদেশী হলে আমরা অবশ্যই তার গুণকীর্তনে মুখর থাকতাম।

মান্দার গাছের কান্ড নাতিদীর্ঘ এবং বহু শাখায় বিভক্ত। ম্লান-ধূসর বাকল হলুদ-সবুজে মেশানো রেখায় চিত্রিত। সরু দেহ, এমনকি প্রশাখার শেষ প্রান্ত অবধি দৃঢ়, অনুচ্ছ, তীক্ষ্ণ

কালো রঙের কাঁটায় দুর্ভেদ্য। অবশ্য বয়স্ক মান্দারে কাঁটার সংখ্যা কম এবং ক্ষেত্রবিশেষে কান্ড প্রায় নিষ্কন্টক। গাছটি কোমল এবং নমনীয়। শুকনো ডালপালায় তরুতল ভরে থাকে। সেজন্য মান্দারতলা দুষ্প্রবেশ্য। এই ত্রুটির জন্যই বাগান, পথ কিংবা ঘরের প্রাঙ্গণে মান্দার রোপন জনপ্রিয় নয়।

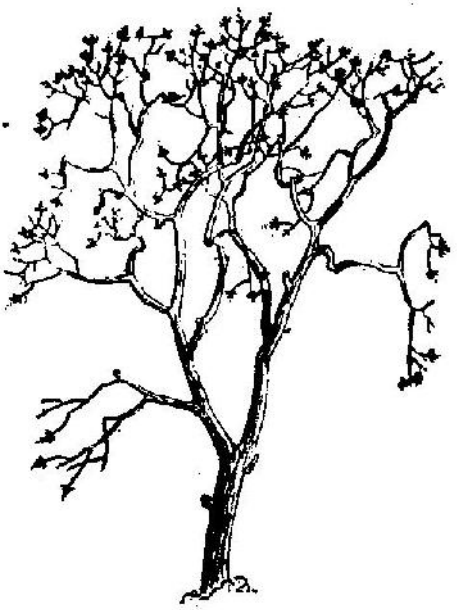

গাছটি স্বল্পপত্রিক, পাতা যৌগিক, ত্রিপত্রিক। প্রতিটি পত্রিকা উজ্জ্বল সবুজ, মসৃণ এবং প্রায় ত্রিভুজাকৃতি। শীর্ষপত্রিকা বৃহত্তম। শীত পাতা-ঝরার দিন। বসন্তে মান্দার গাছে নতুন পাতা গজায়।

মান্দারের প্রস্ফুটনকালও বসন্ত। শোভা শুধু ফুলের বর্ণে নয়, বিন্যাসেও। উৎক্ষীপ্ত পরাগগুচ্ছ ও আলতা-রং পাপড়ি, সামনের প্রসারিত ধ্বজা সব মিলিয়ে এই ব্যঞ্জনায় তরুরাজ্যে দুষ্প্রাপ্য একটি অনন্যতা আছে। পলাশের মতো মান্দারও শিমগোত্রীয় বিধায় তদের পৌষ্পিক গঠন অভিন্ন। এখানেও সেই পাঁচটি পাপড়ির সবচেয়ে বড়টি উন্মুক্ত, সামনে প্রসারিত এবং অন্যরা পিছনে পরস্পরের সঙ্গে জড়নো ও আকার-আয়তনে অনেক ছোট। ফল লম্বা-বাঁকানো, গাঢ়-ধূসর, গাঁটযুক্ত এবং ডাটার প্রান্তে অজস্র সংখ্যায় গুচ্ছবদ্ধ। কাঠ হালকা, কিন্তু স্থায়ী। বাকল থেকে আঁশ এবং ফুল থেকে লাল রং নিষ্কাশন সম্ভব। বাকলের রস আমাশয় এবং পাতার রস দাঁত ও কান ব্যথায় উপকারী। ঢাকায় মান্দার অনেক, তবে সবই বিক্ষিপ্ত।

মান্দারের একটি নিকটতম প্রজাতি রয়েছে; নাম ইরিত্রিনা ওভেলিফলিয়া। প্রথম দৃষ্টিতেই একেও মান্দার বলেই মনে হয়। মান্দারের সে খুবই ঘনিষ্ঠ। তবু শেষোক্ত গাছের দুটি উল্লেখ্য স্বাতন্ত্র্য আছে—একটি পাতা, অন্যটি ফুলের রং। এর পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, ত্রিভুজাকৃতি নয় এবং ফুলের মঞ্জরি ছোট, বর্ণেও অনুজ্জ্বল। এই লাল সিঁদুরে নয়, কালোর কাছাকাছি।

বীজ ছাড়া ডালেও মান্দারের বংশবিস্তার এবং শেষোক্ত পদ্ধতিই বহুল প্রচলিত।

সাধারণত বেড়ার জন্যই মান্দার লাগান হয়।

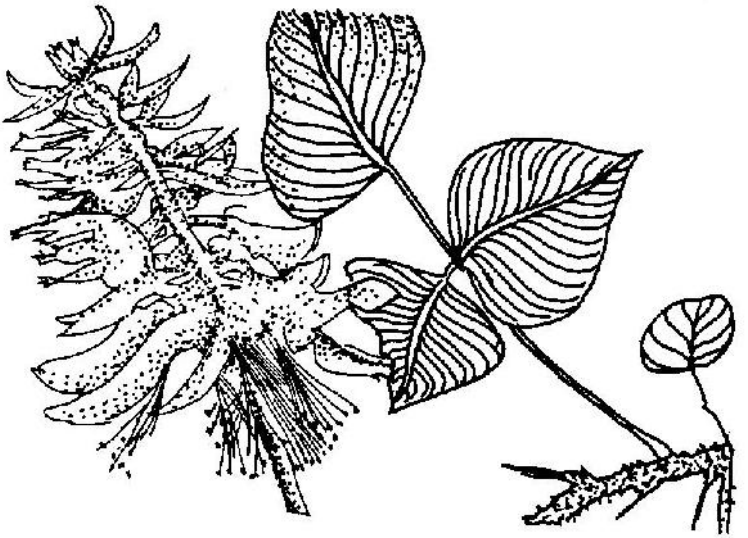

Family : *Leguminosae*. Sub.fam. : *Papilionaceae*. 1. Sc. name : *Erythrina variegata* L. Var. *orientalis* (L) Merr. Bengali : Madar. Palit madar, Raktamadar, Mandar. Hindi: Pangra. Dadap, Panjira etc. Eng. : Coral tree, Mochi wood, 2. Sc name : *Erytrina ovalifolia Roxb.* Bengali : Harikakra.

পাদাউক

টেরোকার্পাস ইন্ডিকাস্

'দিও ফুলদল বিছায়ে পথে বধুর আমার
পায়ে পায়ে দলি ঝরা সে ফুলদল
আজি তার অভিসার।'

নজরুল

বিরাট, পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র একপক্ষল, বিজোড়পক্ষ, ৬″—৯″ দীর্ঘ পত্রিকা-সংখ্যা ৫, ৭ কিংবা ৯, মসৃণ, প্রায় ২″ দীর্ঘ এবং পত্রাক্ষে একান্তরে বিন্যস্ত। মঞ্জরি অনিয়ত, কক্ষিক, বহুপৌষ্পিক, ঝুলন্ত, নাতিদীর্ঘ। পুষ্প শিম্বগোত্রীয়, $\frac{১}{২}$″ হলুদ, সুগন্ধি। বৃন্ত $\frac{১}{৫}$″—$\frac{১}{৪}$″, যুক্ত। ধ্বজ $\frac{৩}{৪}$″—$\frac{১}{২}$″ ফল গোলাকৃতি, ১″—২″ চওড়া, রেশমী-রোমশ; পক্ব ফল শুকনো, ধূসর, বায়ুবাহী।

প্রস্ফুটনের স্বল্পস্থায়িত্বের যদি কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে তবে সে-ক্ষেত্রে পাদাউক অনন্য। কোনো ভোরে হয়ত মঞ্জরির হলুদ ফুটেছে আলো হয়ে সারা গাছে, বাতাস ভরে উঠল মধুগন্ধে, কিন্তু পরদিন কোন চিহ্ন কোথাও থাকবে না। এক দিনের ব্যবধানে নিঃশেষে মুছে যাবে সব রং, শুধু নিচে ছড়িয়ে থাকবে অজস্র ঝরাফুলের হলুদ। স্বল্পায়ু প্রস্ফুটন সত্ত্বেও বর্ণে, ঔজ্জ্বল্যে, সুগন্ধের ঐশ্বর্যে, দেহসৌষ্ঠবের আভিজাত্যে পাদাউক তরুরাজ্যের অন্যতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৃক্ষ।

এই প্রস্ফুটনের একটি স্মৃতি আমার চিরদিন মনে থাকবে। ১৯৬৪-এর বসন্তের শেষে একদিন ভোরে কলেজে যাচ্ছিলাম। জি.পি.ও.-র কাছে সেকেণ্ড গেটে বাস থেমেছে। হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝলক আশ্চর্য সুগন্ধ এলো। প্রথমে আমারই চোখে পড়লো কাছে পাদাউক গাছ : সারা শরীর ছেয়ে নেমেছে হলুদের ঝর্ণাধারা। আমি বাস থেকে নেমে গেলাম। রোজ এ-পথে যাই, লক্ষ্য করি গাছটাকে—সেই পাতাঝরা থেকে শুরু করে মুকুলিত হওয়া অবধি। কিন্তু হঠাৎ একসঙ্গে সবকটি মঞ্জরির এমন বিস্ফোরণ আশা করিনি। দেখলাম পাতার প্রাচুর্য ফুলের উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন। উঁচু গাছের মাথা থেকে গোড়া অবধি যেন গলিত সোনার ঝর্ণা ঝরছে, আর মধুগন্ধে উদ্বেল শহরের বাতাস, মুখর হয়েছে ভোমরারা। সেদিন শহরের যেখানেই এ-গাছ রয়েছে সেখানেই একই দৃশ্য আমার চোখে

পড়েছে। কিন্তু পরদিন কলেজে যাবার পথে যখন এ গাছের দিকে তাকিয়েছি, দেখেছি অপব্যয়ীর মতো সে তখন একেবারে রিক্ত, শূন্য। মাত্র একদিনের ব্যবধানেই তার সব সম্পদ উজাড় হয়ে গেছে, সে দেউলিয়া সেজে বসেছে। শুধু ছিল গাছের নিচে ঝরে-পড়া পাপড়ির হলুদ, যেন বিগত উজ্জ্বলতার স্মৃতি। কোথাও কিছু নেই : ভোমরার উধাও, মধুগন্ধ নিশ্চিহ্ন, সারাগাছ থমথমে বিষণ্ণতা।

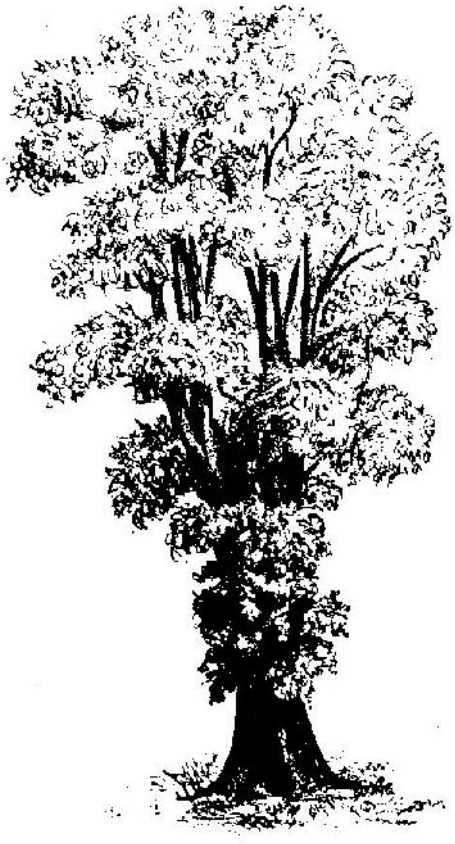

পাদাউক বিরাট, উঁচু বৃক্ষ। সম্ভবত প্রতি বছরই তার প্রস্ফুটনের প্রাচুর্য ঠিক একই রকমের হয় না। কোনো বছর মাত্র কয়েকগুচ্ছ মঞ্জরিতেই প্রস্ফুটন সীমিত থাকে এবং বৃক্ষচূড়ায় মুখ লুকিয়ে পথিকের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে যায় কিন্তু ফুল ছাড়াও তার অন্যতর ঐশ্বর্য আছে। ঘনবদ্ধ পাতার উজ্জ্বল প্রগাঢ় সবুজ, কাণ্ডের বিশালতা, শীর্ষের বিস্তার এবং দারুমূল্য -- সব মিলিয়ে পাদাউক তরুরাজ্যে শ্রেষ্ঠদের অন্যতম

কাণ্ড অনুচ্চ, শাখায়িত, পাঁশুটে এবং প্রায় মসৃণ শীর্ষ বিশাল, ছত্রাকৃতি কিংবা এলোমেলো, পত্রঘন শাখান্ত দীর্ঘ ও আনত। শাখা-প্রশাখা নুয়ে পড়ার এই নমনীয় ভঙ্গিটি বৃক্ষ-সৌন্দর্যের অন্যতম অনুষঙ্গ।

পত্র যৌগিক এবং পত্রিকাসমূহ একাণ্ডরে পত্রাক্ষে বিন্যস্ত, শীর্ষ-পত্রিকা বিজোড়। পাদাউক পত্রমোচী। শীতের শেষে নিষ্পত্র গাছে কিছু শুকনো ফল ছাড়া জীবনের কোনো চিহ্ন থাকে না। অবশ্য অবস্থাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বসন্তের উষ্ণতায় পাতার সবুজ আবার ফিরে আসে এবং সারা গাছ ঢেকে দেয়। গাছটি ছায়ানিবিড় এবং পাতার উজ্জ্বল সবুজে আকর্ষী। বসন্তের শেষে পাদাউক মুকুলিত হয় : মঞ্জরি অনিয়ত শাখায়িত এবং বহুপৌষ্পিক, ফুল ছোট ও শিমগোত্রীয়। ফল গোল চাকতির মতো। কচি ফল রেশমী-সবুজ, শুকনো অবস্থায় বিবর্ণ ধূসর।

পাতা ঝরে পড়ার পরও ফলেরা টিকে থাকে কিছুদিন এবং পরে হাওয়ায় দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলের চ্যাপ্টা কিনার আসলে ছড়ানো বাকল এবং এজন্য ফল পক্ষল। এই গাছ সনাক্তির পক্ষে ফলই সহজসূত্র। অন্য কোনো গাছেই এ-শহরে এমন ফল হয় না।

কাঠ কঠিন, স্থায়ী এবং মূল্যবান, সারাংশ ইটের মতো পোড়া-লাল। গৃহনির্মাণ, আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতিতে এই কাঠ ব্যবহার্য। পাতা জ্বর উপশমে উপকারী, বীজ বমনোদ্রেককর ঔষধ।

পাদাউক ঢাকার অন্যতম প্রধান পথতরু। সবচেয়ে সুদৃশ্য বীথি রয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনের হেয়ার রোডে। পাদাউক কিন্তু এই গাছের বর্মি নাম। অবশ্য নামটি আমাদের দেশেও প্রচলিত। আদিস্থান বার্মা-মালয়, তবে চট্টগ্রামের জঙ্গলেও পাদাউক জন্মে। বীজ থেকে সহজেই চারা হয় এবং বৃদ্ধিও দ্রুত।

বৈজ্ঞানিক নামের প্রথমাংশ টেরোকার্পস গ্রীক শব্দ, অর্থ—পক্ষল ফল আর ইণ্ডিকাস্ মানে ভারতীয়

Family : *Leguminosae*. Sub.fam. : *Papilionaceae*. Sc. name : *Pterocarpus indicus* willd. Beng. : Padauk. Eng. : Burmese rose-wood, Senna tree. Place : Hare Road, front of President's house (1965).

ফল, ফুল ও পাতা সব্জী হিসেবে জনপ্রিয়। বকফুলের কাঠ শুধুই জ্বালানীতে ব্যবহার্য। বাকল অরেচক, টনিক এবং জলবসন্তের প্রতিষেধক, শিরড় বাতের ঔষধ।

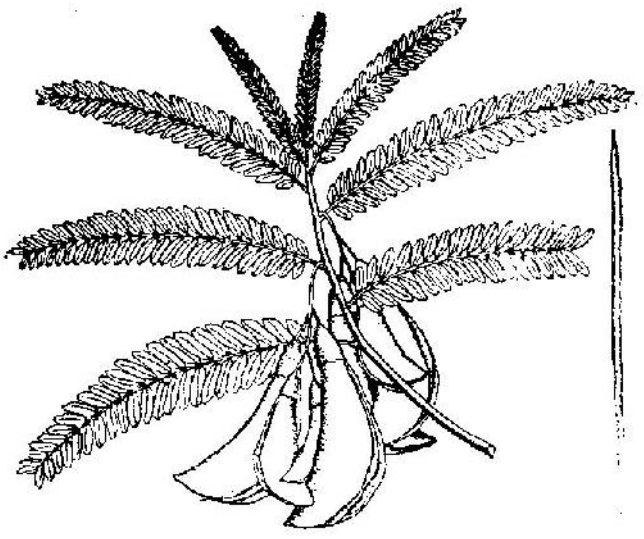

মলয় এ গাছের আদিভূমি। ঢাকায় রমনা পার্কে বকফুলের কয়েকটি সারি রয়েছে। স্যেসবেনিয়া এই গাছের আরবি নাম গ্রন্থিফেরা লাতিন শব্দ, অর্থ—বড় ফুল।

Family : *Leguminosae*. Sub. fam : *Papilionaceae*. Sc. name : *Sesbania grandiflora* pers. Syn. *Aeschynomene grandiflora* Roxb. Bengali : Bakphul, Agati, Agasti, Bagphul. Hindi : Agasti, Bak, Basta, Hatiya, Basna. Urdu : Agasti. Eng. : Swamp pea. Place : Ramna Park (1965).

বিলাতী ঝাউ

ক্যাস্যুরিনা ইকুইসেটিফোলিয়া

> *'তখন বাইরে খেয়ালী বসন্তের মাঝরাতের এলোমেলো হাওয়া*
> *বাগানের আমকাঁঠাল গাছগুলোর মধ্যে যথেচ্ছাচার করছে,*
> *দোলের সঙ্গে শূন্যতা উঠছে ব্যথিয়ে, আর ঝাউগাছ ক'টা*
> *বহু যুগের পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত আকাশটাকে করছে উন্মনা।'*
>
> প্রমথনাথ বিশী

পূর্ণ বয়স্ক বৃক্ষ সুউচ্চ, সরল ও দীর্ঘাকৃতি। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্করা পিরামিডাকৃতি। এই গাছের সবুজ সূচিসূক্ষ্ম ফলকের নির্বার আসলে পাতা নয় — রূপান্তরিত কাণ্ডকণিকার স্তবক। প্রতিটি কাণ্ডকণিকা ৬″ — ৮″ দীর্ঘ, বহু পর্বে বিভক্ত এবং পর্বসন্নিস্থ বাদামী বিবর্ণ রোমই পত্রের প্রতীক। পুষ্প একলিঙ্গিক, অত্যন্ত ক্ষুদ্র আর স্ত্রী ও পুং পুষ্প স্বতন্ত্র স্তবকে বিন্যস্ত স্ত্রী-মঞ্জরির অবস্থান শাখারন্ধ্রে, পুং-মঞ্জরি প্রান্তিক। দুই মঞ্জরির ব্যাস যথাক্রমে ১/২″ ও ১/৩০″। পক্বফল বহু ফলকণিকার সমাহার, প্রায় গোলাকৃতি, ধূসর, ৩/৪″ প্রশস্ত।

বিলাতী ঝাউ-গাছের সঙ্গে পাইনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের জন্য একে পাইন গোত্রের কোনো প্রজাতি বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। ফলক, ফল, স্বনন, এমনকি ঝরে পড়া কান্ডকণিকার স্তূপ সবই তো পাইনের মতোই। অথচ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ঝাউ কিংবা পাইনের সঙ্গে তার কোনো আত্মীয়তা নেই। শ্রেনীনির্ণয়তন্ত্রের জটিল নিয়মে এই সাদৃশ্য গুরুত্বহীন। পাইন, ঝাউ নগ্নবীজ উদ্ভিদ আর বিলাতী ঝাউ হলো আম কিংবা বকুলের মতোই আবৃতবীজ। এসব পার্থক্য এতই মৌলিক যে বিবর্তনের সিঁড়িতে পাইনের স্থান বিলাতী ঝাউয়ের অনেক নিচে।

গাছটি যে আমাদের দেশজ নয় নামেই তা স্পষ্ট। দূর অস্ট্রেলিয়ায় বাসিন্দা। তথাকথিত পাইন-বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই আসলে অস্ট্রেলীয় শুষ্কতায় অভিযোজনার ফল। তবু বিলাতী ঝাউ আমাদের বৃষ্টিবহুল দেশেও অভিযোজিত। সারা বাংলাদেশে, বিশেষত

শুষ্কতর অঞ্চল এবং বালুকাবহুল উপকূলে এদের সংখ্যা বহু। কিন্তু ঢাকায় এ গাছ প্রায় দুষ্প্রাপ্য। মিন্টো রোড এবং হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরীর কাছে যে দু'একটি বিলাতী ঝাউ রয়েছে তাদের অবস্থান যেমন পথিকের চোখে পড়ার মতো নয়, তেমনি তারা স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল, এলোমেলো। এ গাছের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, বিশেষত নিদ্রাকর্ষী স্বনন ঢাকাবাসীর অজানাই রয়ে গেল।

বিলাতী ঝাউয়ের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক গাছ পিরামিডাকৃতি, কিন্তু বয়স্কর এলোমেলো। কান্ড ধূসর, রুক্ষ ও অমসৃণ। এর সবুজ কিন্তু পাতার দান নয়, রূপান্তরিত কান্ডের বৈশিষ্ট্য। সূচ্যাকৃতি, সরু, দীর্ঘ, গ্রন্থিবদ্ধ কান্ডকণিকারাই এখানে পাতার বিকল্প। আসলে পাতাগুলি অদৃশ্যপ্রায় বাদামী বিবর্ণ রোমে রূপান্তরিত। অবশ্য এই পরিবর্তন শুষ্ক পরিপার্শ্বেরই প্রভাবজ এবং বংশগতিতে দৃঢ়বদ্ধ বলে আমাদের আর্দ্র আব-হাওয়ায়ও অন্যতর রূপান্তর অসম্ভব। ফুল অত্যন্ত ছোট এবং অনাকর্ষী। যদিও একই গাছে জন্মে, তবু স্ত্রী ও পুরুষ ফুল স্বতন্ত্র মঞ্জরিতে বিন্যস্ত। গ্রীষ্মের শুরু এবং হেমন্তের শেষ এই দু'বারই প্রস্ফুটনের কাল। পরাগায়ণের পরপরই পুংমঞ্জরিরা ঝরে পড়ে, আর স্ত্রীমঞ্জরি হয়ে ওঠে ফল। ফলগুলি আসলে বহু ছোট ছোট ফলকণিকার সমষ্টি, গোল ও ছাই-ধূসর। বীজ অত্যন্ত হালকা ও বাদামী। কাঠ কঠিন, ভংগুর এবং এজন্য জ্বালানী ব্যতীত অন্য কাজের উপযোগী নয়। বাকল ধূনাসম্পৃক্ত এবং ট্যানিংয়ে ব্যবহার্য। বালুভূমির প্রসাররোধে বিলাতী ঝাউয়ের বলয় খুব কার্যকর। পথপার্শ্ব, উদ্যান এবং গৃহের প্রাঙ্গণে রোপণের পক্ষে বিলাতী ঝাউ আদর্শ নির্বাচন। ঋজু বলিষ্ঠ ভঙ্গি, এলোমেলো শাখা-প্রশাখা, শাখান্তের গুচ্ছ-গুচ্ছ চিরহরিৎ ফলক-নির্ঝর এবং আশ্চর্য স্বননের বৈশিষ্ট্যে বিলাতী ঝাউ রূপসী তরুদের অগ্রগণ্য।

'ক্যাসুরিনা' নামটি অস্ট্রেলীয় পাখি ক্যাসুরিয়াসের পালকের সঙ্গে পাতার সাদৃশ্য থেকে উদ্ভূত। ইকুইসেটিফলিয়া অর্থ 'ঘোড়ার লেজের মতো পাতা।' লিটোরিয়া অর্থ সমুদ্রকূলীয়। ঢাকায় এখন বিলাতী ঝাউ অঢেল। কাকরাইল মসজিদের কাছে রমনা পার্কে, বাংলা

একাডেমীর বিপরীতে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে, এয়ারপোর্ট রোডে ঢাকা গেটের কাছে অনেকগুলি বিলাতী ঝাউ আছে।

Family : *Casuarinaceae*. Sc. name : *Casuarina litorea* L. Syn. : *Casuarina equisetifolia Foast. C. muricata* Roxb. Bengali : Belati jhau. Hindi : Jangli jhau. Jangli Saru, Vilayati saru. English : Australian Oak, Beef wood, She Oak Casuarina, Tinian Pine. Place : Hatkhola christian graveyard (1965).

*

কাঁঠাল

অ্যার্টোকার্পাস ইন্টিগ্রা

'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও
আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব ; দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে
ভোরের বাতাসে।'

জীবনানন্দ দাশ

চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্রবিন্যাস একান্তর। পত্র বিডিম্বাকৃতি, ৪″ – ৮″ দীর্ঘ, চার্ম ; বৃন্ত ½″ – ১″ দীর্ঘ। উপপত্র স্বল্পস্থায়ী, খড়–সাদা। পুংমঞ্জরি ফলাকৃতি, মাংসল, ২″ — ৬″ লম্বা। স্ত্রীমঞ্জরি বৃহৎ, পরিণত অবস্থায় কখনো ৩০″ × ১২″। ফল কান্ড ও শাখা লগ্ন, যৌগিক। বীজ ডিম্বাকৃতি কিংবা বৃক্কাকৃতি, মাংসল।

কাঁঠাল আমাদের অতি পরিচিত এবং প্রিয় গাছপালার অন্যতম। বাংলাদেশের ফলের মধ্যে তার স্থান বিশিষ্ট। এতো বিরাট ফলের ঐশ্বর্য আমাদের আর কোনো গাছের নেই। স্বাদ, গন্ধ, রস, রং এবং প্রতিটি অংশের ব্যবহারে কাঁঠাল তুলনাবিহীন। ফলের বাকল গরুর প্রিয় খাদ্য, শাঁস অত্যন্ত সুস্বাদু ও খাদ্যমূল্যে সমৃদ্ধ, বীজ উপাদেয় সব্জি এবং খাদ্যসম্পদে আলুর সমতুল্য। শ্রীহট্ট, যশোর, কুমিল্লা ও ঢাকায় কাঁঠাল অন্যতম অর্থকর ফসল। কাঁঠাল দরিদ্রজনের বন্ধু। জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ়ে চাল দুর্মূল্য হলে কাঁঠাল তাদের মূল আহার্য হয়ে ওঠে। কাঁঠাল খাদ্যসমৃদ্ধ কিন্তু সহজপাচ্য নয়।

শুধু ফল নয়, দারুমূল্যও আকর্ষণীয়। কাঠ গাঢ়–হলুদ, মসৃণ ও আসবাবপত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার্য। কাঠের হলুদ রঙ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কষায়বস্ত্রের রঞ্জক।

কাঁঠাল দীর্ঘজীবী, সুশ্রী আদর্শ ছায়াতরু। গোলাকৃতি, কৌণিক কিংবা এলোমেলো সব ধরনের কাঁঠাল গাছই দেখা যায়। পুরনো কাঁঠাল গাছ মহীরুহের মতোই বিশাল ও বিস্তৃত। কান্ড অমসৃণ, ধূসর এবং সদ্যমোচিত বাকলের স্থান গাঢ়–রক্তিম। পাতা একান্তর বিন্যস্ত, বিডিম্বাকৃতি, কালচে সবুজ এবং ছায়াঘন। ঝরে পড়া কাঁঠাল পাতা গাঢ় কমলা। বৃক্ষশরীর শ্বেতকষপূর্ণ। কাঁঠালের মুকুল দুটি খড়–সাদা স্বল্পায়ু নৌকাকৃতি উপপত্রে বন্দী থাকে এবং পত্রোন্মোচনের পর ঝরে পড়ে।

কাঁঠালের মুচিই তার মঞ্জরি। ফুল একলিঙ্গিক এবং পুং ও স্ত্রী মঞ্জরি স্বতন্ত্র। পুংমঞ্জরি ছোট, স্বল্পায়ু। স্ত্রীমঞ্জরি স্থায়ী এবং পরিণত অবস্থায় বিরাট। এরা প্রধানত কন্ডে, শাখায় এবং দৈবাৎ মূলেও ঝুলে থাকে। পরাগায়ন শেষে যথারীতি পুংমঞ্জরি শুকিয়ে যায় কিংবা ঝরে পড়ে, স্ত্রীমঞ্জরির তখন বাড়-বাড়ন্ত দেখা দেয়। স্ত্রীমঞ্জরি তখন একটি বিরাট ফলে রূপান্তরিত হয়। কাঁঠালের প্রতিটি দানাই তার এক একটি ফুলের প্রতীক।

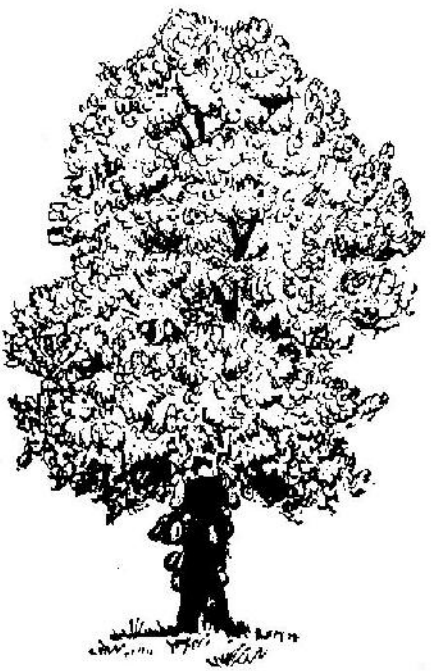

কাঁঠালের ফল যৌগিক, এটি একটি গোটা মঞ্জরির পরিণতি, একক ফুলের অবদান নয়। বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদভেদে এরা নানা জাতের। সাধারণত ফলের বাকল সবুজ, হালকা হলুদ কিংবা ঈষৎ তামটে রঙের আর ভেতর হলুদ, সোনালী কিংবা পাংশু-সাদা। বীজ মাংসল ও খড়-সাদা কিংবা বাদামী।

শীত কাঁঠালের প্রস্ফুটনের কাল ফল পাকে গ্রীষ্মে। আদি স্থান ভারতবর্ষের পশ্চিমঘাট অঞ্চল। কাঁঠালের বৈজ্ঞানিক নামের প্রথমাংশ অ্যার্টো-কার্পাস গ্রীক শব্দ, অর্থ আতাজাতীয় এক প্রকার ফল। হিটারোফিলাস লাতিন শব্দ, অর্থ হলো বিবিধ-পত্রী, অনেক সময়ই কাঁঠালের কাঁচা পাতা খণ্ডিত এবং এজন্য নামের সার্থকতা প্রশ্নসাপেক্ষ। ঢাকা কাঁঠালবহুল বিধায় সর্বত্রই দেখা যায়।

Family : *Moraceae*. Sc. name : *Artocarpus heterophyllus* Lamk (Thunb.) Merr. Syn : *A.integra A. integrifolia* L. f. Bengali : Kathal. Hindi : Chakki, Panasa. Kanthal. English : Jack tree.

বট

ফাইক্যাস বেঙ্গালেন্সিস্

'একদিন জলসিঁড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
বিশীর্ণ বটের নীচে শুয়ে রব ; পশমের মত লাল ফল
ঝরিবে বিজন ঘাসে।'

জীবনানন্দ দাশ

চিরহরিৎ ঝুড়িবহুল মহীরুহ। শাখা থেকে ঝুলন্ত ঝুড়ির সংখ্যা ও আয়তন বহু ও বিচিত্র ; কোনটি দড়ির মতো নমনীয়, কোনটি স্তম্ভের মতো বিশাল ও দৃঢ়। গাছের সারা দেহ শ্বেতক্ষয়পৃক্ত। বটের কুঁড়ি রোমশ দুটি হলুদ উপপত্রে বেষ্টিত। পত্রবিন্যাস একান্তর। পত্র ডিম্বাকৃতি, মসৃণ, ৪″ — ৮″ × ২″ — ৫″, চর্ম। পত্রবৃন্ত $\frac{১}{২}$″ — ২″ দীর্ঘ, মাংসল। ফল অবৃন্তক, যুগ্ম, কাক্ষিক, গোল, $\frac{১}{২}$″ — $\frac{৩}{৪}$″ প্রশস্ত এবং পক্ব ফল রক্তবর্ণ

চৈত্রের খরাদীর্ণ আকাশের নিচে উত্তাপ আর ক্লান্তিতে অবসন্ন কোনো দূরের পথিকের কাছে নদীকূলে, পথের ধারে কিংবা গাঁয়ের নির্জন বাজরে একটি ছায়ানিবিড় বটের সান্নিধ্য এক পরম লোভনীয় আশ্রয়। তখন মনে হয় এই তৃণহীন তরুতলে ছড়ানো শিকড়ের পরিচ্ছন্নতায় প্রকৃতির প্রসন্ন আঁচল যেন এজন্যই বিছানো রয়েছে। এক সময় শীতল ছায়া আর পাতার মৃদু ব্যজনে পথিকের ক্লান্তি দূর হয় এবং মহীরুহের বিশালতা তার চোখে পড়ে : বৃদ্ধ অজগরের এলায়িত অলস দেহের মতো দীর্ঘ প্রসারিত বিশাল শিকড়ের উদ্ভূক্তি, স্তম্ভের মতো বিশাল মসৃণ ঝুড়িদের ভিড়, যা থেকে অনেক সময় মূল গাছটিকেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

যে-প্রশ্নটি অতঃপর মনে আসে সেটি হলো ঝুড়ি-জটা-জঞ্জাল বোঝাই এই বিশাল মহীরুহের বয়স। বট দীর্ঘজীবী বিধায় সঠিক বয়ঃসীমা নির্ণয় কঠিন শোনা যায় কয়েকশ বছরের পুরানো বটগাছও নাকি বেঁচে আছে, বাড়ছে। ধীরে ধীরে আরো বহু চিন্তা এই মহীরুহকে আশ্রয় করে পথিকের মনে পাখা মেলে। মনে হয়, এই তরুর বিশাল দেহ, অজস্র ঝুড়ির অরণ্যে জমাট অন্ধকার, পত্রঘন শীর্ষদেশ সবই যেন কেমন রহস্যভরা। এমন কোনো অরণ্যতরুর সুরক্ষিত আশ্রয়েই হয়তো আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা একদিন বাসা

বেঁধেছিলেন, বেঁচেছিলেন রোদ বৃষ্টি আর শীতের আক্রমণ থেকে। এ-সময় দিনের আলো নিভে এলে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক আর শালিকেরা ফিরে আসবে মাথার অন্ধকারে বাঁধা তাদের নির্বিঘ্ন নীড়ে, কলকণ্ঠে মুখরিত হবে সন্ধ্যার আকাশ তারপর এক সময় রাত্রির গভীরতায় নিঃশব্দ হবে তারা, নিঃশব্দ হবে তরুর পত্রমর্মর আর দূরাগত কোলাহল বটের অস্বাভাবিক দীর্ঘ শাখা, ঝুড়ির অরণ্য এবং আনত শীর্ষের বিশাল নৈশ অবয়ব নিশ্চিতই তখন পথিকের কাছে ভয়দ হয়ে উঠবে। বট সম্পর্কে এজন্যই আমাদের মনে বিস্ময়, ভীতি ও শ্রদ্ধার এক মিশ্র প্রতীতির উদ্ভব ঘটেছে।

বট সত্যিকার মহীরুহ। এমন বিরাট গাছের সংখ্যা এদেশে বিরল। কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত ছত্রাকৃতি শীর্ষ বিশাল, বাকল হালকা ধূসর, মসৃণ। ঝুড়ি বটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও ঝুড়িহীন বটও দুষ্প্রাপ্য নয়। শাখা থেকে উদ্গত সরু সরু অস্থানিক মূল মাটির স্পর্শে ক্রমেই বিরাট স্তম্ভে রূপান্তরিত হয়, প্রসারিত দীর্ঘ শাখাদের ভার বহন করে এমনি ঝুড়ির পর ঝুড়িতে ভর দিয়ে বটের শাখারা বহুদূর এগোয়। আত্মবিস্তারের এমন প্রকট আগ্রহ আমাদের দেশে অন্য তরুতে নেই। কলকাতার শিবপুর উদ্যানের বটগাছটির ঝুড়িসংখ্যা কয়েকশত এবং এগুলির অধিকৃত স্থানের আয়তন একাধিক একর।

বটের পাতা ডিম্বাকৃতি, একাগুর, মসৃণ এবং উজ্জ্বল-সবুজ। কচি পাতা তামাটে। স্থান কাল-পাত্রভেদে পাতার আয়তনের বিভিন্নতা একাধারে বটের বৈশিষ্ট্য তথা প্রজাতি সনাক্তকরণের পক্ষে জটিলতার কারণও।

বটের ঝুঁড়ি পাঁশুটে হলুদ এবং এর দুটি স্বল্পায়ু উপপত্র পাতা গজানোর পরই ঝরে পড়ে। বসন্ত-শরৎ বটের নতুন পাতার দিন। কচি পাতার উজ্জ্বল সবুজে আচ্ছন্ন বট বড়ই সুশ্রী।

ডুমুরের পুষ্পহীনতার কুখ্যাতি আমরা জানি। কিন্তু অপবাদটি তো সত্য নয়। কারণ আলোয় উন্মোচিত করার মতো ঐশ্বর্যই নেই বলে সে উদুম্বর মঞ্জরির গর্ভে ফুলগুলি লুকিয়ে রাখে। ফুলেরা খুবই ছোট এবং ফলের মতোই গোল, মাংসল পুষ্পাধারের ভেতরে লুকানো থাকে। বট সম্পর্কেও তথ্যটি প্রযোজ্য। ডুমুর ও বট অভিন্ন গোত্রের উদ্ভিদ। বটফুলও উদুম্বরের মঞ্জরিতে লুকানো থাকে এই ফুল একলিঙ্গিক এবং পরাগায়নের জন্য বিশেষ জাতের পতঙ্গের উপর নির্ভরশীল।

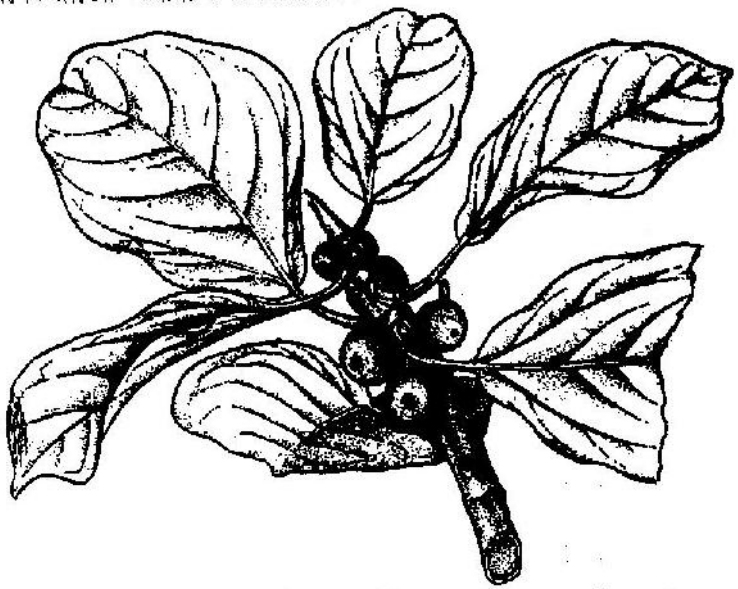

বটের ফল গাঢ় লাল ও গোল। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত হলো ফল পাকার দিন। এই ফল কাক, শালিক ও বাদুড়ের প্রিয়। এরাই বটের বীজ ছড়ায়। উপগাছা হিসেবেও বট সুঅভিযোজিত। এই বীজ দালানের কার্নিশ, মন্দিরের ফাটল কিংবা অন্য কোনো গাছের কোটরে সহজেই অংকুরিত হয় এবং আশ্রয়কে গ্রাস করে। এদের আক্রমণে দালানকোঠা, শ্মশানের স্মৃতিসৌধ ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত হয়। হিন্দুদের পক্ষে বটগাছ কাটা ধর্মানুমোদিত নয় বলে উত্তর-ভারতের বনাঞ্চলে বটগাছ কাটানো এক সমস্যা।

বটের উপকারিতা বিবিধ। দীর্ঘজীবী, দৃঢ়, চিরহরিৎ ছায়াতরু ব্যতীতও তার অন্যতর ব্যবহার রয়েছে। ক্ষয় থেকে নিকৃষ্ট ধরনের রাবার উৎপন্ন হয়, বাকলের আঁশ দড়ি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য। বটপাতা কুষ্ঠরোগে উপকারী। বটফল কোনো কোনো অঞ্চলে দরিদ্রজনের সব্জী। উত্তম জ্বালানী ছাড়াও কাঠ নিকৃষ্ট ধরনের আসবাব ও ঘরের কাজে ব্যবহার্য। বটের আদি জন্মস্থান ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তম-পশ্চিম অঞ্চল। ইংরেজি নাম 'ব্যানিয়ন' সম্ভবত 'বেনিয়া' শব্দ উদ্ভূত। বৈজ্ঞানিক নামের প্রথমাংশ 'ফাইকাস' লাতিনে ডুমুরের প্রতিশব্দ, 'বেংগল্যানসিস' অর্থ বংগজ

ঢাকায় বটে সংখ্যা বহু এবং এরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। নিউমার্কেটের পশ্চিমে দুসারি বটের শাখা-প্রশাখা জড়ানো সুড়ঙ্গকল্প এক আকর্ষী পথ রয়েছে।* তাছাড়া হাইকোর্ট এবং বেলী-মিন্টো রোড অঞ্চলেও বটগাছ আছে। বাংলা একাডেমীর প্রাংগণের বটগাছটিই সম্ভবত ঢাকার ঝুড়িযুক্ত বৃহৎ বটের মধ্যে বৃহত্তম।

বটের একটি অন্তরঙ্গ প্রজাতি ঢাকার অন্যতম প্রধান ছায়াতরু—সে পাকুড়। বৈজ্ঞানিক নাম 'ফাইক্যাস কোমজা'। নামের এই শেষাংশের অর্থ রোমশ। পাকুড় বিশালতায় বটের যোগ্য আত্মীয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নিকটস্থ শহীদ মিনার থেকে শুরু করে বঙ্গীবাজারের সিটি রোডের মুখ পর্যন্ত রাস্তার পাশে যে-গাছের সারিটি একদিকে হেলে পড়েছে সে-ই পাকুড়। শহরের সীমিত পরিসর এই বিশাল মহীরূহকে জায়গা দিতে পারেনি, তাই ডালপালা কেটে ফেলার জন্য এদের এই দুরবস্থা। এদের পাতা বটের চেয়ে অনেক ছোট, মাত্র ২″ - ৪″ লম্বা, প্রায় ডিম্বাকৃতি। ফলের রং বটের মতো লাল নয়, হলুদ এবং ফল দেখে সহজেই সনাক্ত করা যায়। দারুমূল্যে পাকুড় বটের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। পাতায় লাক্ষাকীট পোষা যায়। বটের মতো এরাও উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যতম প্রধান তরু।

কয়েক জাতের বটের (ফাইকাস) একটি পরিকল্পিত সারি আছে নটরডেম কলেজের পূব-পাশের দেয়াল ঘেঁষে মতিঝিলের দিকে।

Family : *Moraceae.* 1. Sc. name : *Ficus benghlensis* Linn. Syn. : *F. Indica* Roxb. Bengali : Bot, Bar, But. Hindi : Bar, Bangad, Ber, Bor. Eng. : Banyan. 2. Sc. name : *Ficus comosa Roxb.* Syn. : *F. Benjamina* L. var *comosa* Kurz. Beng. : Pakur. Eng : Java fig. Java willow. Willow Fig. Place : West of J. N. Hall (1965).

---

* এখন নেই, রাস্তা-উন্নয়নে কেটে ফেলা হয়েছে।

অশ্বত্থ
ফাইক্যাস রিলিজিওসা

'জানালার কাছে দাঁড়ালেই তাদের দেখতে পেতুম। আমার মনের সমস্ত ছবির সঙ্গে অজান্তে জড়িয়ে গেছে তারা। চৈত্র মাসে তাদের নিচে কত যে শুকনো পাতা ঝরে পড়তো, হাওয়ায় সেগুলো ঘুরে ঘুরে পাড়াময় যেতো ছড়িয়ে। বর্ষায় তাদের নতুন রূপ ; জটবাঁধা প্রচণ্ড ঝুনো শরীরে কচিপাতা ঠিক যেন মানাতো না। হাওয়ার দিনে অশান্ত অশ্রান্ত মর্মর ; রোদে, দুপুরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হতো প্রতিটি পাতা অসহ্য প্রাণশক্তিতে থরথর করে কাঁপছে ; সন্ধ্যার শেষ সোনালী আলো গাছ দুটোর মাথায় কতদিন আটকে যেতে দেখেছি !'

বুদ্ধদেব বসু

বিশাল মহীরুহ। পত্রবিন্যাস একান্তর। পত্র তাম্বুলাকৃতি, দৈর্ঘ্য ৩″ — ৭″, গাঢ়-সবুজ, প্রশীর্ষ লম্বা সরু লেজসদৃশ এবং ফলক দৈর্ঘ্যের $\frac{১}{৩}$, বৃন্ত ৩″ — ৪″।

পত্রপ্রান্ত ঈষৎ আন্দোলিত। ফল যুগ্ম, ঈষৎ চাপা, $\frac{১}{২}$″ চওড়া এবং ঘন-বেগুনী

ছেলেবেলার কথা আজও মনে পড়ে : বাবা একদিন অশ্বত্থের চারা লাগালেন পুকুর পাড়ে। আমাদের উপর আদেশ ছিল যত্ন করার। কারণ, গাছটি পবিত্র এবং দেবতার বাহন। বলা বাহুল্য এতে গাছের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এতটুকুও বাড়ে নি। কিন্তু আমাদের অযত্ন, উপেক্ষা সহ্য করেও সে একদিন আকাশে মাথা তুলে পাতার সশব্দ আন্দোলনে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করলো। আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম প্রবল প্রাণপ্রাচুর্যে এই শিশু-মহীরুহ প্রতিকূল পরিবেশকে অবহেলা করে কত অল্প সময়ে প্রতিষ্ঠালাভে সফল হয়েছে। আমরা যখনই ডালে চড়তে কিংবা পাতা ছিঁড়তে চেয়েছি আমাদের বারণ করা হয়েছে। একদিন যথানিয়মে পূজানুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হলো। অতঃপর গাঁয়ের বউ-ঝিরা জড়ো হয়েছেন তলায় আর ব্রত, পার্বণ, পালা উদযাপিত হয়েছে মাসের পর মাস এবং সিঁদুরের লালে ক্রমে ঢাকা পড়েছে ওই অশ্বত্থের শিকড়ের স্বাভাবিক হালকা ধূসর রং।

আমরা আর কোনোদিন এ গাছে চাপতে সাহস পাইনি। আমাদের মনেও দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে এটি সামান্য গাছ নয়, এতে দেবতা না হোন, উপদেবতা অবশ্যই অধিষ্ঠিত। অশ্বত্থ সম্পর্কে হিন্দুরা শ্রদ্ধাপ্রবণ। হিন্দুচিন্তায় এ বৃক্ষ বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীত এবং প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পবিত্র, এগুলির ন্যূনতম হানিও পাপ। প্রাচীন গাণিতিক

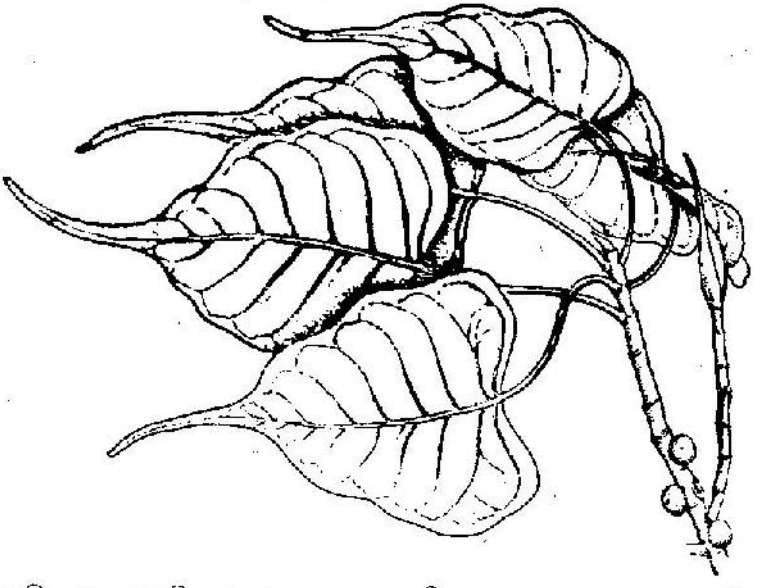

বরাহমিহিরের মতে, বাড়ির প্রাঙ্গণে এ বৃক্ষরোপণ গৃহীর পক্ষে কল্যাণকর ও সম্পদ বৃদ্ধির সহায়। সন্তানপ্রার্থী নারীরা বৃক্ষটি প্রদক্ষিণ করেন প্রাচীনকাল থেকে। বৌদ্ধদের কাছেও বৃক্ষটি অত্যন্ত প্রিয়। অশ্বত্থের মালয়ী নাম বোধি এ তরুতলেই একদিন বোধিসত্ত্বের মানবাত্মার মুক্তি অন্বেষণে ভগবান তথাগত ধ্যানের আসন পেতেছিলেন এইতো সেই পুণ্যশ্লোক বোধিদ্রুম।

বট ও অশ্বত্থ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত : একই গণের দুটি প্রজাতি। অশ্বত্থও বটের মতোই বিরাট। কান্ড নাতিদীর্ঘ, শাখা বিশাল, শীর্ষ ছত্রাকৃতি এবং বাকলের রঙ ধূসর, শরীর প্রায় মসৃণ আর কান্ডের সদ্যমোচিত বাকলের জায়গা রক্তিম। অশ্বত্থের ঝুড়ির সংখ্যা খুবই কম, শাখা মাটির সমান্তরালে প্রসারিত, পুরানো গাছ কোটর ও গুটিকাকীর্ণ।

অশ্বত্থের পাতা কিন্তু বটের চেয়ে একেবারেই আলাদা। শুধু একটি মাত্র লক্ষণেই এর সনাক্তি সম্ভব। এমন তাম্বুলাকৃতি ঘন-সবুজ পাতার লম্বা লেজ অন্য গাছে নেই। এর অপূর্ব স্বনন আসলে পাতার লেজের সঙ্গে ফলকের ঠোকাঠুকির ফল। হাওয়ার মৃদু আন্দোলনে অশ্বত্থের শিহরিত পাতার শব্দনির্ঝর বড়ই শ্রুতিমধুর। পাতার এ ধরনের দীর্ঘ শীর্ষ সঙ্কুচিত ফলক থেকে দ্রুত জল সরানোর একটি অভিযোজনা। শ্বাস-প্রশ্বাস অব্যাহত রাখার পক্ষে এটি খুবই অনুকূল। বসন্তের শেষেই পত্রমোচন। নতুন পাতা তামাটে এবং

এজন্য কচি পাতায় রক্তিম অশ্বত্থ অত্যন্ত সুশ্রী। অবশ্য এই স্বল্পায়ু লালিমা ক্রমে হালকা সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের প্রথমে আনত পত্রগুচ্ছের উজ্জ্বল সবুজে আচ্ছন্ন অশ্বত্থের বিশাল শাখারা দৃষ্টিনন্দন। বর্ষার শেষ ফল পাকার সময়। অশ্বত্থের কচি ফল সবুজ, পাকা ফল গাঢ়–বেগুনী।

দীর্ঘায়ুর ঐশ্বর্যে অশ্বত্থ অতুলন। কথিত, ২৮৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহলে রোপিত অশ্বত্থটি আজও জীবন্ত ও বর্ধমান কাঠ মূল্যহীন হলেও প্রতিটি অংশই ভেষজ গুণসম্পন্ন, সাধারণভাবে অরেচক ফল অঞ্চলবিশেষে দরিদ্রের সব্জী।

অশ্বত্থ বাংলাদেশ–ভারত ও ব্রহ্মদেশের অন্যতম আপন তরু। ঢাকায় অশ্বত্থের সংখ্যা বহু। সেগুন বাগিচার লাগোয়া পার্ক এভিনিউর অশ্বত্থবীথি বিশাল ও আকর্ষণীয়। তাছাড়া জিমখানা ক্লাবের অশ্বত্থ গাছগুলিও উচ্চতা, বিশালতায় বিশিষ্ট

'ফ্যাইক্যাস' ডুমুরের লাতিন প্রতিশব্দ। 'রিলিজিওসা' অর্থ ধর্মজড়িত, পবিত্র। অশ্বত্থের ওপর আরোপিত ধর্মীয় গুরুত্বের জন্যই এ নামকরণ।

রমনার যে বটমূলে পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয় সেটি অশ্বত্থ।

Family : Moraceae. Sc. name : *Ficus religiosa* Linn. Bengali : Ashvattha. Asud.Hindi : Pipal, pipli. English : Peepul tree. Place : near government Art Institute (1965).

বেল

ইগ্‌ল্ মার্মেলস্

'চামেলীর দিন হয়ে গেল কবে শিরীষ চাঁপার দিন
আম কাঁঠালের জামের বেলের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে
এপাশে মহুয়া ওপাশে পলাশ আগুনের সম্ভারে!'

বিষ্ণু দে

মধ্যম, পত্রমোচী বৃক্ষ এবং দৃঢ়, দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ কন্টকে আকীর্ণ পত্র যৌগিক, ত্রিপত্রিক, সবৃন্তক পত্রবিন্যাস একান্তর। পত্রিকা সংখ্যা ৩, ১ $\frac{১}{২}''$ — ২ $\frac{১}{২}''$ দীর্ঘ, বর্শাফলাকৃতি, শীর্ষ কৌণিক, দীর্ঘ। মঞ্জরি অনিয়ত, শাখায়িত স্বল্পপৌষ্পিক। পুষ্প ক্ষুদ্র, সবুজাভ, তীব্র সুগন্ধি। পাপড়ি মুক্ত। পরাগ কেশর অসংখ্য. ফল প্রায় গোলাকৃতি ৬'' — ৮'' প্রশস্ত, হালকা-হলুদ, মসৃণ, খোসা কঠিন, শাঁস হলুদ, মিষ্টি। বীজ অসংখ্য, আঠালো।

আমরা এক সময় রাজধানীর যে-প্রান্তে থাকতাম সেখানে পুষ্পচর্চার মতো কোনো সুকুমার বৃত্তি লালনের অনুকূল পরিপার্শ্বে ছিল না। আমাদের বাড়ির পেছনে বহুদিনের পুরনো কটি গাছের একফালি জঙ্গল সম্পর্কে আমরা কখনই কোনো কৌতূহল বোধ করিনি। আলো-হাওয়া এবং পরিচ্ছন্নতার পক্ষে তাদের এই অবস্থান যে স্বাস্থ্যকর নয়, শুধু মাঝে মাঝে এ-কথাটাই মনে পড়তো। কিন্তু এই ঔদাসীন্য আর শেষ পর্যন্ত টিকে রইল না। চৈত্রের এক ভোরে হঠাৎ সারা বাড়ি আশ্চর্য সুগন্ধে ভরে গেল। আমাদের তো অবাক হবার পালা। প্রস্ফুটনের কোনো প্রসাদ অন্তত কাছের গাছপালা থেকে আমরা প্রত্যাশা করিনি। খোঁজাখুঁজির পর সেই অবহেলিত জঙ্গলের আভিজাত্যবর্জিত তরুকুলেই উৎসটি আবিষ্কৃত হলো। সে এক বেলগাছ। অত্যন্ত অনাদরে দেয়ালের এক কোণে বেড়ে উঠেছে সবার অলক্ষ্যে এবং এতদিন ওখানে আত্মগোপন করেই থেকেছে. তাই বসন্তের ভোরে অনাদৃত এ তরুটির এমন বিনীত অথচ মধুরিম আত্মঘোষণায় আমরা বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। বেলের সৌন্দর্যের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। অথচ বেলকে তো চিনি ছোটবেলা থেকেই। পূজোর জন্যে কতবার এই পাতা এনেছি, ফল পেড়েছি। কিন্তু পূজা ও প্রয়োজনের বাইরে অনির্বচনীয়ের ব্যঞ্জনামধুর তার স্বতন্ত্র সত্তাটি আগে কোনোদিন উপলব্ধি করিনি।

বেল বাংলাদেশে সর্বজন পরিচিত। হিন্দুদের কাছে এ বৃক্ষ পবিত্র। এতে বহু দেবতার অধিষ্ঠান এবং পাতা পূজার অপরিহার্য উপচার। কিন্তু শুধু আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনেই নয়, বাস্তবের তাগিদেও বেল মূল্যধর বটে। ফল সুস্বাদু ও সুগন্ধি। বেলের শরবত পুষ্টিকর এবং কোষ্ঠকাঠিন্যে উপকারী। দেশীয় ভেষজ তরুর মধ্যে বেল সর্বাগ্রগণ্য। শাঁস রেচক, টনিক এবং আমাশার উপশম। কাঁচাবেল-পোড়া সর্বরোগহর। বেলপাতার পুলটিশ, শিকড়ের রস এবং বাকল ও পাতার রস যথাক্রমে চক্ষুরোগ, হৃৎরোগ এবং জ্বরে উপকারী।

বেলগাছ মধ্যমাকৃতি। বাকল প্রায় মসৃণ, হালকা-ধূসর এবং মাথা এলোমেলো ছড়ানো। ত্রিপত্রিক পাতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সারাদেহে বিক্ষিপ্ত দৃঢ়, তীক্ষ্ণ কণ্টকসজ্জা আত্মরক্ষারই অভিযোজন। বেল হলো লেবুগোত্রীয় এবং তদনুযায়ী গ্রন্থিকীর্ণতা পাতা, ফুল ও ফলের বৈশিষ্ট্য। বেলপাতার উগ্র গন্ধ অজস্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিনিসৃত উদ্বায়ী তেলের জন্যই। সে পত্রমোচী।

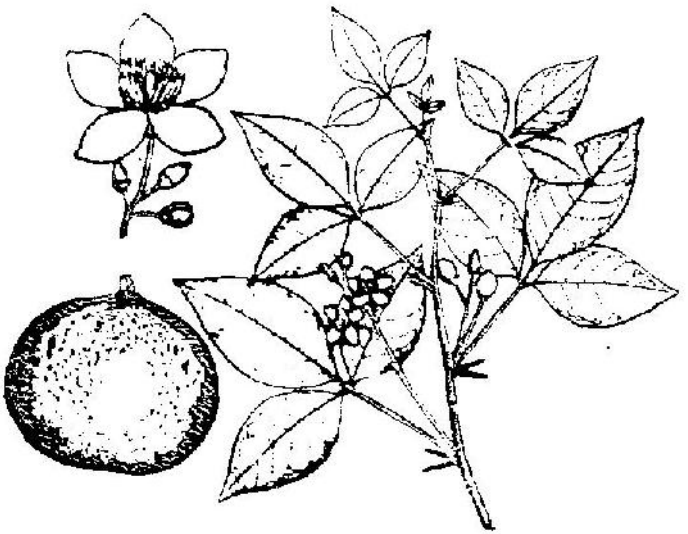

শীত পাতা ঝরা এবং বসন্তের শেষ পাতা গজানোর সময়। বেলের কচি পাতা প্রথমে তামাটে এবং পরিণত অবস্থায় গাঢ়-সবুজ। পাতা গজানোর পরই এদের ফুল ফোটার সময়। অবশ্য গ্রীষ্মের শেষ অবধিও কোনো কোনো গাছে ফুলের রেশ লেগে থাকে। পাতার সবুজে প্রচ্ছন্ন অনুজ্জ্বল ফুলেরা তীব্র সুগন্ধেই আত্মঘোষণা করে। এই মধুগন্ধ স্বল্পস্থায়ী এবং প্রস্ফুটন প্লাবনের মতই আকস্মিক। তাই বৎসরব্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ ছাড়া বেলের এই পরিচয় জানা কঠিন।

বেলের ফল সাধারণত গোল হলেও আকৃতি আয়তন সর্বত্র সমান নয়। কচি ফলের রং হালকা ধূসর, পাকা ফল হলুদ-সবুজ, খোসা কাষ্ঠকঠিন এবং সাধারণ পশুপাখির পক্ষে

দুর্ভেদ্য। কথায় বলে, বেল পাকলে কাকের কি ! শাঁস কমলা-হলুদ সুমিষ্ট, সুগন্ধি, নরম ও আঁশযুক্ত।

শীতের শুরুই বেলের মৌসুম। এই ফল অত্যন্ত সস্তা এবং ব্যাপক ব্যবহৃত। বেলের খোসা থেকে ছোটোখটো সৌখিন জিনিস তৈরি সম্ভব। বেলকাঠ দৃঢ়, স্থায়ী এবং ঘর ও গরুর গাড়ির সাজসরঞ্জামে ব্যবহার্য।

কতবেল বেলের নিকটাত্মীয় হলেও পৃথক গণভুক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম 'ফেরনিয়া লিমোনিয়া', পাতা ত্রিপত্রিক নয়, এক পক্ষল ও বিজোড়পক্ষ, ৫-৭ পত্রিক বিশিষ্ট। এই

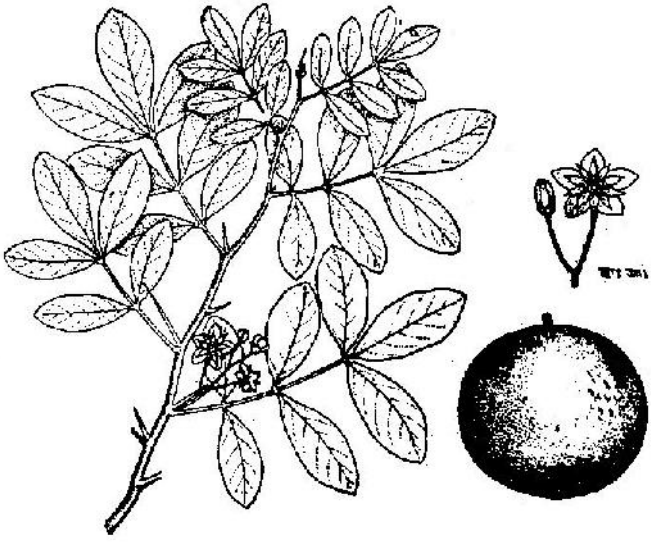

ফল বেলের চেয়ে ছোট এবং প্রায় ১" চওড়া। শাঁস টক এবং উপকারিতায় প্রায় বেলেরই সমধর্মী। ঢাকায় বেল ও কতবেল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তেজগাঁ অঞ্চলে দুটি বেলই সহজলভ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ, ঢাকা হল, মতিঝিল আবাসিক কলোনীসহ নানা জায়গায় বেলগাছ চোখে পড়ে।

ভারতবর্ষের শুষ্ক অঞ্চল বেলের আদিভূমি। 'ইগল' গ্রীকদের অন্যতম জলপরীর নাম। মারমেলস বেলের পর্তুগীজ নাম।

Family : *Rutaceae*. 1. Sc. name : *Aegle marmelos* Correa. Syn : *Crataeva marmelos* Linn. Bengali, Urdu, Hindi : Bel. English : Wood apple. Stone apple. 2. Sc. name : *Feronia limonia* (L) Swingle. Bengali : Katbel. Hindi-Urdu : Kaetha. English : Elephant apple.

কামিনী

মুরায়্যা প্যানিকুলাটা

'কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ আগারে
মালতী কেতকী জাতি
বান্ধুলি কামিনী পাঁতি
টগর মল্লিকা নানা নিশিগন্ধা শোভারে
সুধার লহরীমালা বঙ্গগৃহ মাঝারে।'

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরসবুজ ক্ষুদ্র বৃক্ষ। পত্র একপক্ষল, বিজোড়পক্ষ। পত্রিকা ৫—৭, একান্তর, বিভিন্নাকৃতি, মসৃণ, উজ্জ্বল সবুজ, ½″ — ৩″ অবধি দীর্ঘ। ফুল মঞ্জরিবদ্ধ, ক্ষুদ্র, সাদা, সুগন্ধি, ১″ দীর্ঘ। ফল ½″ দীর্ঘ, কৌণিক, দ্বিবীজীয় লাল, বৃতিযুক্ত।

কামিনী ক্ষুদ্র বৃক্ষ। আমরা অবশ্য এর ঝোপ ঝাড় দেখেই অভ্যস্ত। কলম করে, কেটেছেঁটে এদের দিয়ে নানা আকৃতি তৈরি আমাদের উদ্যানসজ্জার একটি রীতি। শুধু গাছের জন্য কামিনী রোপণ তেমন জনপ্রিয় নয়। অথচ পৌষ্পিক ঐশ্বর্যে সে তো ঈর্ষণীয়।

কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, সাদাটে ধূসর প্রায় মসৃণ এবং ছত্রাকৃতি শীর্ষ অজস্র শাখা-প্রশাখার ঠাসবুনুনি ও চিরহরিৎ পত্রের প্রাচুর্যে ছায়াঘন। এ গাছ লেবুগোত্রীয়, তাই গোষ্ঠীবৈশিষ্ট্যে পাতা, ফুলের অংশবিন্যাস এবং ফল গ্রন্থিকীর্ণ, লেবুগন্ধী একপক্ষল বিজোড়পক্ষ পাতাগুলি একান্তর এবং পত্রাক্ষের পত্রিকাবিন্যাসও তদ্রূপ।

কামিনীর প্রস্ফুটন বর্ণে, গন্ধে, প্রাচুর্যে তরুরাজ্যের সম্পদ। বছরে বারকয়েকই সে পুষ্পিত হয়। সে মূলত বর্ষারই ফুল। অনেকের ধারণা, প্রস্ফুটনের সঙ্গে আশু বর্ষণের সম্পর্ক আছে। পুষ্পিত কামিনীর সবুজ তো ফুলের শুভ্রতায় প্রায় ঢাকা পড়ে যায়, আনত হয় শাখান্ত মঞ্জরির ভারে, নির্মল সুগন্ধে বাতাস ভরে উঠে মৌমাছিদের বিভ্রান্ত করে। যখন 'শ্রাবণবরিষণ পার হয়ে ... গোপন কেতকীর পরিমলে, সিক্ত বকুলের বনতলে, দূরের আঁখিজল বয়ে বয়ে কী বাণী আসে' তখন কামিনীকেও বার বার মনে পড়ে। এমন ঐশ্বর্যের

অধিকারী গাছের সমাদর প্রশ্নাতীত। তাই কামিনী আমাদের প্রিয় তরু। আমাদের অঙ্গনে, উদ্যানে, সৌন্দর্যচিন্তায় তার অবাধ অগ্রাধিকার।

ফল গোল, রক্তিম এবং পাখির প্রিয় খাদ্য। বুলবুলিরা কামিনীগাছে ভিড় জমায় এবং বীজ ছড়ানোর কাজে সহায়তা করে। কাঠ অত্যন্ত দৃঢ় এবং যন্ত্রপাতির হাতলে ব্যবহার্য। ডাল দাঁতন হিসেবেও ব্যবহৃত। কামিনীর কাঁচা কাঠ-পোড়ানো আঠা দিয়ে দাঁত রঙ করার রীতি আসামে প্রচলিত। পাতার রস আমাশয়ে উপকারী। আদি নিবাস বাংলা-ভারতের উষ্ণ অঞ্চল, মালয়, চিন ও অস্ট্রেলিয়া।

মুরায়্যা নাম গটেনগেনের অধ্যাপক জে.এ. ম্যুরের (১৭৪০—৯১) স্মারক। প্যানিকুলাটা লাতিন শব্দ, অর্থ গুচ্ছপুষ্প 'এক্সটিকা' অর্থ বৈদেশী। বীজ ও কলমে চারা জন্মে এবং বৃদ্ধি দ্রুত। ঢাকায় কামিনীর একটি নিকট আত্মীয় রয়েছে, সে মুরায়্যা কয়েনগি। ওর ভেষজগুণ সমধিক। পাতা আকর্ষণীয় গন্ধের জন্য ডাল ও অন্যান্য তরকারীতে কাঁচা কিংবা শুকনো অবস্থায় ব্যবহার্য। ঢাকায় যত্রতত্র ওরা ছড়িয়ে আছে।

Family : *Rutaceae*. 1. Sc. name : *Murraya paniculata* (Linn.) Jack. Syn. : *M. exotica* Linn., *Chaleas paniculata* Linn. Beng. : Kamini. Hindi-Urdu : Marchula, Juti, Atal, Bibsar. Eng. : Chinese box. 2. Sc. name : *M. Koenigii* spreng. Syn : *Bergera koenigii* Linn. Eng. : Curryleaf tree.

নীম

অ্যাজাডাক্‌টা ইন্ডিকা

'একদিন নীমফুলের গন্ধ অন্ধকারে ঘরে
নিয়ে এলো অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ।'

রবীন্দ্রনাথ

দীর্ঘ চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র একপক্ষল, বিজোড়পক্ষ, ৮″ — ১৫″ দীর্ঘ, প্রশাখান্তে একান্তরে ঘনবদ্ধ, পত্রাক্ষের উপর ১৩—১৯টি কাস্তের মতো বাঁকানো ফলক বিপ্রতীপ কিংবা একান্তরে বিন্যস্ত। পত্রিকা প্রান্ত ক্রকচ। পুষ্পমঞ্জরি কাক্ষিক, দীর্ঘ, বহুপৌষ্পিক, ঝুলন্ত। পুষ্প ক্ষুদ্র $\frac{১}{৫}$″ দীর্ঘ, সাদা, সুগন্ধি। বৃতি ও দল ৫। পুংকেশর ১০, গুচ্ছবদ্ধ। ফল ক্ষুদ্র, ডিম্বাকৃতি, $\frac{১}{২}$″ — $\frac{৩}{৪}$″ দীর্ঘ, একবীজীয়, পক্কাবস্থায় ম্লান হলুদ।

নীম বাংলা-ভারতের অতি পরিচিত প্রয়োজনীয় বৃক্ষ। বসন্ত রোগের প্রতিষেধক এবং বায়ুশুদ্ধির সুনামে নীম সর্বদৃত ভেষজ হিসেবে ইদানীং বহুলব্যবহৃত নীম প্রাচীন ভারতের ভিষকরাই প্রথম আবিষ্কার করেন। সাবান ও টুথপেস্টে নীম-নির্যাসের ব্যবহার জীবাণুনাশী। নীমবীজের তেলও (মার্গোসা ওয়েল) জীবাণুনাশক এবং বাত, চর্মরোগ ও কুষ্ঠরোগে উপকারী। ফল রেচক। নীমের আঠা টনিক এবং উত্তেজক। বাকল, শিকড় ও ফল পালাজ্বরের ঔষধ। পাতার আরক পতঙ্গনাশক এবং বই ও কাপড় সংরক্ষণে ব্যবহার্য। বসন্তকালে কান্ড থেকে সংগৃহীত রস পেটের পীড়ায় উপকারী। নীম-পাতার ভাজা, সিদ্ধ জল এবং মণ্ড বিবিধ চর্মরোগের প্রতিষেধক। নীমের ডাল বহুলব্যবহৃত দাঁতন। কাঠ স্থায়ী এবং তিতা বিধায় উই ও অন্যান্য পোকার আক্রমণরোধী। নীমের এত গুণ সত্ত্বেও ঢাকায় তার কোনো সুবিন্যস্ত বীথি নেই। অবশ্য শহরের সর্বত্রই এই গাছ ছড়িয়ে আছে এবং সহজেই চোখে পড়ে।

নীম মধ্যমাকৃতি সুদর্শন বৃক্ষ। চিরহরিৎ যৌগিক পত্রের নিবিড় সজ্জাই তার সৌন্দর্য। কান্ড দীর্ঘ, সরল, বাকল ধূসর, অমসৃণ এবং আগা এলোমেলো। নীমপাতা বিজোড়পক্ষ হলেও প্রায়ই শীর্ষফলক না থাকায় একে জোড়পক্ষ মনে হয়। পত্রিকাগুলি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে কাস্তের মতো বাঁকানো এবং করাতের ধারের মতো এগুলির কিনার দাঁতাল। পত্রিকার এই বিশিষ্ট ভঙ্গিটি নীমগোত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সারা বছরই নীমের পাতা গজায়। বসন্তে অধিকাংশ

পাতাই ঝরে পড়ে এবং পরপরই কচি পাতার উজ্জ্বল সবুজে আচ্ছন্ন নীম অপরূপ হয়ে ওঠে। পত্রোদ্গমের পরই নীমগাছে প্রস্ফুটনের প্লাবন আসে। ফুল খুব ছোট হলেও প্রলম্বিত অজস্র মঞ্জরিতে উচ্ছ্বসিত একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত নীমতরুর সৌন্দর্য মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। মৃদু-মধুর গন্ধই সেরা বৈশিষ্ট্য। ফুলের শুভ্র বিকীর্ণ পাপড়ি, গুচ্ছবদ্ধ হলুদ পরাগচক্র এবং ডিম্বাকৃতি ফলের প্রাচুর্যে সে দৃষ্টিনন্দন।

নীমফল পাখির প্রিয় খাদ্য। বর্ষার শুরুতে নীমের ফল পাকলে গাছে শালিকের ভীড় জমে। নীম হিন্দুদের পবিত্র বৃক্ষ। দেবতার মূর্তি তৈরির জন্য নীমকাঠের ব্যবহার ব্যাপক। সন্ন্যাসীরা কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য নীমের পাতা ও ফল খেয়ে থাকেন।

নীম ব্রহ্মদেশের প্রাকৃত তরু। অবশ্য বাংলা-ভারতের সর্বত্র আজ নীম সহজলভ্য। নীমের বৈজ্ঞানিক নামের প্রথমাংশ 'অ্যাজাডার্কটা' পারসি নাম থেকে গৃহীত। ইন্ডিকা অর্থ ভারতীয়।

ঘোড়ানীম নীমেরই নিকটাত্মীয়। বৈজ্ঞানিক নাম 'মেলিয়া সেমপারভিরেন্স'। নীম অপেক্ষাও সে সুদৃশ্যতর : পত্র দ্বিপক্ষল এবং ফুল ঈষৎ নীলাভ। ঘোড়ানীম নীমের মতো বহুগুণান্বিত

নয় এবং দারুমূল্যও স্বল্প। বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হলেও ঘোড়ানীম দীর্ঘজীবী নয়। ঢাকায় ময়মনসিং রোড, বক্সীবাজার রোড এবং পার্ক এভিনিউতে দৈবাৎ দু-একটি ঘোড়ানীম চোখে পড়ে। একটি করে বড় গাছ আছে পুরানা পল্টনে জেসন ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানির চত্বরে ও জিয়া-উদ্যানের পশ্চিম প্রান্তে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন করতোয়ার দেয়াল ঘেঁষে।

Family : *Meliaceae*. 1. Sc. name : *Azadirachta indica* A. Juss. Syn. : *Melia azadirachta* Linn. Hindi, Urdu, Bengali : Nim. English : Margosa tree, Indian lilac. 2. Sc. name : *Melia sempervirens* (L.) All. Syn. : *Melia azaderach* L. Bengali : Ghora nim, Mahanim. Hindi, Urdu : Bakayana. English : Persian lilac, Bead tree.

মেহগিনি

স্যুইটেনিয়া মাহাগিনি

'অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল
মেহগিনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক।'

জীবনানন্দ দাশ

বিবাট, পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র যৌগিক, একপক্ষল, জোড়পক্ষ, মসৃণ, গাঢ়-সবুজ। পত্রিকা সংখ্যা ৪—১০, পত্রক্ষে বিপ্রতীপভাবে বিন্যস্ত, নীম-পাতার মতো ঈষৎ বক্র, $১\frac{১}{২}'' \times \frac{১}{২}''$। পত্রিকাবৃন্ত $\frac{১}{৪}''$। মঞ্জরি অনিয়ত। পুষ্প অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সবুজাভ, অনাকর্ষী, $\frac{১}{৪}''$ প্রশস্ত। পাপড়ি ৫, প্রসারিত। ফল ৫-কোষী, রুক্ষ, দৃঢ়, ৩'' চওড়া, বাদামী। বীজ ক্ষুদ্র, পক্ষল।

মেহগিনি তরুরাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নাম। আকৃতি ও বিশালতায় এ-দেশে সে শুধু রেইনট্রির সংগেই তুলনীয়। শাখা-প্রশাখার ঠাস বুনানীতে শীর্ষদেশ নিবিড় এবং ছায়াঘন। বসন্তে নিষ্পত্র মেহগিনির উন্মুক্ত উদোম শাখাপুঞ্জের নিবিড় কাঠামোকে প্রাগৈতিহাসিক কোনো দানবের মতো অদ্ভুত দেখায়। এই গভীর-কালো বলিষ্ঠ শাখা-প্রশাখায় বসন্তশেষে পাতার ম্লান-সবুজের উন্মেষকে কেমন বেমানান ঠেকে। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই প্রবল সবুজের প্লাবনে আচ্ছন্ন মেহগিনির যৌবন দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। বিশালতার সর্বগুণে গুণান্বিত এই মহীরুহ দৃঢ়, দীর্ঘজীবী ও দারুমূল্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মেহগিনির কাণ্ড সরল, উন্নত, গাঢ়-ধূসর, কালোর কাছাকাছি, বাকল অমসৃণ। পাতা যৌগিক, একপক্ষল, জোড়পক্ষ এবং পত্রিকা ঈষৎ বাঁকানো। অল্পবয়স্ক মেহগিনির পাতা পরিণত গাছের পাতার চেয়ে বড়। প্রসঙ্গত মেহগিনির আরও একটি প্রজাতির (স্যুইটেনিয়া ম্যাক্রফিলা) কথা উল্লেখ্য। এদের সার্বিক সামঞ্জস্যের মধ্যে শুধু পাতার আয়তনই এক সহজদৃষ্ট ব্যতিক্রম। অবশ্য মূল মেহগিনি অপেক্ষা এর ফলও অনেক বড় এবং পাতার দৈর্ঘ্য প্রায় দুই ফিট।

পত্রোদ্গমের পরই প্রস্ফুটনের কাল। ফুলের দৈন্যে মেহগিনি বড়ই নিষ্প্রভ। অনিয়ত, ক্ষুদ্র মঞ্জরির ততোধিক ক্ষুদ্র ফুলেরা বর্ণে ম্লান-সবুজ, অনুজ্জ্বল, অনাকর্ষী এবং পাতার প্রাচুর্যে

প্রচ্ছন্ন। ফল প্রায় গোলাকৃতি, পাঁচ কোটর-বিভক্ত, শক্ত, বহুবীজীয় ও বাদামী। বীজ পক্ষল। সহজেই চারা জন্মে এবং বৃদ্ধিও দ্রুত। দারুমূল্যে মেহগিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তরু। ঘরের কাজ, দরজা-জানালা, আসবাবপত্র, নৌকা-জাহাজে সর্বত্র ব্যবহার্য এই কাঠ দৃঢ়তা, দীর্ঘস্থায়িত্ব, গাঢ়-বর্ণ এবং মসৃণতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মেহগিনির আদিস্থান জ্যামাইকা ও মধ্য-আমেরিকা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকেই প্রথমে বীজ কলিকাতার রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে পৌঁছয়। আমাদের

দেশে মেহগিনি চাষের তখনই সূচনা। ঢাকায় নিউমার্কেট থেকে ইডেন কলেজ পর্যন্ত আজিমপুর রোড এবং ফজলুল হক হলের পাশের কলেজ রোড মেহগিনি বীথিতে ছায়ানিবিড়। এ-ছাড়াও রমনার টেলিফোন হাউস এবং পার্ক এভিনিউতে এদের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। ঢাকায় বড়-মেহগিনির (ম্যাক্রফিলা) পরিণত গাছ বেশি নেই। পার্করোডে এদের অধুনা রোপিত কটি বর্ধমান চারা যথেষ্ট বড় হয়নি। এই শেষোক্ত মেহগিনিটি

দারুমূল্যে মূল মেহগিনি থেকে নিকৃষ্ট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এদের ছাল কুইনিনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মেহগিনি আদর্শ পথতরু বিধায় ব্যাপক চাষের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ প্রয়োজন। বর্তমানে বড় মেহগিনিই সর্বত্র রোপিত হচ্ছে। সারা শহরে বলতে গেলে, তারই একচ্ছত্র রাজত্ব।

Family : *Meliaceae*. 1. Sc. name : *Swietenia mahagoni* Linn. Bengali : Mahagini. English : Mahagini, Spanish Mahogany. Place : College Road. Azimpore Road. 2. Sc. name : S. *macrophylla* King. Bengali : Bara Mahagini. English : Bastard Mahoginy.

কুসুম

শ্লিচেরা ওলিওজা

'নব কুসুম্ভ পুষ্পবরণ সিন্দুরসম রাঙা
আগুন প্রবল পবনে দ্বিগুণ জ্বলে
ব্যাকুল অনল অটবীলতারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে
ধরনীতে ঘিরি দাহ করে পলে পলে।'

কালিদাস (ঋতুসংহারম)

বিরাট পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র যৌগিক, একপক্ষল, জোড়পক্ষ, ৮″ — ১৬″ অবধি দীর্ঘ। পত্রিকা অবৃন্তক, ডিম্বাকৃতি, বিন্যাস বিপ্রতীপ। শীর্ষপত্রিক বৃহত্তম, ৬″ — ৯″ দীর্ঘ। বৃন্তলগ্ন পত্রিকা ক্ষুদ্রতর, ১″ — ৩″ দীর্ঘ। পুষ্প এক-লিঙ্গিক। কুসুম দ্বিবাসী। মঞ্জরি শাখান্বিত, ২″ — ৬″ অবধি দীর্ঘ। পুষ্প ক্ষুদ্র, অনুজ্জ্বল, অনাকর্ষী, সবুজ-হলুদ কেশর-সংখ্যা ৬—৮। ফল ডিম্বাকৃতি, ১″ দীর্ঘ, বীজ $\frac{৩}{৫}$″ দীর্ঘ, চ্যাপ্টা, বাদামী।

দূর থেকে দেখা কোনো গাছের উজ্জ্বল বর্ণোচ্ছ্বাসকে আমরা প্রস্ফুটনের ঐশ্বর্যই মনে করি। গাছের অন্য কোনো অংশের রঙের ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে আমরা অনবহিত পাতার সবুজের মধ্যে আভার যত বৈবম্যই থাকুক ঝরে পড়ার আগ পর্যন্ত সাধারণত পাতার বর্ণে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আমরা আশা করি না। কচি পাতার হালকা তামাটে রঙ থেকে ঝরা পাতার হলুদে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু কচি পাতার প্রকট রক্তিম বর্ণচ্ছটায় আচ্ছন্ন গাছ আমাদের দেশ বিরল। অথচ এই শহরেই এমন দুর্লভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি তরুবীথি রয়েছে।

বসন্তে কোনোদিনে হেয়ার রোডে রাষ্ট্রপতি ভবনের লাগোয়া পার্কের বুক চিরে যাওয়া ছোট্ট পিচঢালা পথে আপনি ঢাকা ক্লাবের দিকে এগোলে এই পথটির শুরুতে যে দুসারি মহীরুহ পাতার ঘনরক্তিম ঔজ্জ্বল্যে আপনাকে বিস্মিত করবে, এরাই কুসুম। ঢাকার অন্যত্র, বিশেষত বক্সীবাজার অঞ্চলে কুসুম আছে। কিন্তু সৌন্দর্যের মূল উৎস, পাতার বর্ণ-বৈভব ক্ষণস্থায়ী বিধায় এরা সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমি নিজেও শুধু এক বছর আগে (১৯৬৪) কুসুমের এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্যটি প্রথম লক্ষ্য করি। শরীরে লাল রং এত দ্রুত

সবুজে রূপান্তরিত হয় যে, একটি পরিপূর্ণ রক্তিম কুসুমতরুর সাক্ষাৎ দৈবাৎই ঘটে। প্রায় সারা বর্ষাকাল ধরেই রক্তিম কচি পাতারা ঘনসবুজ শরীরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে। কিন্তু এগুলি তো আসলে সেই বসন্তী বর্ণচ্ছটার প্রতীক মাত্র। দীর্ঘ, বিশালদেহী কুসুম মহীরুহদেরই আত্মীয়। বাকল ধূসর, মসৃণ, স্থূল, মাংসল; যৌগিক চওড়া পাতার বিন্যাস বিপ্রতীপ এবং পত্রিকা অসম। শীত পাত ঝসানোর কাল। পত্রঘন সবুজে নিবিড় কুসুম অবশ্যই আদর্শ ছায়াতরু। বসন্ত প্রস্ফুটনের কাল। ফুল উভলিঙ্গিক ও পুংলিঙ্গিক এবং এজন্য সাধারণত কুসুম দ্বিবাসী, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী গাছ স্বতন্ত্র।

মঞ্জরি খাটো, ফুল ছোট, ম্লান-হলুদ অনাকর্ষী এবং রক্তিম পাতার ঔজ্জ্বল্যে প্রচ্ছন্ন। ফল ডিম্বাকৃতি, কৌণিক, শক্ত, সাধারণত মসৃণ, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে কণ্টকিত। অবশ্য এই শেষতম বৈশিষ্ট্যটি ফলের স্বাভাবিক চারিত্র্য নয়, এক ধরনের পোকার কাজ।

কুসুমের কাঠ মূল্যবান। দৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী বিধায় এই কাঠ তেল ও চিনি কলের রোলার, গরুর গাড়ির চাকা, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য। বীজতৈল জ্বালানী ও রান্নার উপকরণ। কুসুম গাছে লাক্ষা চাষ হয়। হিমালয়ের নিম্নাঞ্চল, মধ্য-ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল আদি-অবাস।

সুইজারল্যাণ্ডের তরুবিদ জে. সি. স্লিচারের নাম-নুসারেই কুসুমের বৈজ্ঞানিক নামের প্রথমাংশ 'স্লিচেরা'। 'ওলিওসা' লাতিন শব্দ, অর্থ তৈলসমৃদ্ধ। বলা বাহুল্য বীজতৈলের জন্যই এ নাম। কুসুমের সংস্কৃত নাম কুসুম্ব

কুসুম নামে একটি ওষধিও আছে, হলুদ ফুল, বীজতেলের জন্য চাষ।

Family : *Sapindaceae*. Sc. name : *Schleichera oleosa* (Lour.) Merrr. Syn. : *S. trijuga* willd. Bengali : Kusum. Hindi : Gausam etc. English : Lac tree, Honey tree etc. Place : North of Ramna green, near President's House (1965).

লিচু

লিচ্চি চাইনেন্সিস্

'লিচুর পাতার পরে বহুদিন সাঁঝে
যেই পথে আসা যাওয়া করিয়াছি একদিন নক্ষত্রের তলে
কয়েকটা নাটাফল তুলে নিয়ে আনারসী শাড়ির আঁচলে
ফিঙের মতন তুমি লঘুচোখে চলে যাও জীবনের কাজে।'

জীবনানন্দ দাশ

মধ্যম, চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র যৌগিক, একপক্ষল, জোড়পক্ষ, ৬″ দীর্ঘ। পত্রিকা-সংখ্যা ৪ ১২। পত্রিকা লম্বাকৃতি, সূক্ষ্মশীর্ষ, গাঢ়-সবুজ, পৃষ্ঠ ম্লান-সবুজ। মঞ্জরি অনিয়ত, শাখান্বিত, প্রান্তিক। পুষ্প অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অনাকর্ষী। বৃতি ৪—৫ বৃত্যংশে বিভক্ত। পাপড়ি শূন্য। পরাগকেশর ৬—১০। ফল ডিম্বাকৃতি, ১″ — ১½″ প্রশস্ত, দানাযুক্ত, সবুজ-লালচে, একবীজীয়। বীজ লম্বাকৃতি, ঘন-বাদামী, মসৃণ। ফলের শাঁস সাদা, নরম, রসাল এবং সুস্বাদু।

লিচু দক্ষিণ চিনের ফল হলেও আমাদের দেশে এখন সুঅভিযোজিত এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত। ফলের গুণে এবং আকৃতির সৌষ্ঠবে এ-গাছ অত্যন্ত জনপ্রিয়। লিচু মধ্য আকারের চিরহরিৎ, ছত্রাকৃতি বৃক্ষ; কান্ড নাতিদীর্ঘ, শাখান্বিত, অমসৃণ ও ধূসর-বর্ণ। পাতা যৌগিক এবং পত্রাক্ষের দুপাশে পরস্পরমুখী বিন্যস্ত পত্রিকাসমূহ ঘন সবুজ-মসৃণ ও বর্শাফলাকৃতি। গাছটি নিশ্ছিদ্র পত্রবিন্যাসে ছায়াঘন এবং অত্যন্ত সুশ্রী। বসন্ত লিচুর ফুল ফোটার দিন।

লিচুর মঞ্জরির প্রাচুর্য আমের সঙ্গে তুলনীয়। ফুল খুব ছোট, সবুজে-হলুদে মেশানো, অনুজ্জ্বল ও অনাকর্ষী। ফুলের পর ফলে ফলে সারা গাছ ভরে গেলে ফলভারানত লিচু গাছে যেন প্রস্ফুটনের ঐশ্বর্য ফেরে। লিচু পাকে আমের সঙ্গেই; শাঁস নরম, সাদা, রসালো ও সাধারণত মিষ্টি। আমাদের দেশে তাজা ফল হিসেবেই লিচুর ব্যবহার; কিন্তু চীন দেশ ও ইউরোপে শুকনো লিচুর ব্যবহারও প্রচলিত।

চীন দেশে এ-গাছ ভেষজ হিসেবেও ব্যবহৃত। শিকড়, বাকল ও ফুল সিদ্ধ জলে গলার ক্ষত সারে কচি লিচু শিশুদের বসন্তরোগে এবং বীজ অম্ল ও স্নায়বিক যন্ত্রণার ঔষধ হিসেবে উপকারী।

চীন দেশ থেকেই বাংলা-ভারতে লিচুর আমদানী। বীজ থেকে চারা জন্মান গেলেও কলমেই লিচুচাষ প্রশস্ত।

লিচু ঢাকায় সর্বত্রই চোখে পড়ে। কার্জন হল প্রাঙ্গণে উদ্ভিদবিভাগের পশ্চিম দিকে এক সারি সুন্দর লিচুর গাছ ছিল (১৯৬৫), এখন নেই। রমনা গেট, শাহবাগ অঞ্চল ও তেজগাঁয়ে লিচুর সংখ্যা বহু।

লিচ্ছি চৈনিক নাম। চাইনেন্সিস্ অর্থ চীনদেশীয়।

Family : *Sapindaceae*. Sc. name : *Litchi chinensis* Sonner. Syn. : *Nephelium litchi* Comb. *Scytalia lichi* Roxb. Bengali : Lichu. English : Litchi. Place : Gurzan Hall campus (1965).

আম

মেনজিফেরা ইন্ডিকা

'বউল ঝরে ফলেছে আজ থোলা থোলা আম
রসের পীড়ায় টসটসে বুক ঝুরছে গোলাব জাম।'

নজরুল

চিরহরিৎ বৃক্ষ পত্র ৫″ — ৮″ দীর্ঘ, লম্বাকৃতি, ১″ — ২″ প্রশস্ত, ঘনসবুজ, সবৃন্তক, স্ফীতবৃন্ত, একান্তর। বৃন্ত $\frac{৩}{৪}$″ — ১ $\frac{১}{২}$″ দীর্ঘ মঞ্জরি অনিয়ত, শাখায়িত, বহুপৌষ্পিক। পুষ্প অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এক লিঙ্গিক কিংবা ক্লীব। ফল মাংসল, একবীজীয় এবং ২″ — ৬″, ওজন এক ছটাক থেকে দেড়-সের

বাঙালির কাছে আমের বর্ণনা অনাবশ্যক। আমের সাথে আমাদের আশৈশব অন্তরঙ্গতা। ছেলেবেলায় গরমের ছুটির জন্য আমাদের যে আনন্দঘন প্রতীক্ষা ছিল, তা শুধু শিক্ষকদের রক্তচক্ষুর শাসন থেকে অব্যাহতির জন্যই নয়, আম কুড়ানোর রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যও। সেই যে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আমতলায় নিরবচ্ছিন্ন প্রহরা, বিনিদ্র রাত্রির উদ্বেগ এবং ভোরের আনন্দ, সারাজীবনে কি আর কোনোদিন তার তুলনা মিলবে? কবি এজন্যই আমের বোলের মধুগন্ধে অনুভব করেন : 'সুদূর জন্মের যেন ভুলে যাওয়া প্রিয় কণ্ঠস্বর।'

শীতের শেষপাদে প্রথম আমের মঞ্জরিতে সারা গাছ ভরে কিশোরমনে যে প্রতীক্ষার জন্ম হয়, জ্যৈষ্ঠের আম কুড়ানোর ধুমে স্বপ্নের আচ্ছন্নতায় তা ক্রমেই বেড়ে ওঠে এবং বর্ষার প্রথম আগমনীতে প্রায় অকস্মাৎ একদিন তার অবসান ঘটে। সেদিনের নিঃস্ব আমগাছের বিষণ্ণতা ডালে বিক্ষিপ্ত শূন্য বোঁটাগুলি ছাড়িয়ে শিশুদের মুখেও ছায়া ফেলে। অভ্যাসবশেই তারা নিঃশব্দ আমতলায় তখনো ঘুরে বেড়ায়। দমকা হাওয়ায় আমের গাছে কাঁপন লাগলে তারা বার বার উপরে তাকিয়ে কী যেন খুঁজে ফেরে। তারপর না-পাওয়ার ব্যথায় উন্মনা হয়ে এক সময় বাড়ি ফিরে আসে আম তাদের মনে একটা গভীর স্থায়ী দাগ ফেলে রাখে।

আমের আদি আবাস বাংলা-ভারত। নামের শেষাংশে 'ইন্ডিকা' তারই স্মারক। অবশ্য এখন আম এদেশে সীমাবদ্ধ নেই, সারা উষ্ণমণ্ডলেই ছড়িয়ে আছে। হিন্দুদের কাছে এ গাছ পবিত্র : পাতা পূজা, আবাহন ও অভ্যর্থনার উপাদান। বৌদ্ধরাও এ গাছের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ভগবান তথাগত প্রায়ই আমতলায় ধ্যানে বসতেন বিখ্যাত সাঁচীস্তূপ তাই আমের পাতা ও ফলে চিত্রিত।

আমগাছের আকার মাঝারি থেকেও বড় এবং অনেক সময় মহীরুহকল্প। কান্ড সরল, উন্নত এবং শাখায়িত, বাকল ধূসর, অমসৃণ এবং শীর্ষ ছত্রাকৃতি ও অজস্র ঘনবদ্ধ পাতায় নিশ্ছিদ্রপ্রায়। আমপাতার বোঁটা খাটো, ফলক বর্শার মতো, এবং বিন্যাস একান্তর। আমের কচিপাতা কোমল, তামাটে এবং পরে ম্লান-সবুজ থেকে ঘন-সবুজে রং বদল করে। এ-গাছ চিরহরিৎ, দীর্ঘজীবী। প্রায় হাজার বছরের পুরানো আমগাছের বেঁচে থাকার নজিরও দুষ্প্রাপ্য নয়। মাঘমাস প্রস্ফুটনের কাল। অজস্র শাখায়িত মঞ্জরিতে আমগাছের মাথা প্রায় ঢেকে যায়। ফুল অত্যন্ত ছোট এবং একলিঙ্গিক, দ্বিলিঙ্গিক কিংবা ক্লীব, মৃদু-সুগন্ধি, ম্লান-হলুদ

আমের ফলের আয়তন আকৃতি বহু ও বিবিধ এবং 'প্রকার'-সংখ্যা সম্ভবত এক হাজারেরও বেশি। ছোট, বড়, মাঝারি, গোল, লম্বা, সরু, পাঁচের আকৃতিবিশিষ্ট, সবুজ, ঈষৎ হলুদ, গাঢ়-হলুদ, সিঁদুরে, টক, মিষ্টি, অতিমিষ্টি, আঁশযুক্ত, আঁশহীন, মধুগন্ধী, তীব্রগন্ধী এমনি অজস্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত ফলের জন্যই নামের এত রকমফের।

যদিও ফলজলী, লেংড়া আমদের সর্বাধিক পরিচিত ও সুস্বাদু আম, কিন্তু অনেকের ধারণা বোম্বের 'আলফেনসো'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাছাড়াও গোলাপ খাস, সেফেদা, হিমসাগর, জাফরান, বেগুনফুলি, রানীপসন্দ, ইমাম পসন্দ, আমিন আবদুল হায়াত খান, আমিন

মহম্মদ ইউনুস খান, মুর্শিদাবাদ, বোম্বাই, বাংগালোরা, সুবর্ণরেখা, গোপালভোগ, মিশ্রীভোগ এমনি কত যে আম আছে তার তালিকা খুবই দীর্ঘ।

আমের ব্যবহার এ-দেশে বহুকালের। অত্যন্ত প্রাচীন ধর্মপুস্তকে আমের উল্লেখেই এই সাক্ষ্য মেলে। মোগল আমলেই সম্ভবত আমের চাষ প্রদেশে ব্যাপকতা লাভ করে। সম্রাট আকবর আমের প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিলেন। দারভাঙ্গায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ আমের বাগান 'লাখবাগ' নামে খ্যাত ছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে আমগাছ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

কাঁচা আম টক, তাই আচার ও সব্জী হিসাবেই মূলত ব্যবহার্য। বন্য আম উপজাতিদের প্রিয় খাদ্য। আমকাঠ উচ্চমানের নয়, তবু দরজা-জানালায় অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্যাকিং ও প্লাইউডের পক্ষে এই কাঠ উপযোগী। আমের পাতা ও বাকল থেকে রঞ্জক নিষ্কাশন সম্ভব। বাকল ট্যানিংয়ে ব্যবহার্য। কাঁচা আম চক্ষুরোগ নাশক। পাকা আম রেচক, টনিক এবং লিভারদোষে উপকারী। আমপাতার ধূমপান হিক্কা ও গলার ঘার ঔষধ এবং অন্যান্য অংশ রক্তক্ষরণ, সর্পদংশন ও বিছর কামড়ে ব্যবহার্য।

আমগাছ বছরে একবার ফলবতী হলেও বারমেসে আমও আছে। বছরে দু থেকে তিনবার এদের ফলন হয়।

আমের আঁটিতে চারা জন্মানোর রেওয়াজ থাকলেও জোড়কলমই আমচাষের জন্য নির্ভরযোগ্য। ম্যানজিফেরা লাতিন শব্দ, অর্থ আমবাহী। ঢাকায় আম সহজদৃষ্ট এবং যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত।

শ্রীহট্টের অরণ্য অঞ্চলে বন্য-আম চোখে পড়ে : বৈজ্ঞানিক নাম 'ম্যানজিফেরা সিলভাটিকা'। আমাদের আমের এটিই পূর্বপুরুষ।

Family : *Anacardiaceae*. Sc. name : *Mangifera Indica* Linn. Bengali : Am. Hindi : Am. Amb. Urdu : Amba. English : Mango.

আকরকণ্ট

অ্যালেঞ্জিয়াম স্যাল্‌ভিফলিয়াম

'তুমি আমার আঙ্গিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল।'

অজ্ঞাত বাউল

ক্ষুদ্র,পর্ণমোচী বৃক্ষ। পত্র লম্ব-ডিম্বাকৃতি, রোমশ, একান্তর, হ্রস্ববৃন্তক। পত্রবৃন্ত $\frac{১}{৪}''$ দীর্ঘ। মঞ্জরি স্বল্পপৌষ্পিক। পুষ্প ক্ষুদ্রাকৃতি, $১\frac{১}{২}''$ প্রশস্ত, শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধি। পুষ্পবৃন্ত ও বৃতি রোমশ। দল মুক্ত, পাপড়ি সংখ্যা ৬ কিংবা ততোধিক, প্রায় ১'' দীর্ঘ, রৈখিক, পাপড়িতল রোমশ। পরাগকেশর ২০—৩০, বিকীর্ণ, মুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতি, মসৃণ, $\frac{২}{৩}''$, কালো, স্বল্প শাঁসযুক্ত, একবীজীয়।

আকরকণ্ট বাংলাদেশের প্রাকৃত তরু না হলেও ভারতের বহু অঞ্চলের মতো এখানেও তার সংখ্যা বহু এবং বৃদ্ধি ও বিস্তার স্বচ্ছন্দ। এ-ছাড়া আফ্রিকা, মালয় ও চিন দেশে এই গাছ দুষ্প্রাপ্য নয়। ঢাকায় রমনা টেলিগ্রাফ অফিসের আশেপাশে এই গাছের ভীড় চোখে পড়ে। শীতের শেষে নিষ্পত্র আকরকণ্টের গাছে পুষ্পপ্লাবন সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শুভ্র প্রস্ফুটনের এমন একটি সুষমা আছে যা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। প্রস্ফুটন স্বল্পস্থায়ী হলেও ক্ষণিকের এই চমকটুকু আমাদের স্মৃতিতে সারা বছরই উজ্জ্বল থাকে। ধূসিধূসর শহরের পথে চলার সময় যখনই এ-গাছ দেখি, মনে পড়ে আসন্ন পুষ্পবিভোর একটি বসন্ত-দিনের কথা যখন রেলওয়ে সাইডিংয়ের হতশ্রী অঞ্চলটি হঠাৎ বর্ণে, গন্ধে অপরূপ হয়ে উঠবে। এতো কেবল তরুর যাদুমন্ত্রেই সম্ভব।

অধিকাংশ আকরকণ্টের গাছই ছোটখাট এবং এলোমেলো শাখা-প্রশাখায় ঝোপ-ঝাড়েরই সমতুল্য, তবু দুএকটি মাঝারি ধরনের গাছ ঢাকায় দেখা যায়। কান্ড ম্লান-ধূসর, বাকল আঁশযুক্ত, স্থূল এবং শাখা-প্রশাখা পত্রাচ্ছন্ন। পাতা ঘন-সবুজ, কখনো রোমশ এবং শাখানির্গত কাঁটাসদৃশ ছোটখাটো কান্ডকণ্টকই মূলত একান্তরভাবে বিন্যস্ত থাকে।

আকরকন্ট ছায়-নিবিড়, তাই পথতরুর অযোগ্য নয়। ফলের আকার পেয়ারার মতো, কিন্তু আকারে অনেক ছোট। মৃদু-মধুর নরম শাঁস সুস্বাদু, কিন্তু উগ্র গন্ধ অপ্রীতিকর

কাঠ দৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী, রেখাচিত্রিত, সুগন্ধি জ্বালানী হিসেবে অত্যন্ত উপযোগী। আয়তন সীমিত বিধায় এই কাঠে চাষের যন্ত্রপাতি, গরুর গাড়িএবং আরো টুকিটাকি তৈরি সম্ভব বাদ্যযন্ত্রের জন্যও এই কাঠ উপযোগী। সুগন্ধি শিকড় রেচক, কৃমিনাশক, চর্মরোগ

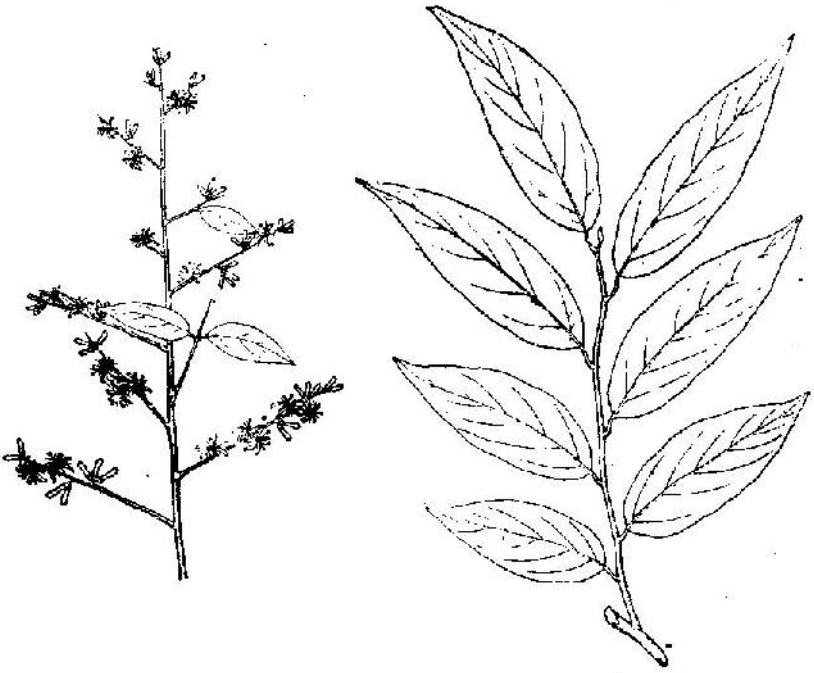

প্রতিষেধক ফলও রেচক, জ্বর ও রক্তদোষে ব্যবহার্য। পাতা বাতে ও বীজ ফোঁড়ায় উপকারী

'অ্যালেনজিয়াম' নামাংশ এ-গাছের মালাবারীয় নাম থেকে গৃহীত। 'লামার্কিয়াই' অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী লামার্কের স্মারক স্যালভিফলিয়া সম্ভবত থালার আকৃতিবিশিষ্ট পাতা।

Family : *Alangiaceae*. Sc. name : *Alangium salvifolium* (L.F.). Wangerin A. Lamarkii Thwait ; *A. hexapetalum* Roxb. Bengali : Ankura, Akarkanta, Bag-ankura. Hindi : Akol, Ghaut, kocli etc. Place : Railway siding, near Ramna post office (1965).

তমাল

ডায়স্পাইর‍্যাস্ মন্টানা ভে. কর্ডিফলিয়া

'না পোড়াইও রাধাঅঙ্গ না ভাসাইও জলে
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।
সেই ত তমালতরু কৃষ্ণবর্ণ হয়
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়।'

বিদ্যাপতি

ক্ষুদ্র বৃক্ষ, দৈবাৎ কন্টকিত, প্রায়শ মসৃণ। শাখা ও পত্রতল রোমশ। পত্র আয়ত-লম্বাকৃতি, প্রায় তাম্বুলাকার, ২ ১/২″ অবধি দীর্ঘ, হ্রস্ববৃন্তক। ফুল দ্বিবাসী, সাদা, চতুষ্টয়ী ; দল ঘণ্টাকৃতি, বিকীর্ণমুখ। পুংফুলের ব্যাস ১/৫″, ক্ষুদ্রাকৃতি নিয়ত মঞ্জরিতে বিন্যস্ত ; পরাগকেশর ৮ জোড়ায় ১৬টি। স্ত্রীফুল একক, আনত, হ্রস্ববৃন্তক, সাদা, ১/২″ প্রশস্ত, বন্ধ্যাপরাগ ৮, গর্ভকোষ মসৃণ ফল গোলাকৃতি, মসৃণ, ১″—১ ১/২″ প্রশস্ত, বৃতিযুক্ত এবং পক্কাবস্থায় হলুদ।

তমালের সঙ্গে অপরিচিত কাব্যপ্রিয় বাঙালী দুষ্প্রাপ্য। বৈষ্ণব কবিতা, লোকগীতি, এমনকি সংস্কৃত কাব্যেও তমাল মর্যাদাসীন। তাল-তমালের বনরাজি নীল এদেশের নিসর্গ আমাদের কাব্যের অনুষঙ্গ। অথচ বাংলাদেশে, বিশেষত পূর্ববাংলায় তমাল বস্তুতই দুষ্প্রাপ্য। দেবস্থান, মন্দির, আখড়া, এমনি বিশিষ্ট পরিবেশের বাইরে প্রকৃতির নিজস্ব অঙ্গনে কোথায়ও তমাল আমার চোখে পড়ে নি। সমগ্র ঢাকা শহরে অনেক সন্ধানের পর একটিমাত্র তমাল খুঁজে পেয়েছি গভর্নর হাউসের দক্ষিণ-গেটের নিকটস্থ জয়কালী মন্দির রোডের রাম-সীতার আশ্রমে। অথচ গাছটি যেমন সুন্দর, তেমনি আমাদের ঐতিহ্যলগ্ন। আধুনিকতার মোহে প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যে-বিচ্ছেদ ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে তাতে অতীতের বহু ঐশ্বর্যের সঙ্গে হয়ত একদিন লুপ্ত হবে প্রাচীন তরুকুলের স্মৃতিও।

দেহবৈচিত্র্যে তমালের বৈশিষ্ট্য স্বীকার্য বৈকি। খাটো, ঘনকালো গাঁটযুক্ত কান্ড, আঁকাবাঁকা ছড়ানো শাখা-প্রশাখা এবং ছত্রাকৃতি, চিরসবুজ পত্রঘন শীর্ষ অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। এদের স্ত্রী ও পুরুষ গাছ স্বতন্ত্র, ফলত ফুলেরা একলিঙ্গিক। পুং-ফুলেরা গুচ্ছবদ্ধ, অজস্র, কিন্তু আকারে খুবই ছোট। স্ত্রী-ফুল একক, আকারে বড়, কিন্তু সংখ্যায় স্বল্প। ফল গোল, হলুদ এবং গাবের মতোই বৃতিযুক্ত, দুর্গন্ধী। কাঠ লালচে-হলুদ, দৃঢ়। পাতা ও ফলের মণ্ড মাছের বিষরূপে ব্যবহৃত।

আদি আবাস বার্মা, মালয়, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের শুষ্ক-উষ্ণ অঞ্চল। বীজ থেকে সহজেই চারা জন্মে, কিন্তু বৃদ্ধি মন্থর। তমালের পরিচিতি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। প্রেইন, বেন্থল তমাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব, যেন এ-নামে কোনো গাছই বাংলাদেশে নেই। *Xanthoxymus pictorius, Garcinia xanthochymus, Diospyros tomentosa* ইত্যাদির বাংলা নাম কোথাও কোথাও তমাল বলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু আমরা যে-গাছকে এদেশে তমাল বলে চিনি উপরোক্তদের সঙ্গে তার কোনো

সাদৃশ্য নেই। অবশ্য *D. tomentosa* মূলত *D. cordifolia*-র কোনো উপনাম কিনা আমার ঠিক জানা নেই। আমার ধারণা *D. cordifolia* ই আমাদের তমাল। প্রসঙ্গত *D.montana*-র নামও উল্লেখ্য। একেও তমাল বলে চিহ্নিত করা সম্ভব। এই গাছের পাতা কর্ডিফলিয়ার পাতা থেকে ভিন্ন আকৃতি, মসৃণ এবং ফলও ছোট।

ডায়সপাইরাস গ্রীক শব্দ, অর্থ স্বর্গীয় গম : কর্ডিফলিয়া অর্থ তাম্বলাকৃতি পত্র। মন্টানা অর্থ পার্বত্য।

Family : *Ebenaceae*. Sc. name : *Diospyros cordifolia* Roxb. var. *Cordifolia* Praim. Beng : Tamal Bangab, Moishkanda. Hindi-Urdu : Bistendu, Dasaundu, Lohari, Tendu. Eng. : Mottled ebony. Place : Jaykali mandir Road, South gate, Govt. House (1965).

গাব

ডায়স্পাইর‍্যাস্ পেরিগ্রিনা

গজুই মেহ কি অম্বর সামর
ফুল্লই নীব কি বুল্লই ভামর

অবহট্টব কবিতা

চিরহরিৎ মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ। কুঁড়ি রেশমী পত্র দীর্ঘ, আয়তাকৃতি, স্থূলকোণী, চর্ম, মসৃণ, উজ্জ্বল-সবুজ, ৫″ — ৮″ × ২″ — ৩″। বৃন্ত $\frac{১}{৩}$″, দৃঢ়, স্থূল। বৃতি রোমশ, সবুজ পাপড়ি মসৃণ, পাণ্ডুবর্ণ। পুং-পুষ্প $\frac{১}{৩}$″ দীর্ঘ, পরাগ-কেশরসংখ্যা ৪০। স্ত্রী-পুষ্প বৃহত্তর, প্রায় ১″ দীর্ঘ এবং $\frac{১}{২}$″ প্রশস্ত, ১—৫ একত্রে মঞ্জরিবদ্ধ। পুষ্পবৃন্ত অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ক্লীব ও শূন্য পরাগদণ্ড সর্বাধিক ১২, রোমশ। গর্ভদণ্ড ৪। ফল গোলাকৃতি, ১ $\frac{১}{২}$″ — ২″ প্রশস্ত। পক্ব ফল হলুদ বাদামী গুঁড়োয় ঢাকা; শাঁস আঠালো।

রূপসী তরু হওয়া সত্ত্বেও গাবের সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের অনীহা সহজদৃষ্ট এবং এর উৎস হলো গাবের অঢেল প্রাচুর্য, বৈশিষ্ট্যহীন প্রস্ফুটন এবং আনুষঙ্গিক ভৌতিক কাহিনী। কালো-শরীর গাব যেন কালভৈরব। ঢাকায় গাবের প্রাচুর্য নেই স্পষ্টত অনাদৃত। ঝোপঝাড়-জঙ্গলে ছড়িয়ে থাকার জন্যই মূলত সে হতশ্রী। অথচ তাদের চিরহরিৎ নিগূঢ় পত্রসজ্জ, গোলাকৃতি সুদৃশ্য শীর্ষ এবং অজস্র পাকা ফলের হলুদ অত্যন্ত আকর্ষণীয় তথা সুবিন্যস্ত তরুবীথির পক্ষে লোভনীয় বটে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রূপসী তরুরা প্রায় সবাই পত্রমোচী। চৈত্রের খরতাপে শহরে প্রকটিত মরুভূমির শূন্যতায় স্নিগ্ধ শ্যামল যে কটি গাছ তখনো উত্তাপ ও দাহ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে, গাব তো সেই দুর্লভদেরই অন্যতম

গাবের কান্ড গোল, অনুচ্চ, সরল, প্রায় মসৃণ এবং বর্ণে ঘোর কালো। শাখায়নের বিশিষ্ট ভঙ্গির জন্য শীর্ষ গোলাকৃতি এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিচের শাখারা প্রায় ভূস্পর্শী। অজস্র কালো

রঙের শাখা-প্রশাখার নিবিড় বিন্যাস ও পাতার ঘন সজ্জায় এ-গাছ নিশ্ছিদ্র। এই বৈশিষ্ট্যই গাবের প্রধান আকর্ষণ।

গাবের পাতা লম্বা, বর্শাফলাকৃতি, চর্মদৃঢ়, কালচে-সবুজ। বোঁটা ছোট এবং বিন্যাস একান্তর। বসন্তের শেষ কটি পাতার রঙ। নতুন পাতার তামাটে রং দ্রুত ঘন-সবুজে রূপান্তরিত হলেও এই ক্ষণস্থায়ী ঔজ্জ্বল্য গাছকে আকর্ষণীয় করে তোলে। গরমের শুরু প্রস্ফুটনের কাল। ফুল একলিঙ্গিক, স্ত্রী ও পুরুষ গাছেরা স্বতন্ত্র, দ্বিবাসী। পুরুষ-ফুল স্ত্রী ফুলের চেয়ে ছোট, কিন্তু পুং মঞ্জরিতে ফুলের সংখ্যা বেশি। ফুলে পাপড়ি সংখ্যা চার, আংশিক যুক্ত, সবুজাটে এবং মৃদু সুগন্ধি। গাব ফল গোলা, মাংসল, হলুদ বর্ণ; শাঁস

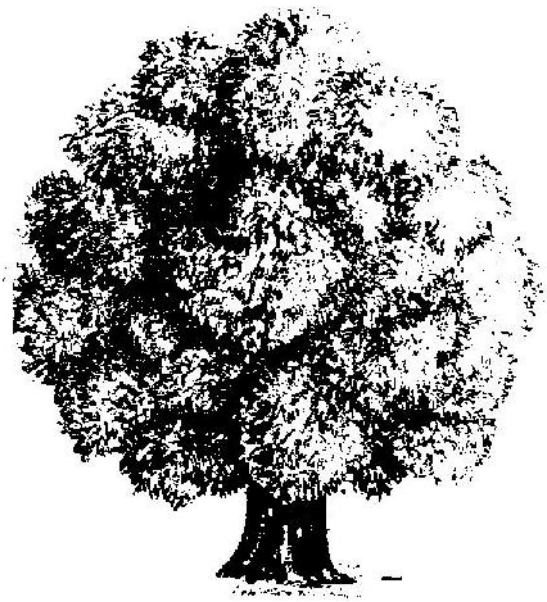

আঠালো, নরম এবং কাঁচা অবস্থায় টক। পাকা গাব কিন্তু অখাদ্য নয়। বর্ষার শেষ ফল পাকার সময়। গাছপ্রতি বার্ষিক ফলন চার হাজারেরও বেশি। কাক ও বানর ছাড়া পাকা গাব শিশু-কিশোরদেরও প্রিয়। নৌকা, জাল ও চামড়ার নানা কাজে শাঁস, আঁঠা ও ট্যানিন ব্যবহৃত। গাব কাঠ মূল্যহীন। গাব ফুলের রস ক্ষত ও আমাশয়ে, বাকল পৌনঃপৌনিক জ্বরে, ফল হিক্কা, বাত এবং বীজতৈল অতিসারে উপকারী।

মূল আবাস বাংলা-ভারত, মলয় ও অস্ট্রেলিয়া। ঢাকার ভিকারুন্নেসা গার্লস হাইস্কুলের কাছে, আজিমপুরে এবং নীলক্ষেতে গাব সহজলভ্য।

'ডায়সপাইরস' গ্রীক শব্দ, অর্থ স্বর্গীয় ফল। 'পেরিগ্রিনা' লাতিন শব্দ, অর্থ বিদেশী। এরূপ নামের অর্থোদ্ধার দুরূহ। গাবের একটি অন্তরঙ্গ প্রজাতি ঢাকায় আছে। সে বিলাতী গাব। বৈজ্ঞানিক নাম 'ডায়স্পাইরস্ ডিস্কলার'। ফল দেশী গাবের চেয়ে বড়, বর্ণে কমলা-বাদামী, রোমশ, সুদৃশ্য এবং দেশী গাব অপেক্ষা সুস্বাদু। বিলাতী গাব সুশ্রী তরু। এই গাছ পাকা ফলে ভরে উঠলে ঘনসবুজ পাতার পটভূমিতে হলুদ ফলের প্রাচুর্য তখন বর্ণাঢ্য প্রস্ফুটনকেও হার মানায়।

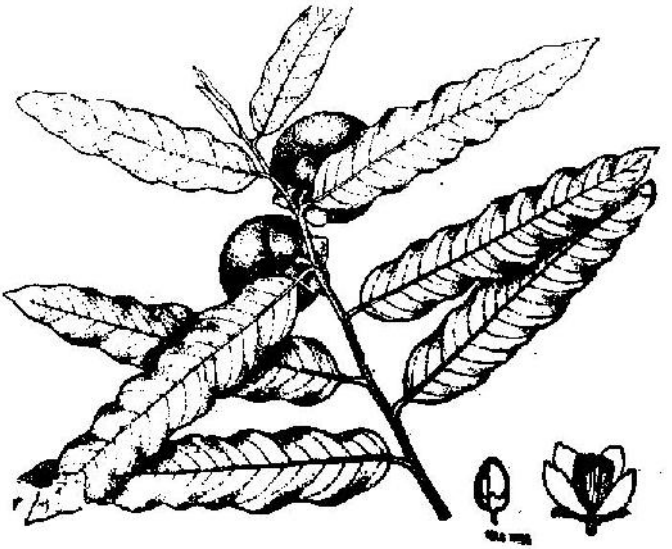

ঢাকায় কদাচিৎ এ-গাছ চোখে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-ভবনের পেছনে একটি চমৎকার পূর্ণবয়স্ক গাবগাছ আছে।

Family : *Ebenaceae*, Sc. Name : *Diospyros perigrina* Gurke, Syn : *D. embryopteris* pers ; *Embyopteris glutinifera* Roxb. Bengali : Gab, Bangab. Vudu : Tindu. English : River Ebony. Place : Nilkhet (1965).

মহুয়া

মধুকা ল্যাটিফোলিয়া

'রে মহুয়া নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
উচ্চশিরে তবু রাজকুলবনিতার
গৌরব রাখিস ঊর্ধ্বে ধরে।'

রবীন্দ্রনাথ

বিরাট পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র ডিম্ব-আয়তাকৃতি, ৫″— ৮″ দীর্ঘ, হ্রস্ব-বৃন্তক এবং শাখাতে একান্তরে বিন্যস্ত, প্রায় গুচ্ছবদ্ধ, গাঢ়-সবুজ, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, বর্ধিত। পত্রবৃন্ত ১″—১ ১/২″ দীর্ঘ। মঞ্জরি প্রশাখার উপান্তস্থ ও ঝুলন্ত। পুষ্পবৃন্ত প্রায় ২″ দীর্ঘ, তামাটে-সবুজ বৃতি ৪—৫ অংশে বিভক্ত, চর্ম, বহিরাংশ ঘন-রোমশ পাপড়ি-সংখ্যা ৮—৯, ননীশুভ্র, কোমল, রসাল, আশুপাতী এবং ১/৩″ দীর্ঘ ও ঋজু। পরাগকেশর সংখ্যা ২৪—২৬, পরাগকোষ হ্রস্বদণ্ডী ফল ডিম্বাকৃতি, মাংসল, রসাল, ১/২″—১″ লম্বা, ১—৪ বীজীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহুয়া কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন : "মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা।" কবির এ উক্তির কাব্যধর্মিতায় কিন্তু মহুয়ার বৈজ্ঞানিক পরিচয় প্রচ্ছন্ন নেই। আদিবাসীদের মাদলের উদ্দাম শব্দ-মুখরিত জ্যোৎস্না প্লাবিত বাসন্তী রাত্রির উন্মাদনার সঙ্গে মহুয়ার মধুগন্ধ ও সুরাসারের সংযোগ আমরা জানি। মহুয়াকে এমনি একটি প্রাণোচ্ছল অনুষঙ্গের সঙ্গেই আমরা এক করে দেখি। বসন্ত প্রস্ফুটনের কাল। ভারতের শুষ্ক অঞ্চলের প্রস্ফুটিত মহুয়া অরণ্যের মধুগন্ধী উদ্দামতা তুলনাহীন। এই গন্ধ দূরবাহী, তীব্র ও উন্মাদী। আদিবাসী ও অরণ্যের পশুপাখির কাছে মহুয়া প্রিয় তরু। মহুয়ার আশুপাতী পাপড়ির আকর্ষণে হরিণ ও ভালুকের সঙ্গে সাঁওতাল নর-নারী এই তরুতলে ভিড় জমায়। এই ফুলের পরিস্রুত নির্যাস উত্তেজক এবং আদিবাসীদের প্রিয় পানীয়। বলা বাহুল্য, মধ্যভারতের শুষ্ক অঞ্চলের বাসিন্দা এই গাছের পক্ষে বাংলাদেশের আর্দ্রতায় বিস্তারলাভ কিছুটা কঠিন বৈকি। তবু মহুয়া এদেশে অপ্রাপ্য

নয় এবং ঢাকার রমনা গ্রীনের বিরট মহুয়া গাছটিকে দেখলে বাংলাদেশকে মহুয়ার পক্ষে খুব একটা প্রতিকূল বলেও মনে হয় না। মহুয়ার শীর্ষ বহু শাখায় ছত্রাকৃতি ও ছড়ানো। কান্ড দীর্ঘ, মসৃণ, ধূসর এবং তাতে খসে পড়া বাকলের অজস্র দাগ। কাঁচা বাকল স্থূল, রসাল। প্রশাখান্তে ঘনবিন্যস্ত পত্রগুচ্ছ গাঢ়-সবুজ এবং আয়তন ও আকৃতিতে আকর্ষণীয়। এই গাছ পত্রমোচী এবং শীত পাতা ঝরার দিন। নিষ্পত্র মহুয়ার বিবর্ণ নিঃস্বতা সমকালীন পত্রমোচী তরুদের মতোই করুণ। অবশ্য এই রিক্ততা অচিরেই দূর হয় কলির প্রাচুর্যে।

মহুয়ার প্রান্তিক মঞ্জরি বহুপৌষ্পিক, গুচ্ছবদ্ধ, নতমুখী। ফুলের পাপড়ির ভেতর থেকে উদ্গত লম্বা ধারালো গভীদণ্ডটি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাপড়িরা স্থূল, রসাল ও সাটাটে। ফল অনেকটা বড় আকারের কুলের মতো। আষাঢ়-শ্রাবণ ফল পাকার সময়। বীজ বাদামী। এই ফুল অনেক দিন শুকিয়ে রাখা যায়। শুধু সুরা তৈরিই নয়, মিষ্টান্ন পুডিং এবং অন্য খাদ্যেও এই ফুল ব্যবহার্য। বীজের তেল হল ঘি ও মার্জারিনের ভেজাল এবং সাবানের উপকরণ। মহুয়ার খৈলের ধুঁয়া পতঙ্গ-নাশক, কাঠ ভারী ও স্থায়ী।

মধুকা নামটি সংস্কৃত থেকে গৃহীত। ল্যাটিফোলিয়া অর্থ প্রশস্তপত্রী, ইণ্ডিকা মানে ভারতীয়।

Family : *Sapotaceae*. Sc. name : *Madhuka indica* Smel. Syn. *M. latifolia* (Roxb). Macbride, *Bassica latifolia* Roxb. Hindi-Bengali : Mahua. Maul. Urdu : Mahuva. English : Butter tree. Place : Ramna Green.

বকুল

মাইমসোপ্স এলেংগি

'গাঁথ গাঁথ সুন্দর কন্যা লো মালতীর মালা
ঝইরা পড়ছে সোনার বকুল গো ঐ না
গাছের তলা।'

ময়মনসিংহ গীতিকা

চিরহরিৎ মধ্যম-বিরাট বৃক্ষ। কচি কাণ্ড, বৃন্ত এবং বৃতিপৃষ্ঠ বিবর্ণ-রোমশ। পত্র ঘন বিক্ষিপ্ত, মসৃণ, উজ্জ্বল-সবুজ, ডিম্বাকৃতি, হ্রস্বদন্তক, ৩″ — ৪″ দীর্ঘ, শীর্ষ ঈষৎ বর্ধিত, সূক্ষ্ম। পত্রবৃন্ত $\frac{৫}{৪}$″ কিংবা দীর্ঘতর ফুল $\frac{১}{২}$″, প্রশস্ত, ম্লান শুভ্র, সুগন্ধি, একক কিংবা গুচ্ছবদ্ধ। বৃতি ৮ বৃত্যংশে দুই সারিতে বিভক্ত, সূক্ষ্মকোণী। দলসংখ্যা প্রায় ২৪, দীর্ঘাকৃতি, বিকীর্ণ, সূক্ষ্ম। পরাগচক্র ৮টি উর্বর ও ৮টি বন্ধ্যা কেশরের সমষ্টি, রোমশ-পৃষ্ঠ। গর্ভকোষ রেশম-রোমশ। ফল ডিম্বাকৃতি, প্রায় ১″ দীর্ঘ, পক্ক অবস্থায় হলুদ বর্ণ, একবীজীয়।

বকুলের সঙ্গে বাঙালির আশৈশব পরিচয়। সৌন্দর্যের প্রতি সহজাত আকর্ষণ বশেই শিশুরা বকুলের মধুগন্ধি পুষ্পনির্ঝরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় এবং এই তরু শৈশবস্মৃতির অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। আমাদের কাব্য, সঙ্গীত ও প্রকৃতি বর্ণনায় ওর প্রাধান্য সহজলক্ষ্য। বকুলের সুষমায় আমাদের মানসলোক উদ্ভাসিত।

এই গাছ চিরহরিৎ, ছায়াঘন এবং সুষম আকৃতির জন্য বড়ই আকর্ষণীয়। কান্ড সরল, নাতিদীর্ঘ, বহুশাখী ও শীর্ষ গোলাকৃতি। বাকল ধূসর, রুক্ষ, অমসৃণ। পাতা কলচে-সবুজ, ঘনবদ্ধ, শাখান্তে অনির্দিষ্টভাবে বিক্ষিপ্ত এবং পেলব-মসৃণ। আমাদের চিরহরিৎ গাছের সংখ্যা খুবই সীমিত বিধায় শুধু পাতার ঐশ্বর্য ও আকৃতি সৌষ্ঠবেই বকুল সমাদরযোগ্য। ফাল্গুন নতুন পাতার দিন, কচি পাতার ম্লান-সবুজ, উজ্জ্বল। বকুলের পত্রবিন্যাস একস্তর হলেও বিপ্রতীপ বিন্যাসও দুষ্প্রাপ্য নয়।

বকুলফুল খুবই ছোট, বর্ণে পাংশু-সাদা, অনন্য সুগন্ধী। এই ফুলের গঠনে শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য সহজলভ্য। পাপড়ি ও পরাগচক্রের বিকীর্ণ ভঙ্গির জন্য বকুল নক্ষত্রকল্প। ফুলের সুগন্ধ

দূরবাহী, দীর্ঘস্থায়ী। শুকনো বকুল বিবর্ণ হলেও নির্গন্ধ হয় না। বাসি অবস্থায় একমাত্র গর্ভচক্র ছাড়া আস্ত ফুলটিই ঝরে পড়ে। শিউলী ছাড়া আমাদের পরিচিত অন্য গাছের এই বৈশিষ্ট্য নেই। ঝরে পড়া ফুলে আচ্ছন্ন তরুতল, মধুগন্ধে উদভ্রান্ত ভ্রমরের গুঞ্জন এবং ফুল-কুড়ানো শিশুদের উচ্ছল কলকণ্ঠ এসব নিয়েই বকুল আমাদের প্রিয়। ফাল্গুন থেকে শ্রাবণ অবধি বকুল ফোটে। ফল ডিম্বাকৃতি, পাকা

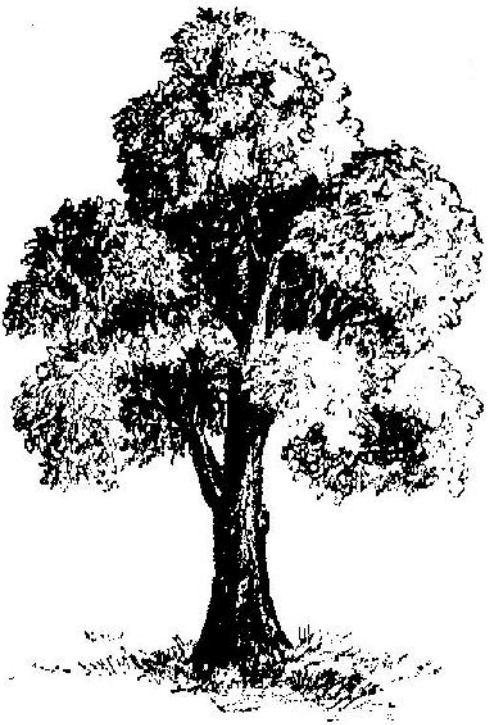

ফলের রং হলুদ এবং আকার ও আয়তন অনেকটা কুলের মতো। শাঁস নরম এবং একক বীজটি অত্যন্ত কঠিন। এই ফল দরিদ্রের খাদ্য, তৈল জ্বালানী ও ছবি আঁকার উপকরণ আর বাকলের ট্যানিন ও বাদামী রং, ফুলের সুগন্ধি-নির্যাস বিপণনযোগ্য। কাঠ দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী, তাই ঘরের কাজ, নৌকা ও গরুর গাড়িতে ব্যবহার্য। নড়ে-যাওয়া দাঁত বসানোর জন্য ফল ও বাকল চিবানোর রেওয়াজ প্রচলিত। ফুল রক্তদোষ, ক্ষত, আমাশয় এবং নস্যি সর্দিতে উপকারী।

বকুলের আদি আবাস ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, আন্দামান ও ব্রহ্মদেশ। ঢাকায় সেক্রেটারিয়েট রোডে একটি বিক্ষিপ্ত বীথি আছে। রামকৃষ্ণ মিশনের বকুল গাছগুলি প্রজাতির সব বৈশিষ্ট্যেরই

অধিকারী ইদানীং রমনা পার্ক, মানিকমিয়া অ্যাভিন্যু ও ধানমণ্ডি ২ নং রোডে অনেক বকুল গাছ আছে।

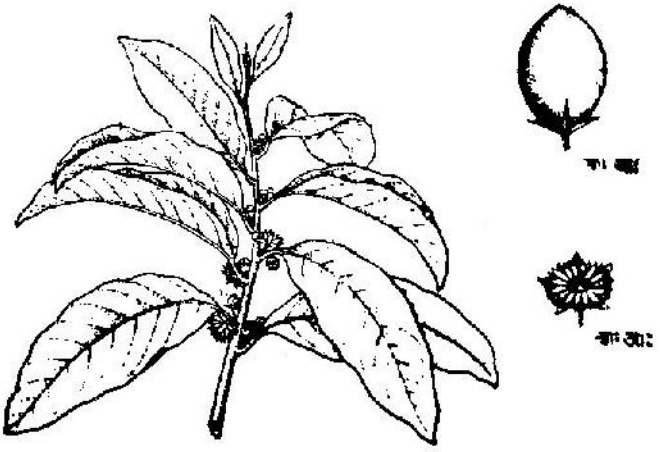

মাইমসোপ্স গ্রীক শব্দ, অর্থ বনমানুষের মুখ। সম্ভবত ফুলের আকৃতির জন্যই এমন নামকরণ। এলেংগি হলো বকুলের মালবারীয় নাম।

Family : *Sapotaceae*. Sc. name : *Mimsops elengi* Linn. Bengali : Bakul. Hindi : Mulsari. English : Indian medlar. Place : Ramkrishna Mission (1965).

সফেদা

ম্যানিলকারা ম্যাপ্টা

চারিপাশে উদ্যান কমল বিকশিত
চন্দ্র আমোদিত তরু চারু সুললিত।

মুহম্মদ জীবন

মধ্যম, চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র লম্ব-আয়তাকৃতি, হ্রস্ববৃন্তক, স্থূলকোণী, ৩″—৬″ দীর্ঘ, শাখান্তে একাত্তরে ঘনবিন্যস্ত। পত্রবৃন্ত $\frac{১}{২}$″ — ১″ দীর্ঘ। পুষ্প একক, কাক্ষিক, দীর্ঘবৃন্তক, ম্লান-সাদা, প্রায় $\frac{১}{২}$″ প্রশস্ত। বৃতির ৬ বৃত্যংশের মধ্যে বহিস্থ তিনটি বৃহত্তর। পাপড়ি ৬, নিম্নাংশে যুক্ত। পরাগকেশর ৬, কিন্তু উপদলে রূপান্তরিত পরাগকোষশূন্য পরাগকেশর বহুসংখ্যক গর্ভকোষ অধঃস্তন, ১০—১২ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ফল গোলাকৃতি, মাংসল $১\frac{১}{২}$″ — ২″ প্রশস্ত, বাদামী, অমসৃণ। মাংস রসাল, সুমিষ্ট, নরম, হালকা বাদামী। বীজ ৫ কিংবা ততোধিক, কঠিন, উজ্জ্বল কালো।

আমেরিকার উষ্ণমণ্ডল আদি আবাস হলেও বাংলা-ভারতে সফেদার প্রসার ও সুখ্যাতি খুবই প্রাচীন। বাংলাদেশে সফেদা সহজলভ্য এবং ফলতরু হিসেবে আদৃত। বর্ষায় শেষে ফলের মওসুমে শহরের অলিতে-গলিতে সফেদা-বিক্রেতাদের হামেশাই দেখা যায়। কাঁচা ও পাকা ফলের বাহ্যিক পার্থক্য খুবই কম বলে ফল পাড়ার সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কাঁচা সফেদা যেমন কষাটে, অতিপাকা ফলও তেমনি নির্গন্ধ ও স্বাদহীন। দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায়ই সফেদা সবচেয়ে সুস্বাদু।

সফেদার বাকল থেকে সাদা গুঁড়ার আস্তর যখন ধীরে ধীরে খসে পড়ে তখনই ফল পাড়ার সময় আসে। অবশ্য সঠিক সময় বোঝার জন্য দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। আমাদের দেশীয় সফেদা সুমিষ্ট ও সুগন্ধি হলেও আকার ও গুণগত বৈশিষ্ট্যে আমেরিকার সফেদার চেয়ে অনেক নিম্নমানের। ও-দেশে ইদানীং বীজহীন রাক্ষুসে সফেদা পাওয়া যায়, যাদের কোনোটার ওজন আধসেরের মতো। ফলের মূল্যই নয়, গাছের আকৃতির বৈশিষ্ট্যেও পালিত তরুকুলের মধ্যে সফেদা রূপসী। এজন্য একটি সম্পূর্ণ বাগানের পক্ষে সে

অপরিহার্য। এদেশে বাগানবিলাসীদের এমন বাগান খুব কমই আছে যা সফেদা-শূন্য। মধ্যমাকৃতি এই তরুর কান্ড সরল, উন্নত, শীর্ষ ছত্রাকৃতি ও ছায়াঘন, বাকল ধূসর, অমসৃণ এবং পাতা শাখান্তে গুচ্ছবদ্ধ, ঘনসবুজ। গ্রীষ্ম প্রস্ফুটনের কাল। ফুল তেমন আকর্ষণীয় না হলেও এদের উগ্র গন্ধ দূরবাহী ও দীর্ঘস্থায়ী। আপাতদৃষ্টিতে ফুলের পাপড়ি-সংখ্যা অজস্র মনে হলেও মূলত এগুলির অধিকাংশই রূপান্তরিত পরাগকেশর এবং সেগুলি মূল পাপড়ি অপেক্ষা ছোট। বকুলের সঙ্গে এই ফুলের সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। বকুল ও সফেদা তো সমগোত্রীয়।

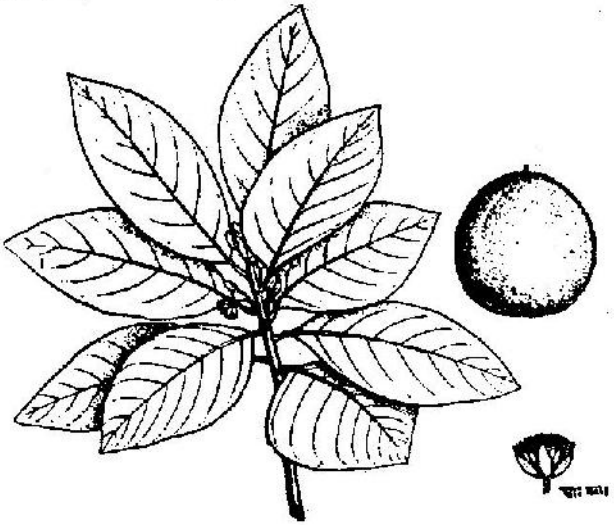

সফেদার ফুল ও ফলের মওসুম সঠিকভাবে চিহ্নিত নয়। বারমেসে সফেদা আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য নয়। তাই অকালেও গাছে ফুল ও ফল দেখা যায়। কাঠ লালচে-বাদামী, দৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী। ভেষজ হিসেবেও মূল্য ন্যূন নয় : বাকল অরেচক, টনিক, জ্বরহারী এবং বীজ রেচক। দুধকষ চিউয়িংগামের উপকরণ এবং আঠায় ছোটখাটো ভাঙা জিনিসপত্র জোড়া দেয়া যায়।

বীজ থেকে চারা জন্মান সহজ হলেও কলম ও জোড়-কলমের ব্যবহারই বেশি। কলমের গাছে মাত্র চার বছরের মধ্যেই ফল ফলে। ঢাকায় দৈবাৎ সফেদা গাছ চোখে পড়ে

'অ্যাক্সরস' গ্রীক নাম, অর্থ জংলী ন্যাশপাতি। 'য়্যাপট' সফেদার মেক্সিকো দেশীয় নাম।

Family : *Sapotaceae*. Sc. name : *Manilkara zapota* (L) P. van Royen. Syn. : *Achras zapota* Linn. Bengali : Sapeda. Hindi : Sapeda. English : Neesberry, American bully etc.

শেফালী

নিক্টেন্থাস্ আর্বোরট্রেস্টিস্

'কেন সুদূর গগণে গগণে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে
কোন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া
ওগো শেফালীবনের মনের কামনা।'

রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুদ্র বৃক্ষ। কচিশাখ রোমশ, চতুষ্কোণী। পত্র ডিম্বাকৃতি, সুক্ষ্মকোণী, বর্ধিত-শীর্ষ, প্রায় ৪″ দীর্ঘ। পত্রবিন্যাস বিপ্রতীপ। মঞ্জরি নিয়ত, স্বল্পপৌষ্পিক, কাক্ষিক ও প্রান্তিক। ফুল ক্ষুদ্র, অবৃন্তক, চুতদল। পাপড়ি যুক্ত, ৫—৮ অংশে বিভক্ত, সুগন্ধি, নিম্নাংশ নলাকৃতি $\frac{১}{৪}$″, গাঢ়-কমলা, উর্ধ্বাংশ প্রসারিত, শ্বেত, কোমল, $\frac{১}{২}$″ প্রশস্ত।

ফল চ্যাপ্টা, $\frac{৩}{৪}$″, ডিম্বাম্বুলাকৃতি, দ্বিবীজীয়, ধূসর, শুষ্ক।

বাঙালির মানসলোকে শরৎ বিশিষ্ট মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কাকচক্ষু নদী, গভীর নীলাকাশ, রজতশুভ্র মেঘপুঞ্জ, উজ্জ্বল দিনের হিরণ-হলুদ আলো, আন্দোলিত কাশবনের মঞ্জরি, পদ্ম-শাপলা-শালুকে আচ্ছন্ন জলাভূমি এই ঋতুর অনুষঙ্গ। কিন্তু এসব ছাপিয়ে প্রস্ফুটিত শেফালীর মধুগন্ধে কোনো সন্ধ্যায়ই কেবল শরতের আগমনীকে গভীরভাবে অনুভব করা যায়। শিশিরসিক্ত দুর্বায় শিউলীর নিঝরেই তো শরতের আগমনী পথের 'আলপনা' আঁকা হয়। আমরা আশৈশব তাকে দিয়েই শরৎকে চিনি। শেফালীর স্নিগ্ধবর্ণ, মধুগন্ধ শরতের শান্ত শুভ্র শ্রীর প্রতীক। শেফালীর বৈজ্ঞানিক নামের শেষাংশ : আরবরট্রেস্টিস, অর্থ বিষাদিনী তরু। এই নামকরণ একটি প্রাচীন উপকথালগ্ন : 'সূর্যের দীপ্তিতে বিগলিতা এক রাজকন্যা সূর্যের প্রেমে পড়লেন, প্রবঞ্চিত হলেন এবং শেষে আত্মহত্যা করলেন। তাঁর চিতাভস্ম থেকে অংকুরিত একটি গাছের শাখায় একদিন হতভাগিনী রাজকন্যার সব দুঃখ প্রস্ফুটিত হলো ফুলে ফুলে, তাঁর আশ্চর্য হৃদয়ের সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হলো বর্ণে-গন্ধে। কিন্তু

সূর্যের প্রতি প্রবল ঘৃণায় সে ফুটলো রাতের আঁধারে, সবার অলক্ষে। ভোর হতে, পূব আকাশে আলোর আভাস ফুটতেই তার ফুলেরা ঝরে পড়তো, মুখ ঢাকতো মাটিতে।' এই আমাদের শিউলী।

অবশ্য বাংলা কাব্যেও এমন উপলব্ধি অনুপস্থিত নয়। নজরুল শিউলীকে বিধবার হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুন্দর, শুভ্র, কোমল একটি ফুলের এই ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের বিষাদ এই নামকরণে সত্যি সার্থক।

শিউলী আমাদের পালিত তরুর অন্যতম। সহজে চারা জন্মানো এবং আমাদের আবহাওয়ায় পূর্ণ-অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও এদেশের অরণ্যভূমি শিউলীহীন।

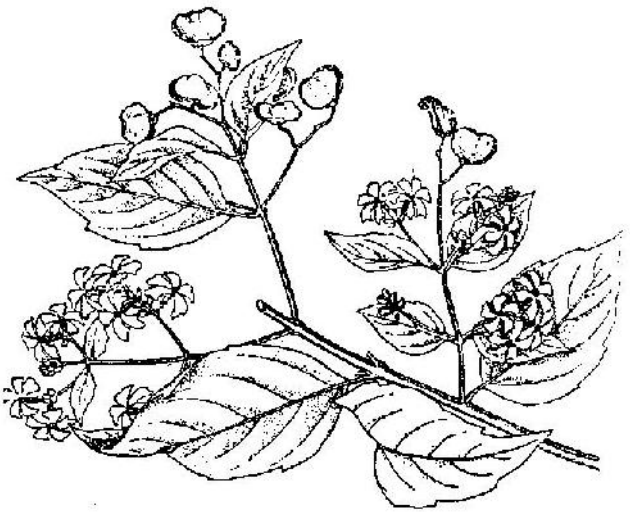

শিউলীর আদি আবাস মধ্য ও উত্তর-ভারত। যাঁরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' পড়েছেন লবটুলিয়ার জঙ্গলের শিউলীর বিশাল অরণ্য এবং তীব্র সৌরভ প্লাবিত এক সন্ধ্যায় নায়কের সম্মোহিত অবস্থার কথা তাঁরা সবাই জানেন। ঢাকায় এ-তরু দুষ্প্রাপ্য। প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ (বর্তমান জগন্নাথ হল) ও পাবলিক লাইব্রেরির প্রাঙ্গণ ব্যতীত পথের পাশে কিংবা কোনো উন্মুক্ত স্থানে শেফালী তেমন একটা চোখে পড়ে না। অথচ ওর ব্যাপক রোপণ শহরের জন্য খুবই জরুরি ছিল।

শেফালী ক্ষুদ্রাকৃতি বৃক্ষ। কান্ড দীর্ঘ এবং বহু শাখায়ন সত্ত্বেও উন্নত, তাই ক্ষেত্র বিশেষে এই গাছকে কৌণিক দেখায়। বাকল সাদাটে-ধূসর ও মসৃণ। বিপ্রতীপভাবে বিন্যস্ত পাতাগুলি ঘন-সবুজ, দন্তুর-প্রান্তিক ও সুক্ষ্মকোণী। পত্রবিন্যাস নিবিড় বিধায় শেফালী ছায়াঘন। আয়তন সীমিত বলে শেফালী পথতরুর উপযুক্ত নয়।

শীত ও বসন্তে নিষ্পত্র জীর্ণ শেফালী বড়ই হতশ্রী ও বিকর্ষী, গ্রীষ্ম পত্রোদ্গমের কাল। উজ্জ্বল-সবুজে আচ্ছন্ন শেফালীর যৌবনশ্রী সুদৃশ্য। শরৎ প্রস্ফুটনের কাল; মঞ্জরি সীমিত, নিয়ত ও স্বল্পপৌষ্পিক হলেও সংখ্যায় অজস্র এবং সেজন্য শেফালী প্রস্ফুটনে ঐশ্বর্যময়ী।

এই ফুলকলিরা মুখ তোলে সন্ধ্যায়। তাই শরৎরাত্রি শিউলীগন্ধে ভরপুর। ক্ষীণায়ু এই ফুলেরা নিশিভোরেই ঝরে পড়ে নিচের পাতায়, তলার ঘাসে। শরতের শিউলীতলা শিশু-কিশোরদের খুবই প্রিয়। কুড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও এই ফুল যেন শেষ হতে চায় না। এই পাপড়িরা বহুক্ষণ গন্ধ বিলায়, বোঁটার হলুদ টিকে থাকে বহুদিন। শেফালীর পাপড়িরা যুক্ত : নিচে গাঢ় কমলা, উপরটা মুক্ত চড়নো, দুধসাদা ও সুগন্ধি পরাগকেশর পাপড়ি নলের গভীরে অদৃশ্য থাকে। ফল শুকনো, চ্যাপ্টা, ধূসর এবং বসন্তের আগ অবধি গাছে টিকে থাকে। শিউলী তলায়ই ফলেরা ঝরে পড়ে এবং সেখানেই অজস্র চারা জন্মে।

শিউলী হিন্দুদের পূজা এবং মালায় ব্যবহৃত। ফুলের বোঁটার হলুদ রং উজ্জ্বল, কিন্তু অস্থায়ী। বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা তাদের কষায়বস্ত্র এ-দিয়ে রং দেন। মিষ্টান্নেও এই হলুদ ব্যবহার্য পাতা খুবই তিতা এবং জ্বর-উপশমে কার্যকর। বীজ চর্মরোগের ঔষধ। কাঠ মূল্যহীন।

'নিকটেনথাস' গ্রীক শব্দ, অর্থ হলো নিশিপুষ্প।

শিউলী ব্যতীত কোনো বাগানই পূর্ণ নয়। আমাদের সৌন্দর্য চেতনার অনুষঙ্গ হিসাবে এই তরুটি অবশ্যই যত্ন ও সমাদর দাবি করতে পারে।

পাবলিক লাইব্রেরির দেয়াল-ঘেঁষে সেই শিউলি গাছটি আজও আছে, প্রস্ফুটিত হয়, গন্ধ বিলোয়

Family : *Oleaceae*. Sc. name : *Nyctanthes arbor-tristis* Linn. Bengali : Shephali, Shephalica, Shiwali. Urdu :Gulojafri. English : Coral Jasmine, Night jasmine etc. Place : Public Library campus (1965).

গুলাচি

প্লুমেরিয়া রুব্রা ফর্মা অ্যাকুইটিফোলিয়া

'ফুলগুলি যেন কথা
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা।'

রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুদ্র-মধ্যম, মসৃণ, পত্রমোচী বৃক্ষ। শাখা-প্রশাখার অজস্র ভাগবিভাগে ক্রমপ্রসারমান, শীর্ষ বিস্তৃত, ছত্রাকৃতি। দেহ নরম, কোমল, স্থূল এবং দুধকষপূর্ণ। পত্র দীর্ঘ, ১৫″ × ৫″, লম্ব-ডিম্বাকৃতি থেকে লম্ব-অয়তাকৃতি, স্থূল, মসৃণ, উজ্জ্বল-সবুজ, প্রান্তিক এবং ঘন একান্তর: পত্রশীর্ষ সূক্ষ্ম, পত্র-প্রান্ত অখণ্ডিত, বৃন্ত ২″ দীর্ঘ মঞ্জরি নিয়ত, প্রান্তিক, শাখান্বিত, বিরাট, বহুপৌষ্পিক। ফুলের ব্যাস প্রায় ২″, সুগন্ধি, শুভ্র এবং কেন্দ্রে হলুদ। বৃতি যুক্ত, ৫ দল যুক্ত, রংগনাকার, ৫টি মোড়নো পাপড়ির ঊর্ধ্বাংশ প্রশস্ত। পরাগচক্র হলুদ, দলের গভীরে অদৃশ্য। ফল সজোড়, সরু, প্রায় ৫″ দীর্ঘ, দুষ্প্রাপ্য।

পরিপূর্ণ পুষ্পিত গুলাচি আমাদের বৃপসী তরুরাজ্যের মধ্যমণি। দেখলে মনে হয় গাছটি যেন প্রকৃতির সযত্নরচিত একটি বিশাল পুষ্পস্তবক এবং এই ফুলের অপূর্ব স্নিগ্ধ সুগন্ধ যেন নির্মলতার উদ্ভাস। এ তরু পত্রমোচী শীতের শেষ পত্রমোচনের কাল। উদোম গুলাচিকে একটি আকর্ষী ভাস্কর্য মনে হয় বসন্তের উষ্ণতায় প্রথম প্রস্ফুটন। শীতের আগ পর্যন্ত এই গাছে ফুল ফোটার বিরতি দীর্ঘস্থায়ী হয়না। নিষ্পত্র গুলাচির ডালে পুষ্পিত মঞ্জরির সৌন্দর্য যেমন আকর্ষণীয় তেমনি পত্রস্তবকের কেন্দ্রে গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুলেরাও বড়ই সুন্দর। বর্ণে, গন্ধে, প্রাচুর্যে এই ক্লান্তিবিহীন ফুল ফুটানোর খেলার তুলনা দুষ্প্রাপ্য। গুলাচির আয়তন ও আকৃতি সীমিত : সাধারণ উচ্চতা বারো থেকে ত্রিশ ফুট। অবশ্য ব্যতিক্রমও দুর্লভ নয়। স্থূল, গোলাকৃতি, নরম, ভংগুর এবং ক্রমাগত ভাগ-বিভাগে বর্ধমান শাখা-প্রশাখা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন কান্ড বৃক্ষ, অমসৃণ এবং খসেপড়া বাকলের চিহ্নে ধূসর। তরুণ শাখা-প্রশাখা মসৃণ ও সাদাটে সবুজ। পাতা অনেকটা রাজমিস্ত্রীর ঘুন্তির ফলকের মতো, যদিও কাঠগোলাপের পাতা অনেকটা বড় ও লম্বা। পাতার আগা কোনিক হলেও নিকটতম কটি প্রজাতি ও 'প্রকরের' পাতার আগা গোল। পাতার শিরা অত্যন্ত স্পষ্ট, স্থূল

ও দুধকষপূর্ণ। পাতার বিন্যাসেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : সারা দেহ নিষ্পত্র কিন্তু শাখান্তে ঘনবিন্যস্ত গুচ্ছ গুচ্ছ পাতায় শীর্ষ চন্দ্রাতপকল্প। পত্রবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য গাছের সৌন্দর্যে অতিরিক্ত সংযোজন । গ্রীষ্ম নতুন পাতার দিন। ফল দুষ্প্রাপ্য বিধায় অংগজ বিস্তার সুপ্রচলিত। ডাল থেকে সহজেই কলম হয় বলে এই গাছের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। গুল চির বৃদ্ধিও অত্যন্ত দ্রুত এবং অতি অল্প সময়েই গাছে ফুল ফোটে। এ তরু বহুনামী : কাঠগোলাপ, কাঠচাম্পা, গৌরচাম্পা, চালতা গোলাপ, গুলাচি, গোলকচাঁপা। প্লুমেরিয়ার

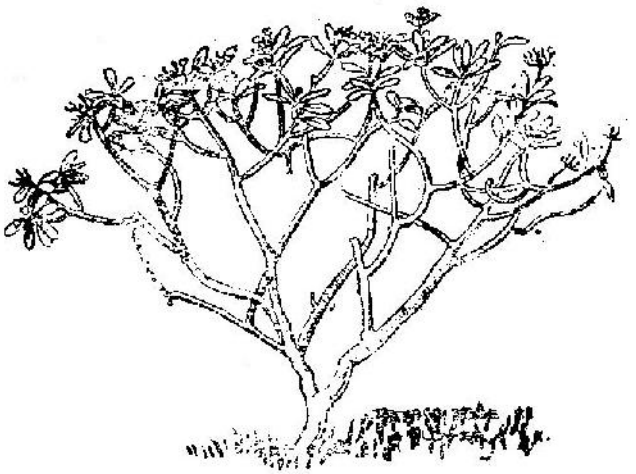

প্রজাতি বহু এবং এদের অনেকেই আমাদের দেশে সহজলভ্য, সযত্নপালিত। তাদের সুস্পষ্ট নৈকট্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে এদের 'প্রজাতি' ও 'প্রকারভেদ' সনাক্তিতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। নিচে মোটামুটি এদের প্রকারভেদ অনুযায়ী কয়েকটি গাছের নাম ও বর্ণনা উল্লিখিত হলো, যদিও সমস্ত জটিলতা সমাধানের পক্ষে এ মোটেই যথেষ্ট নয়। এদের সংকর-জাতের সংখ্যা বহু।

(ক) প্লুমেরিয়া রুবরা ফরমা অ্যাকুইটিফলিয়া : বৃহত্তম বৃক্ষ , পত্রমোচী, পত্রশীর্ষ কৌণিক, পাপড়ি সাদা, ডিম্বাকৃতি, কেন্দ্র হলুদ, সুগন্ধি। এদেশে সর্বাধিক সহজলভ্য।

(খ) প্লুমেরিয়া রুবরা : প্রথমোক্ত গাছ অপেক্ষা আয়তনে ছোট, অপেক্ষাকৃত কম সহজলভ্য। পাপড়ি প্রশস্ত, ডিম্বাকৃতি, রক্তিম, সুগন্ধি, কেন্দ্র হলুদ, বোঁটা রক্তিম, গন্ধ অ্যাকুইটিফলিয়া অপেক্ষা মৃদু, ক্ষেত্রবিশেষে ঈষৎ বিকর্ষী।

(গ) প্লুমেরিয়া অ্যালবা : গাছ (ক) ও (খ) অপেক্ষা অনেক ছোট, চিরহরিৎ, পাপড়ি গোলাকৃতি, প্রায় সাদা, অত্যন্ত সুগন্ধি, পত্রশীর্ষ গোল। অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য।

(ঘ) প্লুমেরিয়া টিউবারকুলেটা : (গ)-রং অনুরূপ, শুধু ফুলের কেন্দ্র হলুদ এবং কান্ড ও শাখা প্রশাখা অনুচ্চ গাঁটে আচ্ছন্ন।

এই কাঠ মূল্যহীন, ছাল তীব্র রেচক, কষ বাতের ঔষধ, পাতার সেক ফোলায় উপকারী। নারিকেলের তেলের সঙ্গে কষ চর্মরোগের ঔষধ।

আদি-আবাস সুদূর গুয়াতেমালা ও মেক্সিকো। আজ সে আমাদের দেশের আপন তরুকুলের অন্তর্গত। প্লুমেরিয়া নাম ফরাসী তরুবিদ চার্লস প্লুমেয়ারের (১৬৪৬—১৭০৬) স্মারক। অ্যাকুইটিফলিয়া অর্থ সুক্ষ্মকোণী পত্র। ঢাকায় এর কোনো সুপরিকল্পিত বীথি বা কুঞ্জ নেই. জি.পি.ও-র পশ্চিম, আবদুল গণি রোড, এয়ারপোর্ট বাগান, ভিখারুন্নেসা কলেজের দেয়ালের পাশে এবং যত্রতত্র গুল্মচির বিভিন্ন প্রজাতি ছড়িয়ে আছে।

এই গাছ হিন্দুদের কাছে পবিত্র। ফুল পূজার উপকরণ। বৌদ্ধরা একে মৃত্যুহীন প্রাণের প্রতীক বলে মনে করেন। এই দুর্মর তরু বাগান, মন্দির ও বাড়ির অঙ্গন সজ্জার উপযোগী।

Family : *Apocynaceae*. 1. Sc. name : *Plumeria rubra* Linn. forma *acutifolia* (poir) Woodson. Syn. *P. acutifolia* Poir. *P. acuminata* Aition. Hindi : Chameli. Gobur champa. English : Pagoda tree, Jasmine tree Frangipani. 2. Sc. name : *P. rubra* Linn. 3. Sc. name : *P. alba* Lnn. 4. Sc. name : P. *tuberculata* Lodd. Place : West of G.P.O. Air port Garden, Abdul Gani Road etc. (1965).

ছাতিম

অ্যাল্‌ষ্টোনিয়া স্কলারিস্‌

'তারপরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচলাগা শিশিরার্দ্র নৈশবায়ু ভরিয়া যায়। মধ্যরাত্রে বেণুবনশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায়, ডালে-পাতায় চিকচিক করে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্তর ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্যভরা। শন্‌ শন্‌ করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক বাতাস সোঁদালির ডাল দোলাইয়া তেলাকুচা ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।'

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ, চিরহরিৎ বৃক্ষ, দুধকষপূক্ত। ৫-৭টি দীর্ঘাকৃতি পত্রে গুচ্ছি বেষ্টিত থাকে। পত্র হ্রস্ববৃন্তক, ৪″ — ৮″ × ২″ - ৩″, স্থূল, মসৃণ, পৃষ্ঠ ম্লান-সবুজ। পত্র-বৃন্ত $\frac{1}{2}$″ দীর্ঘ। মঞ্জরি ছত্রাকৃতি, প্রান্তিক, বহুপৌষ্পিক ফুল ক্ষুদ্র, ম্লান-সবুজ, উগ্রগন্ধি বৃতি যুক্ত $\frac{1}{8}$″ দীর্ঘ। দল যুক্ত, নলাকৃতি, $\frac{1}{4}$″ দীর্ঘ। ফল সরু, সজোড়, প্রায় ১৮″ লম্বা।

বীজ বাদামী, $\frac{1}{5}$″ দীর্ঘ, ঈষৎ চ্যাপ্টা, রোমশ।

রবীন্দ্রকাব্যে ঋতু অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজনে শীতই সর্বাধিক উপেক্ষিত : প্রিয় কাননভূমি তখন শুষ্ক, থরথরি কম্পমান অর জীর্ণপাতার বিদায় গাথায় রোদনভরা। শীত কবির কাছে সন্ন্যাসের প্রতীক। 'কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব ঘটিয়েই তার আগমন, 'নিঃশেষে বিনাশী অকাল পুষ্পের দুঃসাহসেই' তার আনন্দ এই রুদ্র কুন্দ-মালতীর মিনতিতে বিন্দুমাত্র প্রসন্ন নন। ছাতিমই বোধহয় একমাত্র বৃক্ষ যে হেমন্তের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে প্রস্ফুটন আর সুগন্ধের প্লাবনে এই দুরন্ত শীতকে অভ্যর্থনা জানায়। প্রস্ফুটনের এমন অবারিত উচ্ছ্বাস, ফুলের অক্লান্ত নির্ঝর এবং দূরবাহী প্রবল উগ্র গন্ধের ঐশ্বর্য আর কোনো হৈমন্তী তরুরই নেই। আসন্ন শীতের মুখোমুখি ছাতিম যেন দুর্মর প্রাণের প্রতীক, ভাবী বসন্তের প্রসন্ন আশ্বাস।

ছাতিমের আকৃতির একটি আকর্ষী বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এমন ছাতিম দুর্লভ নয় যার ডালপালার ছড়ানোর ভঙ্গিটি বিশেষ কয়েকটি জোড়া-দেওয়া ছাতার মতো দেখায়। সরল

উন্নত কান্ড কিছুদূর উপরে হঠাৎ শাখা-প্রশাখার একটি ঢাকনা সৃষ্টি করে আবার একলাফে একে ছড়িয়ে অনেক দূর উঠে যায় এবং এমনি পত্রঘন কয়েকটি স্তরাতপের স্তর সৃষ্টি করে। বৈশিষ্ট্যটি কেবল শাখায়নেই নয়, কান্ডের উপর ঘূর্ণিত পত্রবিন্যাসেও প্রতিফলিত। একই গ্রন্থিতে ৫ থেকে ৭টি পাতার ঘুরানো বিন্যাস যেন শাখায়নেরই অনুকৃতি। অবশ্য ব্যতিক্রমও দুর্লভ নয়। ডিম্বাকৃতি কিংবা দীর্ঘ-ছত্রাকৃতি ছাতিম গাছের সংখ্যাও যথেষ্ট। ছাতিমের সংস্কৃত নাম সপ্তপর্ণী। পত্রসংখ্যাভিত্তিক এই নামকরণ স্পষ্টতই বিজ্ঞানবুদ্ধিবহ। ছাতিমপাতার বোটা ছোট, ফলক দীর্ঘ-বর্শাফলাকৃতি কিংবা দীর্ঘ-ডিম্বাকৃতি, কিনার অখণ্ড, শীর্ষ স্থূলকোণী এবং গ্রথন স্থূল, শ্বেতকষপূর্ণ ছাতিমের ছাল স্থূল, শ্বেতকষপূর্ণ, অমসৃণ এবং ধূম্রাটে-সাদা। এই গাছ চিরহরিৎ, শুধু আকৃতির রমণীয়তায় নয়, ছায়ার জন্যও তাই সমাদৃত। ঝড়-প্রতিরোধের পক্ষে তার দৃঢ়তা নির্ভরযোগ্য নয়। ছাতিম তবু শিমুলের চেয়ে শক্ত।

হেমন্তের শেষ প্রস্ফুটনের কাল। অবশ্য শরৎ-প্রস্ফুটন দুষ্প্রাপ্য নয়। ফুলেরা অনুজ্জ্বল, সবুজাভ-সাদা, অনাকর্ষী, তবু ছত্রাকৃতি মঞ্জরির প্রাচুর্যে পুষ্পিত ছাতিম সুশ্রী। অত্যুগ্র গন্ধে নেশার ঝাঁঝ রয়েছে। এমন প্রখর বলিষ্ঠ আত্মঘোষণার সামর্থ্য খুব কম তরুরই আছে।

ছাতিম ফুলের নিম্নের অংশ নলাকৃতি এবং নল-মুখের পাঁচটি পাপড়ি ঈষৎ বাঁকানো। পরাগচক্র দলের গভীরে অন্তর্লীন। গর্ভকোষ দুটি আংশিক যুক্ত বিধায় ফল সজোড়। ছাতিমের ফল সরু লম্বা এবং ফুলের মতোই অজস্র সংখ্যায় সারা গাছে ছড়িয়ে থাকে। বসন্তের শেষ হলো পাকার সময়। বীজ রোমশ এবং বায়ুবাহী। ছাতিম ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য হলেও বাংলাদেশের সে অন্যতম বহুলদৃষ্ট বৃক্ষ। বীজ থেকে খুব সহজেই চারা জন্মে এবং বৃদ্ধিও দ্রুত।

কাঠ তেমন সরেস না হলেও দরজা, জানালা, ছাদ ও সাধারণ আসবাবপত্রে ব্যবহার্য। ছাতিম উৎকৃষ্ট জ্বালানী। ভেষজ মূল্যও যথেষ্ট : ছাল ও আঠা জ্বর, হৃৎরোগ, হাঁপানী, ক্ষত, আমাশয় ও কুষ্ঠে উপকারী। ছাতিম পবিত্রতার প্রতীক। এই তরুতল ধ্যানের প্রশস্ত স্থান। আদি আবাস : চীন, বাংলাদেশ, ভারত, সিংহল ও মালয়। ঢাকায় ছাতিমের সংখ্যা খুবই কম। পি. জি. হাসপাতালের পাশে, ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ে সার্কিট হাউসের উল্টোদিকে একটি করে এই গাছ চোখে পড়ে। ঢাকাবাসী তাই ছাতিমের প্রস্ফুটন এবং উদ্দাম গন্ধপ্রবাহের সঙ্গে তেমন পরিচিত নন

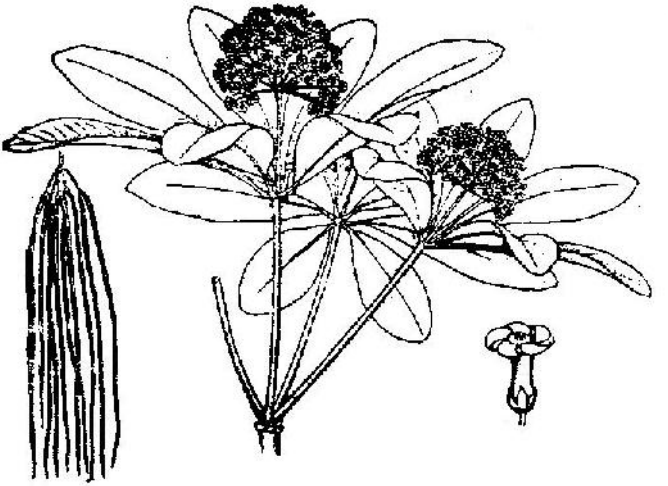

'অ্যালস্টনিয়া' নাম স্কটিস্ তরুবিদ সি. অ্যালস্টন-এর (১৬৮৫—১৭৬০) স্মারক। 'স্কলারিস' লাতিন শব্দ হলেও অর্থ সহজবোধ্য। এই কাঠে স্কুলের ব্লাকবোর্ড তৈরি হওয়ার সুবাদে প্রজাতি-নামাংশের সঙ্গে 'বিদ্যার সংযোগ ঘটেছে।

ঢাকায় ছাতিমের ব্যাপক রোপণের বিষয়টি বিচার্য।

Family : *Apocynaceae*. Sc. name : *Alstonia scholaris*, R. Br. Bengali : Chhatim. Hindi : Satni, Satwin. English : Duvil's tree. Place : Near P. G. Hospital (1965).

কুর্চি

হোলারহেনা অ্যান্টিডিসেন্টেরিকা

'অনেকদিন পূর্বে শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসছিলাম। কুষ্টিয়া স্টেশনঘরের পেছনে দেয়াল ঘেঁষা এক কুর্চিগাছ চোখে পড়ল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত। চারিদিকে হাটবাজার; একদিকে রেল লাইন, অন্যদিকে গরুর গাড়ির ভীড়, বাতাস ধুলোয় নিবিড়। এমন অজায়গায় পি. ডব্লিউ. ডি-র স্বরচিত প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে এই একটি কুর্চিগাছ তার সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয় ঘোষণা করছে—উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তার এ অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা। কুর্চির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।'

রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুদ্র, পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র লম্বাকৃতি, ৬″ — ১২″ × ৩″ — ৫″, মসৃণ, উজ্জ্বল-সবুজ, হ্রস্ববৃন্তক ; বিন্যাস বিপ্রতীপ ; মঞ্জরি স্বল্পপৌষ্পিক। ফুল সাদা, সুগন্ধি, প্রায় ১″ প্রশস্ত বৃতি যুক্ত, $\frac{১}{৮}$″ লম্বা দল রংগনাকার, প্রায় $\frac{১}{৩}$″ দীর্ঘ, ঊর্ধ্বাংশে বিযুক্তদল, প্রশস্ত, ঈষৎ মোড়ানো, ৫ পাপড়িতে বিভক্ত। পরাগচক্র দলনলিকায় অন্তর্লীণ। ফল সজোড়, সরু, লম্বা ১৫″ × $\frac{১}{৪}$″। বীজ $\frac{১}{২}$″ দীর্ঘ, ঘন-বাদামী, রোমশ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের কুর্চি আবিষ্কারে কিছুটা বিস্ময় স্বাভাবিক। কেননা, গাছটি আমাদের দেশজ এবং সংস্কৃতকাব্যে বহুল উল্লিখিত। মেঘদূতের শুরুতেই বিরহী যক্ষ যে-ফুলে মেঘপুঞ্জকে আহ্বান করেছে তাতো কুর্চি। মেঘদূতে কুর্চির দুটি বিশেষ স্মরণীয় উল্লেখ আছে :

(১) যক্ষ অতএব কুর্চিফুল দিয়ে সাজিয়ে প্রণয়ের অর্ঘ্য স্বাগত-সম্ভাষ জানালে মেঘবরে মোহন, প্রীতিময় বচনে।

(২) যদিও জানি তুমি আমার প্রিয় কাজে অচির উৎসুক, দেখেছি তবু সব কুটজ-সৌরভে মোদিত পর্বতে কাটবে কাল।

কুর্চিকে আমাদের কবি অবশ্যই নামে চিনতেন। সংস্কৃত কবিদের বর্ণিত তার গুণগ্রাম কবিকে হয়ত-বা বিভ্রান্ত করেছে এবং সেজন্য সত্যিকার কুর্চি তার সাদামাটা চেহারা নিয়ে এতদিন তাঁর অজানাই রয়ে গেছে। তাছাড়া কুর্চির নাম একাধিক এবং প্রতিটি নামই অত্যন্ত কাব্যিক বিধায় এই ফুল সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক। কুটজ ও গিরিমল্লিকা যে-ফুলের নাম তার আভিজাত্য তো সন্দেহাতীত। এই ফুলের দেশী নামের মধ্যে গিরিমল্লিকাই বোধহয় সার্থক। পার্বত্য অঞ্চলই তার প্রিয় আবাস এবং মল্লিকাগন্ধী উচ্ছ্বিত প্রস্ফুটনে সে গিরিকন্দর আমোদিত রাখে। ইংরেজি নাম ইস্টার

ফ্লাওয়ার। এতেও আছে এই উৎসবের পবিত্রতা ও মাধুর্যের অন্বয় : শুভ্র, সুগন্ধি, সর্বংসহা অথচ প্রস্ফুটনে উদ্দাম এই ফুল সুন্দর শাশ্বত জীবনের প্রতীক

পলাশ ও শিমুলের রং যখন ঝরে যায়, তখুর ভীরু সবুজ চৈত্রের রোষে সংকোচিত হয়, কৃষ্ণচূড়ার কলিরা থাকে শাখার গভীরে ঘুমিয়ে তখন কুর্চিই কেবল প্রকৃতির বর্ণ-সুষমার ঘোষক হয়ে ওঠে। নিষ্পত্র শাখায় সাদা ফুলের অবারিত প্রাচুর্যে এবং দূরবাহী মধুগন্ধে সে বসন্তের জয় ঘোষণা করে।

এই গাছের আদি আবাস বাংলা, ভারত, ব্রহ্মদেশ। আমাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলেই হয়তো ওর বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিনা। পাহাড়ে প্রচুর জন্মলেও আবাসিক এলাকায় কুর্চি দুষ্প্রাপ্য। ক্ষুদ্র আকৃতি এবং দারুমূল্যহীনতার জন্যই হয়তো এই অবহেলা। ঢাকায়

অঢেল কুর্চি থাকলেও সবই অপরিণত এবং ঝোপঝাড় মাত্র। আজিমপুর, হেয়ার রোড, মিন্টো রোডে দুএকটি পরিণত পুষ্পিত কুর্চি দেখলে আপন একটি তরুর প্রতি লজ্জাকর অবহেলার কথাই মনে পড়ে। কুর্চি আজও আমাদের সযত্ন সমাদর পেল না।

কান্ড সরল, উন্নত এবং শীর্ষ অজস্র উর্ধ্বমুখী শাখায় ডিম্বাকৃতি, কখনো বা এলোমেলো। বাকল অমসৃণ, হালকা ধূসর। শীতের শেষে নিষ্পত্র হবার পর বসন্তের শেষে এই শূন্যতা অবারিত হয় কচি পাতার সবুজে। পাতা লম্ব-ডিম্বাকৃতি, মসৃণ এবং বিন্যাস বিপ্রতীত। কুর্চি ছায়াঘন এবং ক্ষুপ্রাকৃতি হলেও সুশ্রী, শোভন। কুর্চির স্বাভাবিক উচ্চতা ১০—২০ ফিট, কিন্তু ২—৪ ফিট উঁচু গাছও অনেক সময় মুকুলিত হয়। কুর্চির অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হলো সারা বর্ষা ধরে বার কয়েক প্রস্ফুটন।

কুর্চি-মঞ্জরিতে ফুল সংখ্যা কম হলেও বিক্ষিপ্ত মঞ্জরি সংখ্যা অজস্র। নিষ্পত্র কিংবা পত্রঘন শাখায় সব সময়ই কুর্চি ফুলের শোভন সজ্জা আকর্ষণীয়। ফুল রংগনাকৃতি অর্থাৎ রংগন ফুলের মতো নিচের অংশ নলাকৃতি এবং উপর মুক্ত পাপড়িতে ছড়ানো। পাঁচটি পাপড়ির মুক্ত অংশ ঈষৎ বাঁকানো, বর্ণ দুধসাদা এবং সুগন্ধ তীব্র, কিন্তু মধুর। গোত্রীয় বৈশিষ্ট্যের রীতি অনুযায়ী পরাগচক্র দলের গভীরে অদৃশ্য। দুটি গর্ভকেশর প্রায় মুক্ত এবং এজন্য একই ফুল থেকে দুটি ফল জন্মে। এই সজোড় ফল দুটি সরু, লম্বা এবং বীজ বহুসংখ্যক, রোমশ এবং ঘন-বাদামী। বাতাস বীজের বাহন। সম্ভবত কুর্চির সর্বত্র প্রসারের জন্য বীজ ছড়ানোর এই অভিযোজনাটির অবদান রয়েছে।

কুর্চি ভেষজমূল্যে সমৃদ্ধ। বৈজ্ঞানিক নামের শেষাংশ 'অ্যান্টিডিসেন্ট্রিকা'য় এই পরিচয় সুচিহ্নিত। ফুল, বাকল, ফল সবই আমাশয়ের ঔষধ। তদুপরি বাকল চর্মরোগ ও প্লীহায়, ফুল রক্তদোষে, পাতা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, বাত, ফোড়া ও ক্ষতে এবং বীজ অর্শ, এজমা, শূল-বেদনা ও জ্বরে উপকারী। আসামে কুর্চি কাঠের কবজ ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। সর্পদংশন ও বিছার কামড়েও বাকল ব্যবহার্য। দারুমূল্যহীন হলেও আসবাবপত্রে কিছুটা ব্যবহৃত। এই নরম কাঠ থেকে পুতুল ও খেলনা তৈরি হয়। নামের প্রথমাংশের অর্থ অস্পষ্ট। অ্যান্টিডিসেন্ট্রিকা অর্থ অমাশয়রোধী। বাংলাদেশে কুর্চিগাছের সংখ্যা দ্রুত কমছে। সেন্ট্রেল উইমেন্স কলেজে একটি বয়স্ক কুর্চি গাছ আছে।

Family : *Apocynaceae*. Sc. name : *Holarrhena antidysenterica* Wall. Bengali : Kurchi, Girimalika, Tikta indrajau, kutaja. English : Easter tree.

কলকে

থিবেটিয়া পেরুভিয়ানা

'তুলে পুষ্প করুবক কুন্দ আর কুরুণ্ডক
কদম্ব কনক করবীর।'

কবিকঙ্কন চণ্ডী

চিরহরিৎ ক্ষুদ্র বৃক্ষ। কাণ্ড গোল, মসৃণ, ম্লান-ধূসর, শাখান্বিত। পত্র ৪″ — ৬″ × $\frac{1}{2}$″, ঘন-সবুজ, সরু ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ-রৈখিক, হ্রস্ববৃন্তক, শাখায় সর্পিলভাবে ঘনবিন্যস্ত। মঞ্জরি নিয়ত, স্বল্পপৌষ্পিক, প্রান্তিক। ফুল ৪″ পর্যন্ত দীর্ঘ, ঘণ্টাকৃতি, হলুদ, সাদা কিংবা মৃদু-রক্তিম। বৃতি যুক্ত, সবুজ, $\frac{1}{4}$″ দীর্ঘ। দল যুক্ত পাপড়ি ৫, ঈষৎ বাঁকানো, প্রায় নলাকৃতি, পেলব। পরাগচক্র দলের গভীরে দৃশ্য। ফল সজোড়, প্রায় ডিম্বাকৃতি, দ্বিবীজীয়, পক্ব অবস্থায় ম্লান-হলুদ। বীজ কঠিন, বন্দমী।

কলকে আমাদের অতি পরিচিত ফুল। ঝোপ-ঝাড় হিসাবে সহজলভ্য এই গাছ সযত্ন লালনের প্রত্যাশী নয়। কলকে গাছের আয়তন সীমিত, তাই বয়স্ক ব্যক্তিরেকে এটি বৃক্ষ গণ্য নয়। কলকে পত্রবহুল, শাখারা নমনীয় এবং শীর্ষ ছত্রাকৃতি। কল্কিগোত্রীয় অন্যান্য গাছপালার মতো এদেরও সারা দেহ দুধকষপূর্ণ। পাতা, কান্ড, মূল, ফল যেখানেই আঁচড় লাগুক সেখান থেকেই কষ উৎসারিত হয়। কলকে ফুল হিসেবে সমাদৃত হলেও বীজ বিষাক্ত বিধায় কিছুটা ভয়দও বটে।

কলকের কান্ড নাতিদীর্ঘ, মসৃণ সাদাটে-ধূসর। শীর্ষ ছড়ানো, অনত। চিরহরিৎ এই গাছ অজস্র দীর্ঘ-রৈখিক পাতার ঘনবিন্যাসে এলায়িত, ছায়া নিবিড় ও সুশ্রী।

ফুলসংখ্যা সীমিত বিধায় পাতার সবুজের প্রস্ফুটনের ঔজ্জ্বল্য প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রান্তিক মঞ্জরির স্বল্পজীবী সীমিতসংখ্যক ফুলগুলিকে খুবই নির্জীব দেখায়। তবু ঘন-সবুজ পাতার পটভূমিতে হলুদ, সাদা কিংবা রক্তিম ফুলভরা কলকে অবশ্যই শ্রীময়। কলকে নামটি ফুলের আকৃতির জন্যই। ফুল সাধারণত হলুদ, তবু সাদা ও ইট-লাল ফুলও দুষ্প্রাপ্য নয়। ফুলের নিচের অংশ সরু, নলাকৃতি, প্রায় সবুজ এবং মৌগ্রন্থিধর। শুধু মধুকরই নয়, আমাদের শিশু-কিশোররাও এই লুকানো মৌগ্রন্থির খবরটি জানে। তাই তারা কল্কির মধুপিয়াসী। ফুল সুগন্ধি। ঝরে-পড়া ফুলে আচ্ছন্ন গাছতল শিশুদের ফুল কুড়ানোর প্রিয়

স্থান। ফুলে ফোটে প্রায় সারা বছর। এ-দেশে যথেষ্ট বাড়-বাড়ন্ত সত্ত্বেও সে আমাদের দেশী তরু নয়। আদি আবাস ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ঢাকার সর্বত্র, বিশেষত প্রেসক্লাবের সামনে এবং ডি.আই.টি-র মূল ভবনের উত্তর পাশে কলকের ঝোপগুলি সহজেই চোখে পড়ে।

দুৎকষ ও বীজ বিষাক্ত। দারুমূল্যহীন হলেও ভেষজ হিসেবে কলকে বহুব্যবহৃত। বিষাক্ত বিধায় বিভিন্ন অংশ ব্যবহারে সতর্কতা জরুরি। বীজ ও কষে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং অপপ্রয়োগে ক্ষেত্রবিশেষ মৃত্যু ঘটাও সম্ভব। বীজতৈল হলুদ বর্ণ, স্বচ্ছ এবং জ্বালানী ও রেচক হিসেবে ব্যবহার্য। বাকল জ্বরনাশক, চর্মরোগ ও সিফিলিসের ক্ষতে উপকারী। আমেরিকায় বাকল থেকে তৈরি 'থেবেটিন' নামক বিষাক্ত নির্যাস জ্বরে খুবই

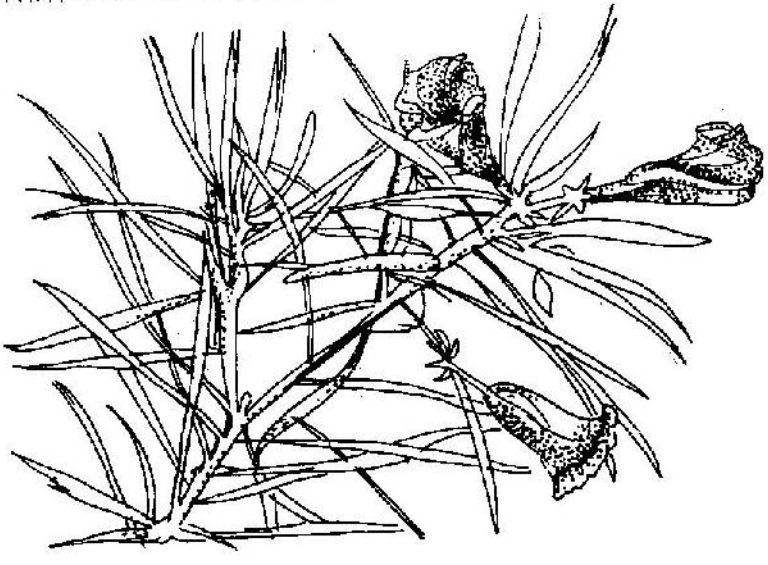

কার্যকরী। বীজ থেকে মৃগীরোগের নানা ঔষধ তৈরির জন্য ওদেশে কলকের ব্যাপক আবাদ। দেশীয় চিকিৎসকরা বহুকাল আগেই এই গোত্রজ গাছপালার ভেষজমূল্য অবহিত ছিলেন, কিন্তু আমাদের দেশে এগুলির আনুষঙ্গিক গবেষণায় কখনই তেমন উৎসাহ যোগানো হয় নি। 'হিবেটিয়া' নামাংশ ফরাসী তরুবিদ আন্দ্রে হিবেত (১৫০২—৯০) এর স্মরণিক। 'পেরুভিয়ানা' অর্থ পেরুদেশীয়।

ভেষজ সম্ভাবনা ছাড়া সৌন্দর্যের জন্যও গাছটি রোপণযোগ্য।

Family : *Apocynaceae*. Sc. name : *Thevetia peruvian* (pers) Meer. Syn : *T. nerifolia* Juss. Bengali : Kalki, Holdi kalki, China karabi. Hindi : Pilakanir, Zardkunel. English: Yellow Oleander, Exile oil tree. Place : Press club Campus, Segonbagicha (1965).

কদম

অ্যান্‌থোসেফেল্যস্‌ চায়নেন্‌সিস

'সখী, ঐ শুনো কদম্বতলে
বংশী বাজায় কে'

উত্তরবঙ্গের লোকগীতি

দীর্ঘ, পত্রমোচী বৃক্ষ। পত্র বৃহৎ, ৫″ — ৯″ × ৩″ — ৭″, ডিম্বাকৃতি কিংবা লম্ব-ডিম্বাকৃতি, চার্ম, উপরিভাগ মসৃণ, পৃষ্ঠ রোমশ, উজ্জ্বল সবুজ, অল্পবয়স্ক গাছের পাতা বৃহত্তর। বৃন্ত ১″ — ২″ দীর্ঘ। মঞ্জরি একক, গোল ১½″ — ২″ প্রশস্ত। মঞ্জরি দণ্ড ½″ — ১½″। পুষ্প অত্যন্ত ক্ষুদ্র, নলাকৃতি এবং গোলাকার পুষ্পাধারে অজস্র সংখ্যায় বিকীর্ণ। ফল গোল, হলুদ, মাংসল এবং ২″ —২½″ চওড়া।

কদম বাঙালির প্রিয় তরু। বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে লোকগাথা, পল্লীগীতি ও রবীন্দ্র-কাব্য পর্যন্ত বহুল উপমায় বিভূষিত তার গুণগাথা। কদম বর্ষার দূত : এই ঋতুর নিবিড় অনুভূতির সঙ্গে সে একাত্ম। কোনো বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় যখন 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' ফোটে, দমকা হাওয়ায় এক ঝলক গন্ধ জানালা গলিয়ে ঘরের স্তব্ধতাকে চকিত করে আমরা তখনই বর্ষার সুগভীর আহ্বানের অর্থ উপলব্ধি করি। কী নিবিড়, কী প্রগাঢ় আর দূরবাহী এই সুগন্ধ! বিশাল এই তরুর অজস্র প্রস্ফুটনের গন্ধমদির বর্ষার ভেজা বাতাস আমাদের মনে যে মধুর অনুরণন তোলে তার তো তুলনা নেই। কদম আমাদের অনুপম প্রকৃতির আত্মজ। বর্ণে গন্ধে সৌন্দর্যে কদম এদেশের রূপসী তরুর প্রথমদের অন্যতম।

কদম দীর্ঘাকৃতি, বহুশাখী এবং বয়স্ক গাছ বিরাট। ঢাকার বক্সীবাজার অঞ্চলের সিটি রোডের কদমবীথি বয়স্ক, তবু বিরাট নয়। আকৃতি ও অবয়বে একটি অবক্ষয় স্পষ্ট। অথচ ঢাকার অন্যত্র ইদানীং লাগানো অনেক কদমই বর্ধমান ও বলিষ্ঠ। সম্ভবত ভুল স্থান নির্বাচনের জন্যই সিটি রোডের কদম-বীথির এই 'বিষ্টতা'।

কদমের কান্ড সরল, উন্নত, ধূসর থেকে প্রায় কালো এবং বহু ফাটলে রুক্ষ, কর্কশ। শাখা অজস্র এবং মাটির সমান্তরালে প্রসারিত। পাতা বিরাট, ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল-সবুজ, তেল-

চকচকে এবং বিন্যাসে বিপ্রতীপ। উপপত্রিকা অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী বিধায় পরিণত পাতা অনুপপত্রিক। বোঁটা খুবই ছোট। নিবিড় পত্রবিন্যাসের জন্য কদম ছায়াদান এবং পথতরু হিসেবেও ভাল। কদম ঝড়ঝঞ্ঝারোধের পক্ষে তেমন শক্তসমর্থ নয়। কিন্তু বহুগুণান্বিত, তাই কোমল হলেও রোপিত হওয়া উচিত। শুধু ছায়াই নয়, পথতরুর ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের বিষয়টিও বিচার্য। শীত পাতা ঝরার দিন এবং কচি পাতা গজায় বসন্তে সাধারণত পরিণত পাতা অপেক্ষা কচি পাতা অনেকটা বড়। কদমের কচিপাতার রং হালকা। কদম-মঞ্জরি অনন্য সুন্দর। সৌন্দর্য ও গড়নে সে অনুপম। একটি পূর্ণ

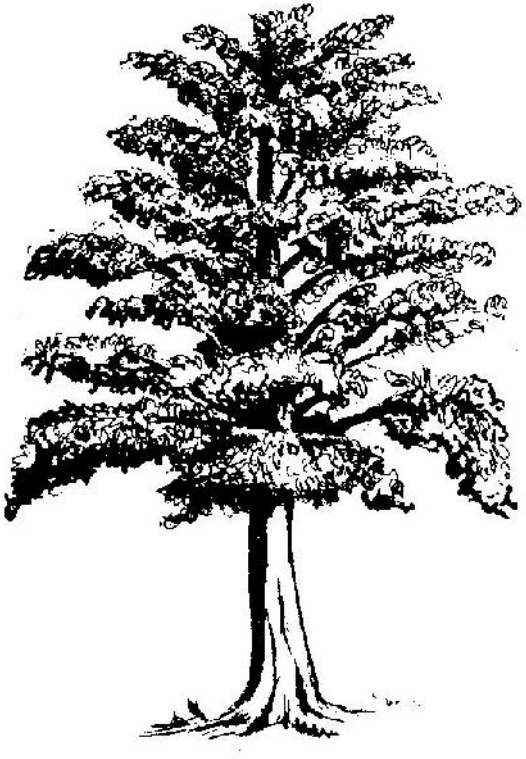

মঞ্জরিকে সাধারণত একটি ফুল বলেই মনে, তাতে বলের মতো গোল, মাংসল পুষ্পাধারে অজস্র সরু সরু ফুলের বিকীর্ণ বিন্যাস। পূর্ণ প্রস্ফুটিত মঞ্জরির রং সাদা-হলুদে মেশানো হলেও হলুদ সাদার আধিক্যে প্রচ্ছন্ন। প্রতিটি ফুল খুবই ছোট, বৃতি সাদা, দল হলুদ, পরাগচক্র সাদা এবং বহির্মুখীন, গর্ভদণ্ড দীর্ঘ। ফল মাংসল, টক এবং বাদুড় ও কাঠবিড়ালীর প্রিয় খাদ্য, ওরাই বীজ ছড়ানোর বাহন।

গাছের বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত বলে গ্রামে জ্বালানী কাঠের জন্যই কদমের ব্যাপক রোপণ ও সমাদর। দরমূল্যে নিকৃষ্ট হলেও সাদা, নরম কাঠ বাক্স-পেটরা এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য। ছাল জ্বরের টনিক হিসেবেও উপকারী।

বৈষ্ণব ঐতিহ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রিয় কদমতরু কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র সর্বত্রই উল্লিখিত। এ গাছ-পূজার রীতি হিন্দু-সমাজে প্রচলিত। মন্দির, বিশেষত বৈষ্ণবদের আখড়ায় সর্বদাই কদম লাগানো হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের উষ্ণাঞ্চল, চিন ও মালয় আদি-আবাস।

নামের প্রথমাংশ অ্যানথোসেফেলাস' গ্রীক শব্দ, মঞ্জরির আকৃতি ও পুষ্পবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যেই নামটি অর্থবহ : সঠিক বঙ্গানুবাদ মস্তকাকৃতি ফুল। চায়নেনসিস অর্থ চৈনিক।

চারুকলার বকুলতলা ও নটরডেম কলেজের ফটকে একটি করে বয়স্ক কদম গাছ আছে। উত্তরায় জনপথের পাশের দীর্ঘ কদমবীথিটি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

Family : *Rubiaceae*. Sc. name : *Anthocephalus chinensis* (Lam). A. Rich. Syn. : *A. indicus* A Rich., *A cadamba* Miq. *Nauclea cadamba* Roxb. Beng : Kadam, Kadamba. Place City Road, Bakshi bazar (1965).

স্পেথোডিয়া ক্যাম্পেন্যুলেটা

'ইকড়ের মরমর মাকড়ের রে আঁশ
এই না বিরক্ষে সোনার ফুল গো
ফুটে বারমাস।'

ময়মনসিংহ গীতিকা

দীর্ঘ বৃক্ষ। পত্র যৌগিক, একপক্ষল, সমূড, ১২″ — ১৮″; পত্রিকা-সংখ্য ৯″ — ১৯″, পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, ২″ — ৪″, হৃস্ববৃন্তক, কচি অবস্থায় রোমশ-পৃষ্ঠ। ফুল বৃহৎ, শাখান্তে গুচ্ছবদ্ধ, উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ। বৃতি চার্ম, রঙিন, ঈষৎ বক্র, ২½″ দীর্ঘ। দল ঘন্টাকৃতি, বক্র. ৪″ দীর্ঘ, লাল-গাঢ় কমলা। পরাগকেশর ৪, বহির্মুখী. ফল ১৫″ × ২″ এবং প্রস্থ ১″ স্থূল, দীর্ঘ, বর্শাফলাকৃতি।

স্পেথোডিয়ার কোনো বাংলা নাই নেই। না-থাকাটাই স্বাভাবিক, কারণ গাছটি আমাদের দেশজ নয়। সে সুদূর আফ্রিকার আতুজ। ইদানীং গাছটি ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য না হলেও মফস্বলে দুর্লভ। দূরগ্রামে দেবাৎ দেখা যায়। বহুকাল আগে আমদানি এদেশে, তবু তেমন প্রসার ঘটে নি। কে, কবে গাছটি আমদানি করলো তার ইতিহাস অনিশ্চিত। অথচ দারুমূল্য নেই, জ্বালানী হিসেবেও নিকৃষ্ট।

স্পেথোডিয়ার পৌষ্পিক ঐশ্বর্য আকর্ষণীয়। তুলনা হিসাবে সর্বোত্তম না হলেও ফুলকে মিষ্টি-কুমড়োর ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। শাখান্তে গুচ্ছবদ্ধ ফুলের প্রগাঢ় রক্তিম বর্ণচ্ছটা এবং প্রস্ফুটনের প্রাচুর্য থেকে একে হঠাৎ পলাশের আত্মীয় বলে ভুল করাও অসম্ভব নয়।

স্পেথোডিয়া দীর্ঘাকৃতি বৃক্ষ। কান্ড সরল, উন্নত এবং শাখা-প্রশাখা এলোমেলো, বাকল ম্লান-ধূসর, মসৃণ এবং গ্রন্থন আঁশযুক্ত। যৌগিক পত্র বিরাট ও বিন্যাস বিপ্রতীপ। পাতারা শাখান্তে সীমিত থাকায় গাছটি ছায়াঘন নয়। তাছাড়া দেহভঙ্গি, শাখাবিন্যাস এবং পত্র-সজ্জার প্রকট রুক্ষতা সহজেই চোখে পড়ে. মঞ্জরির বর্ণাঢ্যে এই দৈন্য পরিপূরিত না হলে রূপসী তরুর তালিকা থেকে গাছটির বর্জন ছিল নিশ্চিত। বৃক্ষ পত্রমোচী হলেও বছরে

কোনো সময়ই এটি সম্পূর্ণ উদোম হয় না। ছিন্ন, বিবর্ণ কিছু পাতা চৈত্র-বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র ও শুষ্কতায়ও শাখায় বিক্ষিপ্ত থাকে।

বসন্ত নতুন পাতা আর প্রস্ফুটনের ঋতু। কচি পাতার উজ্জ্বল-সবুজ আর পুষ্পিত মঞ্জরির উচ্ছ্বসিত রক্তিম বর্ণচ্ছটায় নিরক্ষীয় আফ্রিকার এই আত্মজ সমকালীন সকল গাছকে হার মানায়। ঘণ্টাকৃতি, বাঁকানো এবং গাঢ়-লাল কিংবা গাঢ়-কমলা বর্ণের এমন উজ্জ্বলতার জন্যই হয়তো ফুলটি সুগন্ধহীন। স্পেথোডিয়ার গন্ধ উৎকট এবং বাদুড়েরা সম্ভবত এজন্যই আকৃষ্ট। এরাই তার পরাগায়নের সহযোগী। বসন্ত ছাড়া সারা বছর ধরে

কয়েক বারই এই গাছে ফুল ফোটে। এই ফল স্পষ্টতই বর্শাফলকের মতো, এগুলি উর্ধ্বমুখীন কাষ্ঠকঠিন এবং ধারালো। সাধারণত বর্ষার শেষই ফল পাকার সময়। বীজ পক্ষল, বায়ুবাহী এবং দূরগামী। বীজ বিক্ষেপনের এই রীতির জন্য হয়তো গাছটি আমাদের গাঁ-গঞ্জেই পৌঁছেছে।

রোপনের পক্ষে বীজ অপেক্ষা কলমই নির্ভরযোগ্য। ঢাকায় ডি.আই.টি এ্যাভিনু ছাড়াও রমনা পার্কের পশ্চিম এবং আবদুল গনি রোডে কয়েকটি স্পেথোডিয়া গাছ রয়েছে।

কাঠ নরম, সাধারণ কাজেই শুধু ব্যবহার্য। প্রচুর ধোঁয়া হয় বলেও এটি নিকৃষ্ট জ্বালানী। শোনা যায়, ফলের নির্যাস থেকেই নাকি আফ্রিকার আদিবাসীরা তীরের বিষ তৈরি করে।

স্পেথোডিয়া গ্রিক শব্দ, অর্থ হাতা। সম্ভবত বৃতির আকৃতিতেই নামাংশ অর্থবহ। ক্যাম্পেন্যুলেট হলো ঘণ্টাকৃতি দলের লাতিন নাম। পথতরু হিসেবে তেমন আকর্ষণীয় না হলেও বাগান এবং বাড়ির অঙ্গনে গাছটি লাগানো যায়

Family : *Bignoniaceae*. Sc. name : *Spethodea campanulata* Beauv. Eng. African Tulip. Place : Abdul Ghani Road (1965).

ট্যাবেব্যুইয়া ট্রিফিলা

'সুখের বসন্ত এলো ধরণীর 'পরে
ফুটিল কুসুমগুলি থরে থরে থরে।'

কায়কোবাদ

ক্ষুপ, পত্রমোচী বৃক্ষ পত্র যৌগিক, ৩—৫ পত্রিক, পক্ষল, বিজোড়পক্ষ পত্রিক ডিম্বাকৃতি, মসৃণ, ২´´ — ৪´´ দীর্ঘ। পত্রিকাশীর্ষ স্থূলকোণী, গোলাকৃতি। মঞ্জরি নিয়ত, প্রান্তিক, স্বল্পপৌষ্পিক পুষ্প যুক্তদল, ভেরীকৃতি, গন্ধহীন, ম্লান-বেগুনী বা মৃদু রক্তিম, স্বল্পায়ু, প্রায় ২´´ দীর্ঘ। ফল সরু, ৬´´ পর্যন্ত দীর্ঘ, শুষ্ক

স্বল্পতম সংখ্যা নিরিখে এই শহরে ট্যাবেব্যুইয়া অতুলন। অদ্যাবধি ঢাকায় একটির বেশি এ-গাছ আমার চোখে পড়ে নি। রমনা গেটের কাছে গভর্নমেন্ট হাউস রোড ও দেওয়ান বাজার রোডের সংযোগস্থলের ট্রাফিক আয়ল্যাণ্ডে এই নিঃসঙ্গ তরুটি তার প্রজাতির প্রতীক হিসেবে আজও কোনোক্রমে টিকে আছে। প্রায় পঁচিশ ফিট দীর্ঘ গাছটির কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, ধূসর বর্ণ, অমসৃণ এবং শীর্ষ বিক্ষিপ্ত শাখা প্রশাখায় এলোমেলো। পাতা সাধারণত ত্রি-পত্রিক, কিন্তু পঞ্চপত্রিক পাতায় দুষ্প্রাপ্য নয়। পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, মসৃণ ও ম্লান-সবুজ এবং পত্রিকা-বিন্যাস বিপ্রতীপ

প্রায় সারা বছরই প্রস্ফুটন। পাতার আড়ালে ফুলেরা আচ্ছন্ন থাকে বলেই গাছের ফুলগুলি সহজে এদের চোখে পড়ে না। তাছড়া ফোটার কিছু পরেই ফুল মাটিতে ঝরে পড়ে বলে ফুলে ঢাকা গাছের তলেই শুধু পুষ্প-প্রাচুর্যের সন্ধান মেলে। নির্গন্ধ হলেও ট্যাবেব্যুইয়া এই বৈশিষ্ট্যে শিউলী কিংবা কলকের ঘনিষ্ঠ। ছাত্রজীবনে ভোরভ্রমণ শেষে ঢাকা হলে ফেরার পথে কতদিন শিশির ভেজা ঘাসের উপর ছড়ান এই ফুল দেখেছি। ফুল নিঃসন্দেহে সুন্দর : ভেরীর আকৃতি, দল-প্রান্ত আন্দোলিত এবং ভেতর হলুদ ও বেগুনীর মিশ্রণে উজ্জ্বল। ফল লম্বা, সরু ও ঘন-বাদামী বীজ ডিম্বাকৃতি। ব্যবহারিকভাবে গাছটি মূল্যহীন ফুল পূজার অর্ঘ্য ও নারীর কেশবিন্যাসের উপকরণ। ব্রাজিল আদিস্থান। ট্যাবেব্যুইয়া নামাংশ দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় নাম। ট্রিফিলা অর্থ ত্রিপত্রিক।

বর্তমান দেয়াল চত্বরে একদা ছিল। এখন নেই, সারা শহরে কোথাও নেই।

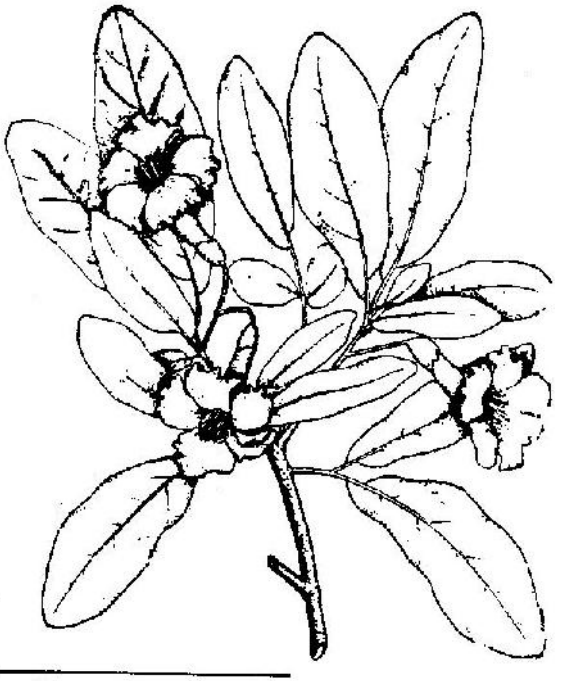

Family : *Bignoniaceae*. Sc. name : *Tababuia triphylla* Dc.
Place : Traffic island at south-west corner of Curzon Hall (1965).

গামারি

মেলিনা আর্বোরিয়া

পণ্ডিত পদ্ধতি কাছে জাগাল গামার গাছে
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।
বৃক্ষেরে বরণ করি সংঘাত সহিত করি
বান্ধিল সবার হাতে সূতা॥

শ্রীধর্মমঙ্গল

দীর্ঘ পত্রমোচী বৃক্ষ। প্রশাখা ও কুঁড়িরা রেণুসদৃশ রোমে আচ্ছন্ন। পত্র তাম্বুলাকৃতি, ৪″ — ৮″ দীর্ঘ, শীর্ষসূক্ষ্ম, ঈষৎ বর্ধিত, পরিণত পত্রের উপরাংশ মসৃণ, ঘনসবুজ, কিন্তু পৃষ্ঠদেশ পাণ্ডুর, রোমশ। পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, মৃদু-দন্তুর, বিন্যাস বিপ্রতীপ। পত্রবৃন্ত ৩″ — ৫″ দীর্ঘ, মঞ্জরি প্রান্তিক অনিয়ত, শাখায়িত এবং সাধারণত স্বল্প-পৌষ্পিক। পুষ্প অসম, দ্বিধাবিভক্ত, প্রায় $১\frac{১}{২}$″ দীর্ঘ, সবৃন্তক। বৃতির্দৈর্ঘ্য $\frac{১}{৪}$″, ৫-দন্তুর, রোমশ, যুক্ত। পাপড়ি-সংখ্যা ৫, যুক্ত ঔষ্ঠাধরাকৃতি, বাদামী-হলুদ, মৃদু-রোমশ। ফল প্রায় গোলাকৃতি কিংবা পেয়ারাকৃতি, ১″ প্রশস্ত, মাংসল, পক্ব ফল মৃদু-হলুদ।

১৯৬১ সালে সিলেটের পূর্বপ্রান্তে আমরা একটি উদ্ভিদ-সংগ্রহ অভিযানে গিয়েছিলাম। বসন্তের মাঝামাঝি। বহু গাছই নিষ্পত্র, অপুষ্পিত। পাহাড়ের ঢালুতে হঠাৎ হলুদে আচ্ছন্ন একটি গাছ চোখে পড়ল। পাতা ঝরার দিনে পাতারই হলুদ ভেবে শেষে কাছে গিয়ে আমাদের ভুল ভাঙলো। দেখলাম, এই হলুদ পাতার নয়, অক্লান্ত প্রস্ফুটনের। যে গামারিকে এতদিন শুধু ভালো কাঠ বলেই জেনেছি তার এমন ঐশ্বর্যের সংবাদ এই প্রথম জানলাম। শুধু বর্ণ নয়, মধুগন্ধেও সেখানে ভোমরের মেলা বসেছিল। আমরা তো রীতিমত অবাক। একটি পরিপূর্ণ পুষ্পিত গামারির সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। পরে ঢাকায় অনেক খোঁজ করে শহরকেন্দ্রে একমাত্র সেগুনবাগিচা ছাড়া কোথায়ও গামারি চোখে পড়ে নি। পরে অবশ্য তেজগাঁয়ের পাট-গবেষণা কেন্দ্রের সামনে খেজুর বাগানে এবং কুর্মিটোলায় অনেক গাছই লক্ষ্য করেছি। তারপর শহরে বহুবার আমি এর প্রস্ফুটন দেখেছি, কিন্তু এমন

উজ্জ্বল প্রাচুর্য আর চোখে পড়ে নি। ঢাকায় গামারির প্রস্ফুটন খুবই বিক্ষিপ্ত এবং এতে সৌন্দর্যের সেই পূর্ণতা নেই। হয়তো স্থানের প্রভাব।

পথতরু হিসেবে গামারির যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। সরল, প্রায় সাদা রঙের উন্নত কান্ড, গোল পত্রঘন শীর্ষ, উজ্জ্বল সুগন্ধি প্রস্ফুটন, সুবর্ণ পুষ্পনির্ঝর, দৃঢ়তা ও বায়ুমূল্যের এমন সুষম সমন্বয় সহজলভ্য নয়। গামারির বাকল মসৃণ, শাখা ঊর্ধ্বগ, কিন্তু প্রশাকান্ত আনত। পাতা বিরাট, বিন্যাস বিপ্রতীপ এবং শীর্ষ বর্দ্ধিত, উপরিতল ঘন-সবুজ, নীচ পাণ্ডুর। গাছটি পত্রমোচী এবং শীত নিষ্পত্র হবার দিন। বসন্তের শেষে পাতার সবুজে ঢাকা পড়ে।

নিষ্পত্র এই গাছে প্রথম প্রস্ফুটন শুরু হয় বসন্তের মাঝামাঝি। এই যৌগিক মঞ্জরি অনিয়ত ও প্রান্তিক। ঢাকায় এ-গাছে প্রস্ফুটন তেমন প্রাচুর্য নেই, মঞ্জরির ফুল সংখ্যাও খুবই কম ও বিক্ষিপ্ত। ফুলের রং বাদামী-হলুদ, পাপড়ি রোমশ, দ্বিধাবিভক্ত ও সুগন্ধি। প্রস্ফুটন ভোমরার প্রিয় বিধায় পুষ্পিত গামারিতে এদের এত ভীড়, এত কলগুঞ্জন। পরাগচক্রের দৈর্ঘ্য দলের সমান কিংবা একটু বড় এবং লম্বগুলি দললগ্ন। পক্ক ফল ম্লান-হলুদ, নরম, মাংসল ও প্রায় গোল। ফলের হলুদ রং পাকা সেজন্য দাগ মুছে ফেলা কঠিন। গ্রীষ্ম ফল-পাকার দিন।

দারুমূল্যে সেগুনের পরেই গামারির স্থান। কাঠ নরম, ঈষৎ হলুদ কিংবা ম্লান-বাদামী, উজ্জ্বল, দীর্ঘস্থায়ী। এই কাঠের ব্যবহার ব্যাপক : ঘরের দরজা থেকে নৌকা, আসবাবপত্র, সূক্ষ্ম কারুকার্যের উপকরণ সর্বত্র। ভেষজ হিসেবেও গামারি মূল্যবান। শিকড় পেট-ব্যথা, দাহ, জ্বর এবং মানসিক বৈকল্যে উপকারী, ফল কুষ্ঠ, চর্মরোগ, রক্তদোষ, চুল-ওঠা ও রক্তশূন্যতার ঔষধ। এই গাছ সিলেট ও চট্টগ্রামের জঙ্গলে জন্মে। মেলিনা জার্মান তরুবিজ্ঞানী জে. জি. মেলিনের (১৭০৯-৫৫) স্মারক। শেষাংশ 'আরবরিয়' লাতিন শব্দ, অর্থ বৃক্ষবৎ।

অন্য গুণের কথা বাদ দিলেও শুধু দারুমূল্যেই গামারি সমাদরযোগ্য এবং তার ব্যাপক অবাদ জরুরি। ইদানিং পরগাছার (লরেন্থাস) ব্যাপক আক্রমণে গামারি চাষে বিঘ্ন ঘটছে।

একটি মাঝারি আকারের গামারি আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে।

Family : *Verbenaceae*. Sc. name : *Gmelina arborea* Linn. Beng : Gambar, Gamari, Gamari. Hindi-Urdu : Gamhar, Khamara. English : Candahar tree, White teak. Place : Khejur bagan, Second Capital. Tejgaon (1965).

সেগুন

টেক্টোনা গ্রান্ডিস্

'বৃক্ষে চেয়ে থাকি
প্রথম প্রাণের দিকে পৌষের সকালে।
চোখ হয়ে যায় বুঝি পাখি
বসে ডালে নিত্যবান আলোর মতন
স্তব্ধতার বেগ
মাটি তাকে ভালবাসে, ভালবাসে মেঘ
ফাগুন যৌবন দেয় ফিরে ফিরে ডালে।'

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বিরাট, পত্রমোচী বৃক্ষ। প্রশাখা চতুষ্কোণী, খাঁজযুক্ত। পত্র ১২″ — ২৪″ × ১০″ — ১৬″, ডিম্বাকৃতি-বর্শাফলাকৃতি, পত্রশীর্ষ সূক্ষ্ম, বর্ধিত, বিন্যাস বিপ্রতীপ, পত্রপৃষ্ঠ রোমশ, খসখসে, সাদা-ধূসর, পত্রের উপরিতল উজ্জ্বল সবুজ, বৃন্তদৈর্ঘ্য ১″ — ১½″ মঞ্জরি বিরাট, অনিয়ত, শাখান্বিত, প্রায় ৩৬″ দীর্ঘ, বহুপৌষ্পিক, প্রান্তিক। পুষ্প ক্ষুদ্রাকৃতি ½″ প্রশস্ত, মৃদু-সুগন্ধি, শ্বেতবর্ণ। বৃতি ¼″ দীর্ঘ। দল ৫—৬ পাপড়িবিশিষ্ট, নিম্নাংশে যুক্ত, উপরাংশে মুক্ত ও প্রশস্ত, ঈষৎ ঘূর্ণিত এবং প্রস্থ রঞ্জনাকৃতি। ফল প্রায় গোল ½″ প্রশস্ত, বৃতির প্রসারিত প্রান্তে আবৃতপ্রায়, ৪—খণ্ডিত, ফলের বাকল কাগজের মতো পাতলা, বীজসংখ্যা ১—২.

সেগুনের বৈজ্ঞানিক নাম 'টেকটোনা' হলো গ্রিক শব্দ। 'টেকটন' অর্থ—ছুতার। বলাবাহুল্য, নামকরণে এখানে ব্যবহারিক মূল্যায়নের প্রসঙ্গটি অগ্রাধিকার পেয়েছে। কারণ, সেগুন পৃথিবীর সেরা কাঠের অন্যতম। হয়তো-বা সর্বশ্রেষ্ঠও। আমি একবার এক বিদেশী পরিবারকে ঢাকায় গাছপালা দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। ঢাকা ক্লাবের সামনে সেগুন দেখেই তাঁরা বিস্মিত ও উৎফুল্ল হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। কারণ, পাশ্চাত্যে এ গাছের এতো খ্যাতি, অথচ ওখানে জন্মে না। সেগুনের সাথে এটাই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। বিরাট খাঁজযুক্ত কান্ডে হাত বুলিয়ে তাঁরা কেবলই বারবার বলেছিলেন : 'ইজ দিস্ দ্যাট্ টিক? আমাদের দেশে এ-তো সোনার চেয়েও দামী।' স্পষ্ট মনে আছে, তখন বর্ষার শুরু। রেসকোর্সের পূর্ব-পারের সেগুনবীথি উচ্ছ্বসিত পত্র-সম্ভারে সবুজ। সারা দেহে সেই প্রমত্ত বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর—'গ্রান্ডিস' নামাংশ অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে চিহ্নিত। সেগুনের সার্থকতর নাম কল্পনাতীত।

সেগুন ব্রহ্মদেশ, মালয় ও তন্নিকটাঞ্চলীয় তরু। শীতার্ত পাশ্চাত্যে তার জন্ম হয় নি এবং অবাদও সম্ভব নয়। রোদ, বৃষ্টি এবং উষ্ণতার দাবি ওদেশী গাছপালার চেয়ে তার অনেক বেশি। অথচ এই কাঠ জাহাজ তৈরির পক্ষে অপরিহার্য। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অরণ্য উজাড় করে সেগুন রপ্তানী হয়েছে ইউরোপে। বর্মী সেগুনের চাহিদাই তখন সবচেয়ে বেশি ছিল। এই চাহিদা আজও শেষ হয় নি। সেগুন চাষ দিয়েই কলকাতা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রথম সূত্রপাত। বাংলাদেশে সেগুন চাষ ইদানীংকালের পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেগুন চাষ অশাতীত সাফল্য লাভকরেছে। পরিকল্পিত রোপণ ব্যতিরেকেই

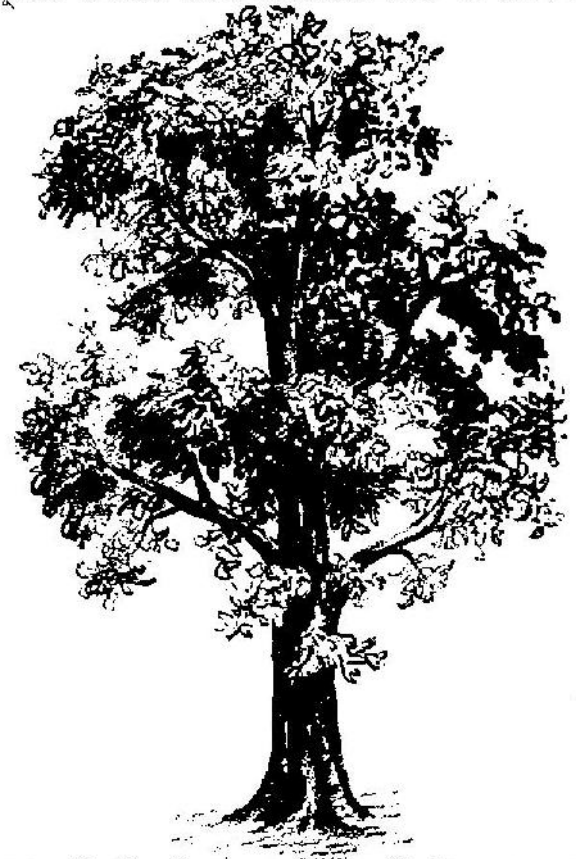

সেখানে এখন স্বাভাবিক বীজ বিক্ষেপে সেগুনের বংশবৃদ্ধি ঘটছে। সেগুন পোক্ত হয় বহু বছরে এবং ক্ষেত্রবিশেষে একশো বছরের আগে এই গাছ কাটা হয় না। ব্রহ্মদেশের অরণ্য থেকে প্রায় অনুরূপ বয়স্ক ১০০—১৫০ ফিট লম্বা এবং ১৬—২০ ফিট বেড়ের যে-সব সেগুন একদা কাটা হয়েছিল ইদানীংকালের হিসাবে তার মূল্য ওই ওজনের স্বর্ণমূল্যের সমান।

ঢাকায় সেগুনবীথি যথেষ্ট বয়স্ক এবং আকৃতিও বিশাল। অবশ্য তাদের কান্ড তেমন দীর্ঘ নয় এবং শাখা-প্রশাখায় বহুধাবিভক্ত। এজন্য এগুলির দারুমূল্য অরণ্যজাত সেগুনের চেয়ে কম।

এই বৃক্ষ বিশালদেহী, উন্নত, দৃঢ় এবং মহীরুহকল্প। কান্ড সরল, মৃদু খাঁজযুক্ত, ম্লান-ধূসর, শাখা ঊর্ধ্বমুখীন, শীর্ষ প্রসারিত, ছত্রাকৃতি, ছায়াঘন। পাতা বৃক্ষ, কর্কশ, বিরাট ও নিবিড়। পত্রতল সাদাটে-ধূসর ও রোমশ, বিন্যাস বিপরীত। শীতের শেষে পাতারা ঝরে পড়লে বিশাল দেহের দীর্ঘস্থায়ী নগ্নতা সমকালীন প্রকৃতির বিবর্ণতাকে আরো প্রকটিত করে। বসন্তের শেষে প্রথম বর্ষণে সমস্ত পত্রমোচী গাছের সবুজের আবার ফিরে এলেও সেগুন নিষ্পত্র থাকে

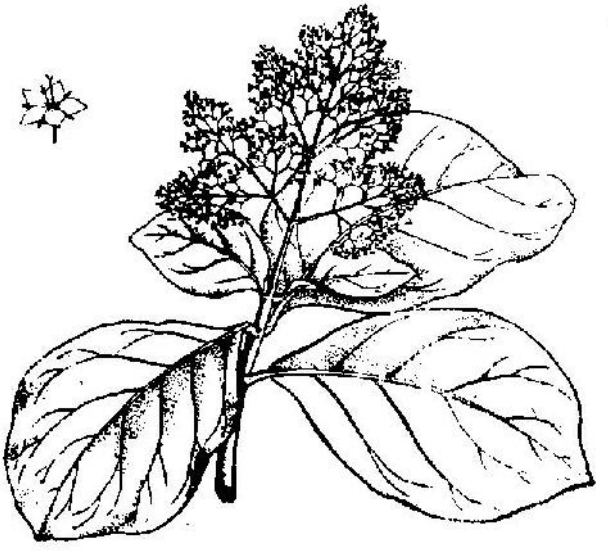

এ-পর্যায়ে তিনটি গাছ—সেগুন, বুদ্ধ নারিকেলও করই যথাক্রমে সবার শেষে একে একে পত্রাবৃত হয়। হয়তো বংশগতির বিশেষ ধর্ম। অবশ্য জৈবধর্মের বহুলাংশই বংশগতি ও পরিপার্শ্বের প্রতিক্রিয়া-নির্ভর বিধায় তরুত্রয়ের এই ধর্মগুলি স্থায়ী কিনা বলা কঠিন। উপমহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে আবহাওয়ার তারতম্য সত্ত্বেও এদের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তাই পাতা ঝরা এবং পাতা গজানোর যে-কালক্রম আমরা ঢাকায় লক্ষ্য করি অন্যত্র তার ব্যতিক্রম অসম্ভব নয়

বর্ষা প্রস্ফুটনের কাল আকাশ যখন আষাঢ়ের নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন, প্রকৃতির রং যখন প্রগাঢ় সবুজ তখন সেগুনের আকস্মিক অবারিত এই প্রস্ফুটনকে একটি অনন্য ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। ফুল অত্যন্ত ছোট, কিন্তু মঞ্জরি বিশাল, দীর্ঘস্থায়ী, আকর্ষনীয়। সবুজ-

ধূসর পাতার নিবিড় পটভূমিকায় উদ্ধত, শাখায়িত, বহু পৌষ্পিক মঞ্জরিতে উদ্বেল সেগুন এই ঋতুর আকর্ষণীয় তরু।

সেগুনের সাদা ফুলের গঠনভঙ্গি অনেকটা ঘেঁটু ফুলের মতো। এই গাছ ঘেঁটু-গোত্রীয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। একটি অতি ক্ষুদ্র গুল্মের সঙ্গের বিশাল মহীরুহের এই আত্মীয়তা শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্বে স্বীকৃত, কারণ আকৃতির পার্থক্য তরুকুলের নৈকট্যের পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধক নয়, পৌষ্পিক সাদৃশ্যই আসলে প্রধান বিচার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গামারি ও সেগুন সমগোত্রীয় এবং দারুমূল্যে উভয়ই ধনী। তাই গামারির ইংরেজি নাম 'হোয়াইট টিক' বা সফেদ সেগুন।

ফল বাদামী-ধূসর, পাতলা, যেন কাগজের হালকা ঠোঙ্গায় মোড়া। বীজ বিক্ষেপনে সেগুন অনেকাংশে বায়ুনির্ভর। এদের চারা করা সহজ এবং বৃদ্ধিও দ্রুত, ঢাকার সেগুন বাগিচায় অবশ্য ইদানীং কোনো সেগুন নেই, হয়তো-বা অতীতে ছিল। কিন্তু তরুর নামানুসারে যে পথ কিংবা অঞ্চলের নামকরণ সম্ভব, এটিই তার দৃষ্টান্ত।

সেগুনের দারুমূল্যের পুনরুল্লেখ অতঃপর অনাবশ্যক। এই কাঠ দৃঢ়, সুগন্ধি, সুচিত্রিত। কাঠের রং সোনালী হলুদ থেকে ম্লান-হলুদে বদলায়। দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং মসৃণতা অতুলন। অন্তর্লীন এক প্রকার তৈল এই কাঠের সুগন্ধ ও স্থায়িত্বের কারণ। পাতার রঞ্জকে কাপড়ের হলুদ ও লাল রং তৈরি সম্ভব। এ-ছাড়াও ঠোঙ্গা তৈরি ও অস্থায়ী ঘর-ছাউনির জন্য সেগুন পাতার ব্যবহার ব্যাপক। ভেষজ হিসেবে এই তরু মূল্যবান : কাঠ মাথা ব্যথা, অজীর্ণ এবং ফোলায় উপকারী, ফুলের তৈল কেশবর্ধক, আর শিকড়, ফুল ও বীজ মূত্রবর্ধক।

দারুমূল্য, সৌন্দর্য, ছায়া ও আরো বহুগুণে মহিমান্বিত এই মহীরুহ আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং ওর ব্যাপক আবাদ আমাদের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ। দেশব্যাপী দূরগামী রাজপথ তৈরির পরিকল্পনায় মেহগিনি, চাম্বল, গামারির সঙ্গে সেগুন রোপণের প্রশ্ন বিবেচ্য। লক্ষনীয়, রাজপথে তরুরোপণে সৌন্দর্যের চেয়ে প্রয়োজনের প্রসঙ্গটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুনের অগ্রাধিকার সেখানে প্রশ্নাতীত।

ঢাকায় সেগুনকে অনেকে শাল বলে ভুল করেন। আসলে ঢাকা শহরে শাল গাছ নেই, যদিও জয়দেবপুর, রাজেন্দ্রপুরে শাল-অরণ্য রয়েছে। শহরে শাল গাছ লাগানো হলো না কেন, বিষয়টি আমার কাছে দুর্বোধ্যই ঠেকে।

ঢাকা ক্লাব থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট পর্যন্ত রমনাপার্কের কোল-ঘেঁষা পুরনো সেগুনবীথিটি আর নেই। ক্লাবের পাশে ও অদূরে পার্কে অনেকগুলি সেগুন সেই পুরনো দিনের স্মৃতি ধারণ করে আছে।

Family : *Verbenaceae*. Sc. name : *Tectona grandis* Linn. Beng. : Segun. Hindi : Sagwan. Sakhu etc. English : Teak, Ship tree, Indian oak. Place : Near Dhaka Club (1965).

পান্থপাদপ

রেভেনেলা মাডাগাস্কারেন্সিস্

'ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।'

রবীন্দ্রনাথ

পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ প্রায় ২০ ফুট উঁচু। কান্ড সরল, উন্নত, নিশাখ, গোল এবং পত্রভিত্তি চিহ্নিত। পত্র বিরাট, দীর্ঘ, স্থূল। শিরাবিন্যাস সমান্তরাল, পক্ষল। মঞ্জরি বহু স্থূল, পৌষ্পিকপত্রে বিরাট, ম্লান-সবুজ, অনুজ্জ্বল, অনাকর্ষী। ফুল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বৃতি ৩, সরু এবং তরীদলাকৃতি। পাপড়ি ৩, অসম। পরাগকেশর ৫, পাপড়ি অপেক্ষা খাটো। গর্ভকেশর ৩ ফল ডিম্বাকৃতি, বহুবীজীয়, বীজ নীলবর্ণ

পান্থপাদপ আমাদের দেশীয় তরু না হলেও নামটি আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি। মরুভূমিতে দিগ্‌ভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত পথিকের একমাত্র ভরসা যে-গাছ তার কাহিনী শিশুপাঠ্য বহু পুস্তকেই বর্ণিত হয়েছে। পাতার গোড়ায় আঘাত করামাত্র নির্মল জলের একটি উচ্ছল ধারা উৎসারিত হয় এমন ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল রয়েছে। তাই নাম পান্থপাদপ।

এই গাছের সঙ্গে কলাগাছের সাদৃশ্য খুবই ঘনিষ্ঠ : তাদের পাতার আকৃতি প্রায় এক। কিন্তু এই সাদৃশ্য শুধু বাহ্যিক নয়, তারা সমগোত্রীয়।

পান্থপাদপের কান্ড অবশ্য কলার মত নরম ও পত্রিভিত্তিসর্বস্ব নয়। ইহা দৃঢ়, ধূসর এবং অজস্র আঁচড়ে অমসৃণ। ময়ূরপুচ্ছের মতো বৃত্তাকারে ঘূর্ণিত এর পত্রসজ্জা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাই আমাদের জলাধিক্যের দেশে সৌন্দর্যের জন্যই আমরা গাছটি রোপণ করি। পত্রাক্ষ থেকে উদ্গত মঞ্জরি অনেকগুলি মঞ্জরিপত্রে আচ্ছন্ন থাকে এবং এই সবুজ মঞ্জরিপত্র আকৃতিতে অনেকটা নৌকার মতো, সামনের দিক সরু, সূক্ষ্মকোণী। শরৎ প্রস্ফুটনের কাল।

পান্থপাদপ মাদাগাস্কারের প্রকৃত তরু হলেও ইদানীং উষ্ণমণ্ডলের সর্বত্র সহজলভ্য। আমাদের দেশে এর ফল দুষ্প্রাপ্য মাটির গভীরে লুকানো কন্দজাত নতুন চারাগাছ এখানে বংশবিস্তারের একক মাধ্যম।

'রেভেনেলা' এই গাছের মাদাগাস্কারীয় নাম। বৈজ্ঞানিক নামের শেষাংশের অর্থ মাডাগাস্কর দেশীয়।

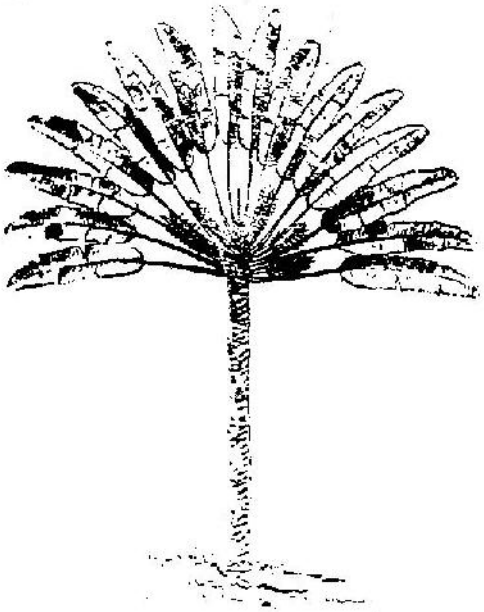

ঢাকায় রেলওয়ে হাসপাতালের সামনের পার্কে এক সময় কয়েকটি প্যান্থপাদপ বিপর্যস্ত অবস্থায় কোনোক্রমে বেঁচেছিল। আজ অযত্নে তাদের মৃত্যু ঘটেছে।

Family : *Musaceae*. Sc. name : *Ravenala madagascariensis*. Sonn. Bengali : Panthopadap. English : Travellers tree. Place : In front of Railway Hospital (1965).

নারিকেল

ককাস ন্যুসিফেরা

'বাতাস গিয়েছে দূর সমুদ্র বীজনস্নিগ্ধ
নারিকেল মর্মরিত প্রবালের দ্বীপে।'

বিষ্ণু দে

কাণ্ড সরল, সগোল, উন্নত, নিশখ, সর্বোচ্চ ৮০ ফুট, প্রস্থ ১ ফুট প্রশস্ত, আঁশযুক্ত, অর্ধবৃত্তাকার পত্রবৃন্ততলচিহ্নে নির্দিষ্ট দূরত্বে চিহ্নিত, পত্রাংকুশহীন। পত্র বিরাট, ১২ — ১৮ দীর্ঘ, পক্ষবৎ, শীর্ষকেন্দ্রিক, একাণ্ডরে ঘনবদ্ধ ; পত্রিকা ২ — ৩ দীর্ঘ, মসৃণ, ঘন-সবুজ, প্রায় সমান্তরালে পত্রক্ষে যুক্ত। পত্রভিত্তি প্রশস্ত। মঞ্জরি ৪—৬ দীর্ঘ, দৃঢ়, স্থূল, শংখায়িত, আনত এবং চমসাকার মঞ্জরিপত্রে আবৃত। ফুল একলিঙ্গিক। স্ত্রীপুষ্প মঞ্জরিশাখার শুরুতে এবং পুংপুষ্প শাখান্তে অবস্থিত পুংপুষ্প স্ত্রীপুষ্প অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। প্রথম ক্ষেত্রে পাপড়ির দৈর্ঘ্য $\frac{1}{4}$″, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রায় ১″ অবধি প্রসারিত। ফলের দৈর্ঘ্য ৮″ — ১২″, মধ্যাংশ গোলাকৃতি, দুই প্রান্ত কৌণিক, বর্ণ সবুজ—লালচে, বীজ গোলাকৃতি, অত্যন্ত দৃঢ় খোলে আবৃত এবং ফলের ছেবড়ায় সুরক্ষিত।

নারিকেল এদেশের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় তরু। উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহই চাষের প্রকৃষ্ট স্থান। ভূমির লবণাক্ততায় আসক্ত বিধায় আমাদের আলোনা উত্তরাঞ্চলে নারিকেল দুষ্প্রাপ্য। ঢাকায়ও নারিকেল অজস্র নেই। সমুদ্র থেকে দূরত্বজনিত লবণাক্তহীন মাটিই হয়ত কারণ। অবশ্য নারিকেল অন্যতম প্রিয় ফল, এজন্য সর্বত্রই অল্প-বিস্তর চাষ হয়। ঢাকার বাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুকুর পাড়েই শহরের সর্বাধিক সংখ্যক নারিকেল গাছ চোখে পড়ে তদুপরি বিক্ষিপ্ত নারকেল গাছ ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য নয়। ইদানীং শেরে-বাংলা নগরে প্রচুর নারিকেল গাছ লাগানো হয়েছে। নারিকেল পামগোত্রীয়। সৌন্দর্য ও উপযোগিতার সমন্বয় নারিকেলকে অদ্বিতীয় করেছে।

কান্ড সরল, উন্নত, সগোল, পত্রভিত্তিচিহ্নিত। শীর্ষে কেন্দ্রিত বিশাল পত্রসম্ভার, ফিতার মতো ঝুলানো উজ্জ্বল পত্রিকাগুচ্ছ, হাওয়ায় আন্দোলিত পাতার স্বনন এবং ফলনের উচ্ছ্বয় এই গাছকে অনন্য সুষমা দিয়েছে। শরৎ পর্যন্ত ফুল ফোটে, অতঃপর ফল পাকতে বছরখানেক সময় লাগে।

সমুদ্রপাড়ের গাছ বিধায় ফল জলস্রোতে নিক্ষিপ্ত হবার পক্ষে সুঅভিযোজিত। ছোবড়ার 'লাইফ জ্যাকেট' নিয়ে সে দিব্যি জলে ভেসে থাকে। বীজ কঠিন আবরণে সুরক্ষিত এবং দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার সঞ্চিত খাদ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। বীজ গোলাকৃতি কিংবা ডিম্বাকৃতি, এক প্রান্ত সরু কৌণিক এবং অন্য প্রান্ত গোল ও তিনটি দাগে চিহ্নিত। দাগ তিনটির একটির সঙ্গে নারিকেল ভ্রূণ যুক্ত থাকে। পাকা নারিকেলের শাঁস দুধ-সাদা, কঠিন, সুগন্ধি ও সুস্বাদু এবং জল সুমিষ্ট, খাদ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ। অপরিহার্য এই পানীয় শোষণেই

নারিকেলের ভ্রূণ চারা হয়ে ওঠে। বর্ধমান ভ্রূণের ক্রমাগত শোষণে সমস্ত শাঁস নিঃশেষিত হয় এবং শেষে বীজের ভিতর ভ্রূণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ভ্রূণের শিকড় ও ভ্রূণকাণ্ড নারিকেলের মালার খোল ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং সবুজ পাতা ক্রমে আলোয় উন্মোচিত হয়।

সুখাদ্য হিসাবে নারিকেলের শাঁস পিঠা, সন্দেশ, কেক, পেস্ট্রি, চকোলেট, লজেন্স এবং দৈনন্দিন রান্নায় ব্যাপক ব্যবহৃত। চিনি সহযোগে নারিকেল-কোরা খুবই সুস্বাদু। নারিকেলের চিড়া, নাড়ু মঙ্গলানুষ্ঠান ও অতিথি আপ্যায়নের একদা আদৃত ছিল। ইদানীং চা, বিস্কুটের ভিড়ে নারিকেলের সমাদর অনেকটাই নেই। অবশ্য ডাবের জলের আদর আজও আছে। এমন সুস্বাদু স্বাভাবিক পানীয় দুর্লভ। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কচি ডাব ব্যবহারে নারকেলের আর্থিক সম্ভাবনা মরাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নারিকেল হিন্দুদের পূজা ও মঙ্গলানুষ্ঠানের উপাচার। শাঁস থেকে তৈরি তেল কেশবর্ধক এবং দামী সাবান, শ্যাম্পু ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীর উপাদান। দক্ষিণ ভারতে এ-ই রান্নার তেল। নারিকেলের ছোবড়ার আঁশে দড়ি, মাদুর, পাপোষ ও অন্যান্য জিনিস তৈরি হয়। মালার মণ্ড থেকে বোতাম, অ্যাসট্রে প্রভৃতি তৈরি সম্ভব। নারিকেল মঞ্জরি-নিঃসৃত তাড়ী উপমহাদেশে তেমন জনপ্রিয় না হলেও অন্যত্র অপ্রচলিত নয়। ঘরের ছানি সহ চাটাই, হাতব্যাগ, পাখা তৈরিতে পাতা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভেষজ হিসেবেও মূল্য ন্যূন নয়: শিকড় অরেচক, কচি ডাবের জল পেটের পীড়ায় উপকারী—বিশেষত ভেদজনিত জলতৃষ্ণা নিবারণে কার্যকর

ফল থেকে সহজেই চারা জন্মে। বৃদ্ধি দ্রুত এবং অনুকূল আবহাওয়ায় ছ'সাত বছরেই ফল ধরে।

কক্যাস পুর্তগীজ শব্দ, অর্থ বানরের মাথা। সম্ভবত মালার সঙ্গে বানরের মাথার সাদৃশ্যই এই নামকরণ। ন্যুসিফেরা লাতিন শব্দ, অর্থ ফলবাহী।

সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের চারপাশসহ ঢাকায় এখন সর্বত্র নারকেল চোখে পড়ে।

Family : *Palmae*. Sc. name : *Cocos nucifera* Linn. Bengali : Narikel, Nayral, Narkul. Hindi : Narel, Nariel. Urdu : Nariel. English : Cocoanut palm. Place : Razarbagh Police line.

সুপারি

অ্যারিকা ক্যাটেচু

'সারি দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকী ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে।'

রবীন্দ্রনাথ

কাণ্ড সরল, উন্নত, নিশাখ এবং ৮৩ অবধি উচ্চ ও প্রায় ৬″ প্রশস্ত। পত্র বিরাট, পক্ষবৎ। পত্রভিত্তি প্রশস্ত এবং কাণ্ডের অংশ-বেষ্টক। পত্রিকা ফিতার ন্যায় দীর্ঘ, অসংখ্য ১—২′ লম্বা, কালচে সবুজ, মসৃণ। মঞ্জরি বহুশাখী, গুচ্ছবদ্ধ এবং দুটি নৌকাকৃতি পুষ্পধরপত্রে আবৃত। ফুল ক্ষুদ্র, একলিঙ্গিক, শ্বেতবর্ণ, অবৃন্তক। পুংপুষ্প মঞ্জরিদণ্ডের আগায় এবং স্ত্রীপুষ্প গুরুতে অবস্থিত। পুংপুষ্পের পরাগকেশর সংখ্যা ৬ এবং পরাগকোষ তীরের ফলার মতো। স্ত্রীপুষ্প একক কিংবা ২—৩টি গুচ্ছবদ্ধ, বৃত্যংশ ও পাপড়ি প্রত্যেকটি ৩ অংশে বিভক্ত, বন্ধ্যা পরাগদণ্ডের সংখ্যা ৬ এবং গর্ভমুণ্ড ৩। ফল ডিম্বাকৃতি, বৃতিযুক্ত, ১½″ — ২″ দীর্ঘ, মসৃণ, পক্ব অবস্থায় গাঢ় কমলা, একবীজীয়।

বিখ্যাত তরুবিদ স্যার জে.ডি. হুকার সুপারি গাছকে আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের তীর বলে বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর উপমাটি সার্থক এবং এতে সুপারী গাছের সব বৈশিষ্ট্যই চিহ্নিত। বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। আমাদের দেশে সুপারি একটি প্রধান অর্থকরী ফসল এবং উপকূল অঞ্চলের জেলাসমূহে আবাদ ব্যাপক। এমন গৃহস্থবাড়ি দুষ্প্রাপ্য, যেখানে অন্তত দুচারটি সুপারি গাছ নেই।

এই গ্রন্থে বর্ণিত সবকটি পামের মধ্যে সুপারির কান্ডের ব্যাস সবচেয়ে কম, কিন্তু উচ্চতায় সুপারি দীর্ঘতম। অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক গাছ দৃঢ়, উন্নত, গাঢ় সবুজ। মসৃণ, সগোল কান্ড নির্দিষ্ট দূরত্বে পত্রভিত্তিতে প্রায় চক্রাকারে চিহ্নিত। তরুণ সুপারি-গাছ সুশ্রী। শুধু উপযোগিতায়ই নয় সৌন্দর্যের জন্যও বাড়িতে, পুকুর-পারে, রাস্তার পাশে সারি দিয়ে সুপারি গাছ লাগানোর রেওয়াজ আছে। বয়স্ক গাছ ধূসর, লিকলিকে, অনেক উঁচু এবং এজন্য পাতার ভারে হেলে-পড়া। সেই অর্ধবৃত্তাকারে ঘূর্ণিত পক্ষল পত্র অন্য পামের মতো এখানেও কান্ডের মাথায় ঘন-একান্তরে গুচ্ছবদ্ধ। সুপারির পত্রভিত্তি দীর্ঘ, স্থূল, চর্মবৎ এবং এতে কান্ডের অংশবিশেষ ঢাকা। বছরের প্রথমেই সুপারির প্রস্ফুটন শুরু হয়। বহু চিকন শাখায় বিভক্ত মঞ্জরি গুচ্ছবদ্ধ। প্রথমে সমস্ত মঞ্জরিই চমসাকৃতি দুপরত পুষ্পধরপত্রে ঢাকা

থাকে। পরে এই ঢাকনি ভেদ করে মঞ্জরি বেরিয়ে আসে। পুংপুষ্প অত্যন্ত ছোট এবং পরাগ বিক্ষেপের পরই ঝরে পড়ে। স্ত্রীপুষ্পই শুধু ফলে রূপান্তরিত হয়।

ঘনসবুজ কান্ড ও পাতার পটভূমিতে পাকা ফলের গাঢ় কমলা রং অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গাছ-প্রতি সর্বাধিক ফলন ৩০০। সাধারণত ফুল ধরার নয়মাস পরে ফল পাকে।

সুপারি চর্ব্য হিসেবেই আমাদের দেশে ব্যবহৃত। বিশ্বে বার্ষিক চাহিদা ৫০,০০০ টন। সুপারি অরেচক, হজমী, উত্তেজক ও ক্ষতনিবারক। কচি সুপারি ঈষৎ বিষাক্ত। পাতা থেকে কাগজ, কাঠ থেকে লাঠি, বেড়ার খুঁটি ইত্যাদি তৈরি হয়।

সুপারির মূল আবাস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। অনেকের ধারণা সুপারি মালয়দেশীয়। উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্র সৈকত বৃদ্ধির আদর্শ স্থান। 'অ্যারিক' তামিল শব্দ, অর্থ একগুচ্ছ কঠিন ফল। ক্যাটেচু সুপারির মালয়দেশীয় নাম। সাধারণত বয়স্ক গাছ ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়। অন্যথা ২৫ বছর পর্যন্ত সুপারি গাছ ফলন্ত থাকে। ঢাকায় সুপারি গাছের সংখ্যা কম। বর্তমানে মৎস্যভবনের অদূরে কাকরাইল মসজিদের দিকে রমনা পার্কের ভেতর অনেকগুলি সুপারিগাছ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

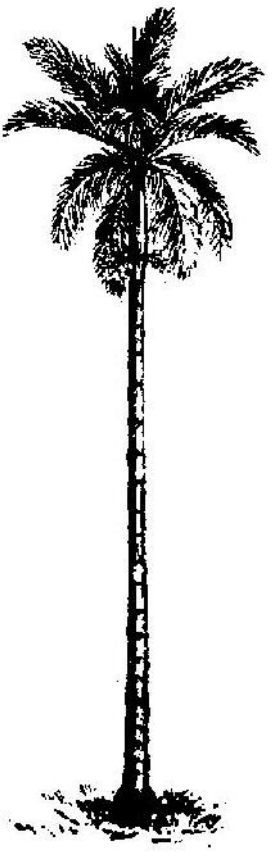

Family : *Palmae*. Sc. name : *Areca catechu* Linn. Bengali : Supari, gua. Hindi : Supyari. Urdu : Supyari. English : Areca nut, Betal nut palm.

খেজুর

ফনিক্স সিল্‌ভেস্ট্রিস্

'ঘরের ধারে কাঠের গাই

বছর বছর দুধ খাই।'

প্রবচন

সরল, দীর্ঘাকৃতি, শাখাহীন বৃক্ষ কাণ্ড পত্রাংকুশে আচ্ছন্ন। পত্র বিরাট। ৫´´ — ১২´´ দীর্ঘ, একপক্ষল ফলক ৬´´ - ৮´´ দীর্ঘ, ১´´ প্রশস্ত, সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ, দৃঢ়, ম্লান-সবুজ, মসৃণ এবং সমাঙ্কপৃষ্ঠ। পত্রভিত্তির নিকটতম ফলকসমূহ দৃঢ়, তীক্ষ্ণ, কন্টকসম। মঞ্জরি স্থূল, শাখায়িত এবং বৃহৎ চমসাকার মঞ্জরিপত্রে আবৃত বৃক্ষ দ্বিবাসী। পুংমঞ্জরি নাতিদীর্ঘ, প্রশস্ত ; ফুল সাদা, সুগন্ধি। স্ত্রীমঞ্জরি দীর্ঘতর, মঞ্জরিপত্র কাষ্ঠকঠিন। ফল ১´´ দীর্ঘ, ডিম্বাকৃতি, সুগন্ধি, হলুদ। বীজ দৃঢ়, $\frac{৩}{৪}$´´ দীর্ঘ।

খেজুর আমাদের পালিত তরু। বাংলাদেশে অগণিত হলেও অক্ষত খেজুর গাছ দুষ্প্রাপ্য। রসের জন্যই খেজুরের এই দুর্দশা। মাত্র ছ'সাত ফুট কিংবা তার চেয়েও ছোট গাছ থেকেই রস কাটার রেওয়াজ প্রচলিত। বছরের পর বছর একের পর এক গভীর ক্ষতচিহ্নে বিকৃত খেজুর তার আসল চেহারা ক্রমেই হারিয়ে ফেলে। আমাদের পরিচিত খেজুর গাছ তাই আঁকাবাঁকা, দুর্বল ও স্তিমিত। অথচ বলিষ্ঠ, স্বাভাবিক খেজুর পাম-গোষ্ঠীর অন্য স্বগোত্রীয়দের মতই সুশ্রী, শোভন। কান্ড যথারীতি সরল, গোল, ধূসর ও পত্রাংকুশে আচ্ছন্ন। মাথার গুচ্ছপত্র নারিকেলের পত্র-বিন্যাসেরই অনুরূপ। প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে ঘূর্ণিত বিরাট পত্রাক্ষটি দৃঢ়, হলুদবর্ণ। ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ পত্রিকাসমূহ উর্ধ্বমুখী। কাঁটা ও সূচিমুখ পাতায় খেজুর গাছ দুর্ভেদ্য।

খেজুর দ্বিবাসী। কিন্তু প্রস্ফুটন ব্যতীত তাদের যৌনচরিত্র নির্ণয় অসম্ভব। পুং-গাছের মঞ্জরি অপেক্ষাকৃত খাটো, ফুল সাদা, কিন্তু স্ত্রী-মঞ্জরি দীর্ঘতর এবং ফুল সাদাটে সবুজ। গ্রীষ্ম প্রস্ফুটনের কাল তাল-নারিকেলের মতো খেজুরও অজস্র ফলে। পাতার গোড়া থেকে ঝুলন্ত ফলের অজস্র গুচ্ছ বড়ই দৃষ্টিনন্দন। ফল ডিম্বাকৃতি, হলুদবর্ণ, সুগন্ধি। পরিপক্ব খেজুর ঘন-বাদামী। আমাদের দেশী খেজুরের শাঁস অত্যন্ত কম, একমাত্র বীজটি কঠিন ও কষায়, ঈষৎ মিষ্টি শুষ্ক ওই শাঁসটুকুর জন্য খেজুর কিশোরদের প্রিয়।

শরতে ফল পাকার সময় খেজুরের কাঁটার বেড়া ফললোভী কিশোরদের দুরন্তপনার কাছে হার মানে। খেজুরের রস নিঙড়ানোর আয়োজন শীতের প্রথমেই শুরু হয়। পত্রগুচ্ছের নিচের দিকের কটি পাতা কেটে প্রথমে কান্ডের শেষপ্রান্তে নাতিগভীর একটি গর্ত করে তাতে একফালি বাঁশ পোঁতা হয়। রস সহজেই নিচে বাঁধা হাঁড়িতে গড়িয়ে জমতে পারে। এই রস অত্যন্ত মিষ্ট ও উপাদেয়। খেজুরের কাঁচা রস-পানের রেওয়াজ আমাদের দেশে ব্যাপক। এই রস থেকে তৈরি 'পাটালী' গুড় বহুলব্যবহৃত। খেজুরের তাড়ি সমাজের একটি বিশেষ স্তরে প্রিয় পানীয়। পাতা থেকে চাটাই ও আঁশ থেকে দড়ি তৈরি হয়। জল-নিষ্কাশনের পাইপ হিসেবে কান্ডের ব্যবহার প্রচলিত। শিকড় দাঁতন হিসেবে ব্যবহার্য। খেজুর ফল হৃৎরোগ, জ্বর, উন্মত্ততা ও পেটের পীড়ায় উপকারী।

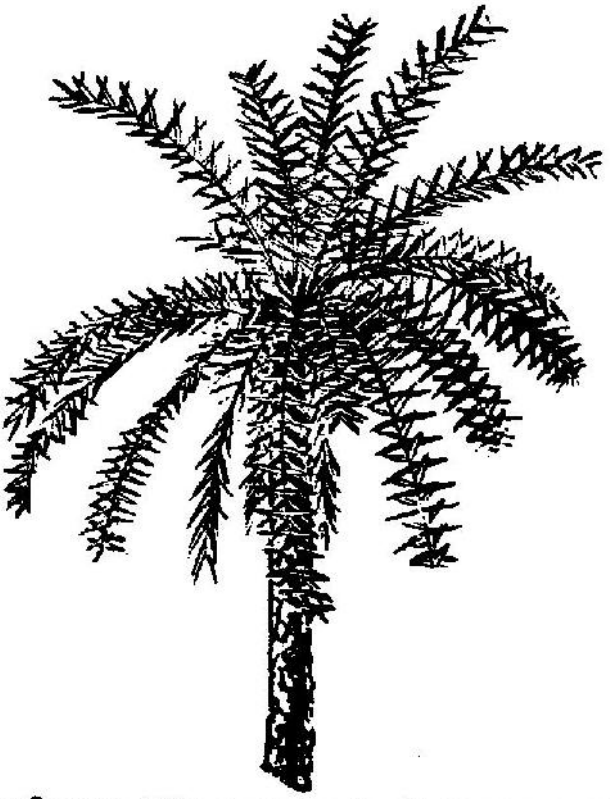

এ-গাছের আদি আবাস এই উপমহাদেশ : রসের জন্যই ব্যাপক চাষ। গাছপ্রতি বার্ষিক রস-উৎপাদন ৭-৮ মন ও গুড় মেলে ১০-১২ সের।

ঢাকায় সর্বত্র বিক্ষিপ্ত বহু খেজুর গাছ রয়েছে। 'ফনিক্স' বেগুনি বর্ণের গ্রিক প্রতিশব্দ এবং ফলের রং নামকরণের হেতু। সিলভেস্ট্রিস্ লাতিন শব্দ, অর্থ—বন্য।

Family : *Palmae*. Sc. name : *Phoeix sylvestris* Roxb. Bengali : Khajur, Khejur. Hindi : Khaji, Salma, Sendhi, Thalma. English : Date palm. Indian wine palm. Place : Tejgaon area (1965).

রয়্যাল পাম

র‍্যয়স্টোনিয়া রিজিয়া

'মস্তবড় ময়দান, দেবদারু পামের নিবিড় মাথা
মাইলের পর মাইল;
দুপুর বেলার জনবিরল গভীর বাতাস।'

জীবনানন্দ দাশ

বিরাট পাম। কাণ্ড সরল, উন্নত, নিশাখ, ম্লান-ধূসর, ৪০—৬০ × ২, পত্রভিত্তিচিহ্নিত। পরিণত গাছে কাণ্ডের মধ্যস্থান সর্বাধিক স্থূল এবং দুই প্রান্ত ঈষৎ সরু। পত্রবিন্যাস একান্তর, শীর্ষকেন্দ্রিক। পত্র ৮ - ১০' দীর্ঘ, পক্ষল, পত্ররক্ষ অর্ধবৃত্তাকারে ঘূর্ণিত। পত্রভিত্তি স্থূল, প্রসারিত, নৌকাকৃতি ও বিরাট। ফলকখণ্ড ৩' পর্যন্ত দীর্ঘ, ফিতার মতো ঝুলন্ত, দ্বিধাবিভক্ত। মঞ্জরি-সংখ্যা ৩—৪। মঞ্জরিপত্র নৌকাকৃতি। প্রতিটি মঞ্জরি দুইটি পুষ্পধর পত্রে আবৃত। পুষ্প একলিঙ্গিক, কিন্তু একই মঞ্জরিস্থ। পুংপুষ্প স্ত্রীপুষ্প অপেক্ষা বৃহত্তর। পরাগকেশর সংখ্যা ৬— ৭। স্ত্রী পুষ্প $\frac{১}{৬}''$ দীর্ঘ, গর্ভদণ্ড ত্রিভুজাকৃতি, স্থূল। ফল গোল থেকে ডিম্বাকৃতি, $\frac{১}{৪}''$ প্রশস্ত।

উপযোগিতার প্রশ্ন বাদ দিলে সৌন্দর্যে রয়েল পামের সমতুল্য আর কোনো পামই আমাদের দেশে নেই। এই পামের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যকে তাল-নারকেলের সৌন্দর্যের সংকর হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কান্ডের ঋজু বলিষ্ঠতা যেন তালেরই অনুকৃতি আর মাথার দীর্ঘ পক্ষল ঝাকড়া পত্রগুচ্ছ তো স্পষ্টত নারকেলেরই পর্ণস্তবক। কিন্তু এই তো সব নয়। মসৃণ, ম্লান-ধূসর, দুই প্রান্তে ঈষৎ সরু এবং মধ্যে সর্বাধিক স্থূল এই কান্ডটি যেন শিল্পীর সযত্ন নির্মাণেরই ফল। কান্ডের এই আকৃতি বোতলসম। হয়তো সেজন্যই অন্য নাম 'বটল পাম'। পথপার্শ্ব, নদীতীর, বিদ্যায়তনের অঙ্গন সর্বত্রই পামটি শোভন সৌন্দর্যের অনুষঙ্গ। অভিজাত উদ্যানসজ্জায় এই পামের সমাদর সমধিক।

গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রস্ফুটনের কাল। মঞ্জরি অনেকাংশে সুপারির মতো। ফুলের বর্ণ খড়-ধূসর। পাকা ফল গোল, খুব ছোট ও ঘন-বেগুনী। গাছটির কোনো অর্থকরী ব্যবহার নেই।

রয়েল পাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আপন তরু। ঢাকায় ভিক্টোরিয়া পার্কে একদা এই পামের অত্যন্ত সুদৃশ্য একটি বীথি ছিল। এখন নেই। বর্তমানে সদরঘাটের বুড়িগঙ্গার তীর, বৃটিশ

কাউন্সিল এবং বেলী রোডে এই পাম কিছু কিছু চোখে পড়ে। রয়স্টনিয়া একটি স্মারক নাম। রিজিয়া অর্থ রাজকীয়। বলা বাহুল্য, নামের এই অংশটি গাছের আভিজাত্যেরই স্মারক।

বর্তমানে ঢাকায় সর্বত্র এই পাম চোখে পড়ে। রমনার কোণে, জাতীয় তিন নেতার মাজারের সামনে এই পামের একটি সুদৃশ্য বীথি আছে। শিক্ষাভবনের সামনেও এবং শেরে-বাংলা নগরে ও যন্ত্রতন্ত্র।

Family : *Palmae*. Sc. name : *Roystonea regia* O. F, Cook. Syn : Oreodoxa regia kunth. English : Royal Palm, Bottle Palm, Mauntain glory. Place : British council campus (1965).

বনসুপারি

ক্যারিওটা ইউরেন্স

'কত ভোরে দুপহরে সন্ধ্যায় দেখি নীল সুপুরীর বন
বাতাসে কাঁপিছে ধীরে খাঁচার শুকের মত গাহিতেছে গান।'

জীবনানন্দ দাস

বিরাট পাম। কাণ্ডদৈর্ঘ্য ৫০´, ব্যাস ২´। পত্র দ্বিপক্ষল, ১৮´—২০ × ১০´ — ১২´´। পত্রিকা ত্রিভুজাকৃতি, ৪´´ — ৮´´ দীর্ঘ, দন্তর-প্রান্তিক কিংবা তরঙ্গিত। পুষ্পমঞ্জরি বিশাল, বহুশাখী, ঝুলন্ত। প্রতি গুচ্ছের মধ্যবর্তীটি স্ত্রীপুষ্প এবং পার্শ্ববর্তী দুটি পুংপুষ্প। পুংপুষ্পের দৈর্ঘ্য $\frac{১}{২}$´´, পরাগকেশর সংখ্যা ৪০। ফল গোল, $\frac{২}{৩}$ — $\frac{৩}{৪}$´´, ১ ২ বীজীয়।

বনসুপারির কান্ড অন্য পামের মতই নিশাখ, সরল, উন্নত, গোল ও পত্রভিত্তিচিহ্নিত হলেও পত্রের বিন্যাস ও প্রকৃতি সমগোত্রীয়দের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। নারকেলের মতই তার যৌগিক পত্র বিশাল, পত্রাক্ষ প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে ঘূর্ণিত, কিন্তু দ্বিপক্ষল এবং পত্রাগুলি শুধু শীর্ষেই গুচ্ছবদ্ধ নয়, নিচেও অনেকটা নামানো। পত্রিকার ত্রিভূজাকৃতি গড়ন এই গোষ্ঠীতে ওর এক বিশেষ ব্যতিক্রম। তবুপরি বনসুপারির ঘোড়ার লেজের মতো বিশাল দীর্ঘ মঞ্জরিও ব্যতিক্রমী বৈকি। প্রতিটি মঞ্জরির ওজন একাধিক মণ হতে পারে। ফুল মৃদু-রক্তিম ও একলিঙ্গিক। স্ত্রী-ফুল দুটি পুংফুলের সঙ্গে একত্র গুচ্ছবদ্ধ হয়ে মঞ্জরিদণ্ডে ছড়ান থাকে। গ্রীষ্ম প্রস্ফুটনের কাল। ফুলেরা গোল এবং সংখ্যায় ফলের মতই অগণিত।

এই গাছের আঁশ থেকে ব্রাস, দড়ি ও বুড়ি তৈরি হয়। কান্ডের নরম শাঁস সাগুর মতই সুস্বাদু ও সুখাদ্য। বনসুপারির মাথার কচি পাতা সুস্বাদু সব্জি। মঞ্জরি থেকে সংগৃহীত তাড়ি উত্তেজক পানীয় ও রেচক। কঠিন ও কালচে বীজ অবসন্নতা ও তৃষ্ণা নিবারক এবং সুপারির বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার্য। বনসুপারি কাঠবিড়ালী ও বনবিড়ালীর অত্যন্ত প্রিয়।

ভারত-বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চল এই পামের আদিভূমি। ঢাকায় গভর্নর হাউসের দক্ষিণ পার্শ্বে বনসুপারির একটি গাছ পথিকের নজর কাড়ে। 'ক্যারিওটা' গ্রিক শব্দ, অর্থ কঠিন ফল। ইউরেন্স লাতিন শব্দ, অর্থ জ্বালাকারী। ফলের রোম বিচুটির ন্যায় প্রদাহী বিধায় ইউরেন্স অবশ্যই সার্থক নামকরণ।

বনসুপারি অন্যতম সুদৃশ্য পাম। ঢাকায় ইদানীং যথেষ্ট রোপিত হয়েছে।

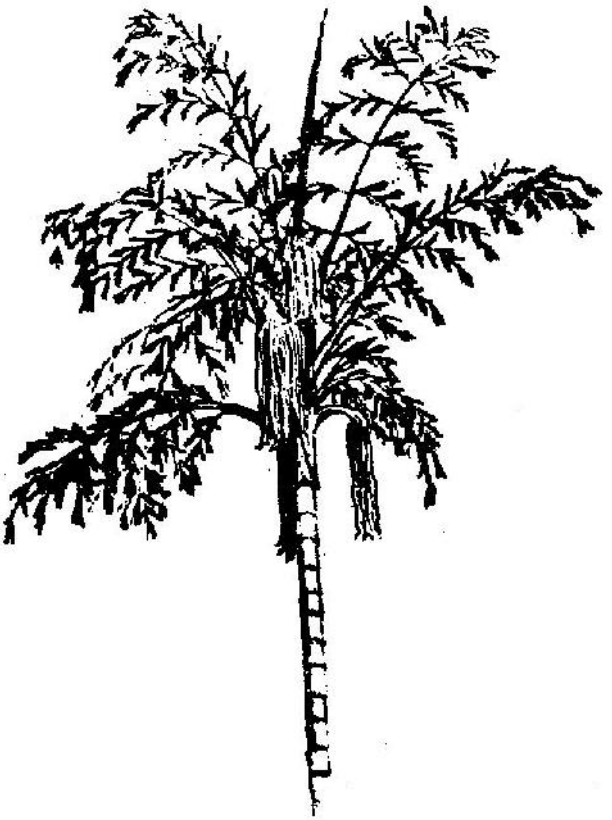

মানিকমিয়া এ্যাভিনুতে এই পামের একটি সুদৃশ্য বীথি আছে। পার্করোডে রমনা বাগানের কিনারেও অনেকগুলি গাছ চোখে পড়ে।

Family : *Palmae*. Sc. name : *Caryota urens* Linn. Bengali : Bansupari, Chawar (Sylhet). Hindi : Mari, Marikajheed. English : Fishtail palm. Place : Near Southern gate of Govt. house (1965).

তাল

বোরাস্যাস্ ফ্লেবিফের

'বাপে লাগায়
পুতে চায়
তার পুতে খায় বা না খায়।'

খনার বচন

কাণ্ড সরল, উন্নত, গোলাকৃতি, নিশাখ, পত্রভিত্তিতে চক্রাকারে চিহ্নিত, গাঢ়-ধূসর অমসৃণ এবং ৬০´ ১০০´ দীর্ঘ। ভূসংলগ্ন কাণ্ডের ব্যাস ২´—৩´ শিকড় গোড়ায় স্তূপাকারে ঘনবদ্ধ। পত্রবৃন্ত ২´—৪´ দীর্ঘ, প্রশস্ত, ত্রকচ। ফলক ৬০—৮০টি পত্রিকার সমাহার, প্রায় গোলাকৃতি। ফলকাগ্র বিমুণ্ড, বিকীর্ণ। তাল দ্বিবাসী। পুং ও স্ত্রী গাছ স্বতন্ত্র। স্ত্রীপুষ্প অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, প্রায় ১´ প্রশস্ত এবং শাখান্বিত মঞ্জরিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ফল গোলাকৃতি, প্রায় ৬´ চওড়া, গাঢ়-বাদামী।

তাল আমাদের বৃহত্তম পাম। বলিষ্ঠ, উন্নত কাণ্ডের মাথায় গুচ্ছবদ্ধ পাতার অধিকাংশই ঊর্ধ্বে উৎক্ষীপ্ত। গাঢ়-ধূসর প্রচণ্ড বলিষ্ঠ কাণ্ড, ম্লান-সবুজ বিশাল পত্রের আকর্ষণীয় বিন্যাস এবং পত্র-মর্মরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড়। তাল-তমাল আচ্ছাদিত বনভূমির প্রতি একদা আমাদের কবিকুলের অতিরিক্ত অনুরাগ ছিল যা একালেও নিঃশেষিত হয় নি। তাল, নারকেল, খেজুরে ভরা গ্রামবাংলার ছবিটি শুভ ও সৌন্দর্যের আকর।

এ তরু দীর্ঘজীবী, অবশ্য বৃদ্ধিও অত্যন্ত ধীর। ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের আগে সাধারণত তাল ফলবতী হয় না। গ্রথন অত্যন্ত দৃঢ় এবং এজন্য ঝড় প্রতিরোধের ক্ষমতা সমধিক।

প্রস্ফুটনের কাল ব্যতীত স্ত্রী ও পুরুষ গাছের পার্থক্য নির্ণয় অসম্ভব। পুংপুষ্পের দীর্ঘ, গোলাকৃতি শাখায়িত মঞ্জরি 'তালের জটা' নামে পরিচিত। এই জটা থেকে রস সংগ্রহের রেওয়াজ আছে। ম্লান-হলুদ পুংফুলেরা অত্যন্ত ছোট এবং স্থূল মঞ্জরি-অক্ষের গভীরে প্রায় অদৃশ্য থাকে। রেণু বায়ুবাহী, দূরগামী। স্ত্রী-তরুর অব্যর্থ অভিসারে তাদের পক্ষে এ অভিযোজনা বড়ই জরুরী। স্ত্রী-ফুলের আয়তন ও সজ্জা অধিকতর আকর্ষণীয়। বসন্তের শেষ প্রস্ফুটনের কাল। ফলবতী তালের প্রাচুর্য তুলনাহীন। শীর্ষস্থ পত্রস্তবকের প্রান্ত থেকে ঝুলন্ত বিরাট ফলের এমন উচ্ছ্রয় শুধু পামগোত্রেই সম্ভব। গ্রীষ্ম তাল পাকার সময়। ঘন

ছোবড়ায় জড়ানো লৌহকঠিন তালবীজ দুর্ভেদ্য। রস ঘন, মধুর ও সুগন্ধি। পাকা তালের সুগন্ধের মাধুর্য তুলনাহীন। ব্যবহারিক বিচারে পামগোত্রীয় তরুকুলের মধ্যে নারকেলের পরেই তালের স্থান।

তামিল কবিতা 'তাল বিলাসম'-এ তালের আটশো-একটি ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। তরুর উপযোগিতায় এই তালিকা-দৈর্ঘ্য নিঃসন্দেহে নজীরবিহীন। বলাবাহুল্য অধুনা আবিষ্কৃত তালের বহু ব্যবহার সম্পর্কে সেই প্রাচীন কবি অবশ্যই অবহিত ছিলেন না।

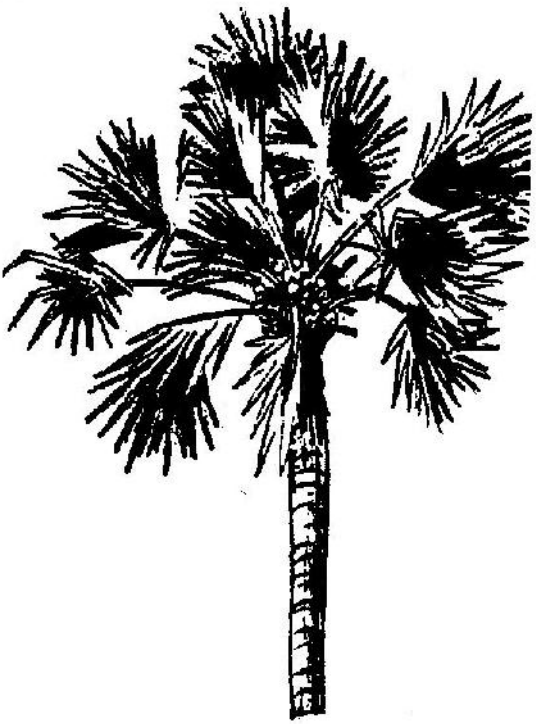

তাই তালিকাটি আজ দীর্ঘতর হতে পারে। তালের তাড়ির ব্যবহার অপ্রচলিত নয়। রস থেকে তৈরি মিশ্রী সুস্বাদু এবং ঔষধ হিসেবেও ব্যবহার্য। সিরক, কাসুন্দি ও আচারের উপকরণ। কচি তালের শাঁস সুস্বাদু। পাকা তালের রস থেকে তৈরি পিঠা ও মিষ্টির আদর সমধিক। বীজের শাঁস ও ভ্রূন শিশুদের খুবই প্রিয়।

তালপাতার টুপি, ঝুড়ি, পাখা, চাটাই, মাদুর, ছাতা, কাঠ থেকে তৈরি ঘরের কড়ি-বরগা, খেলনা, ছাতির বাট, লাঠি, বাক্স এবং আঁশ থেকে তৈরি ব্রাস ও পা-পোশের প্রচলন এদেশে ও বিদেশে বহুব্যাপ্ত। তাল-'কয়ের' রপ্তানীযোগ্য পণ্য। পুরুষ গাছের চেয়ে স্ত্রী গাছের কাঠ দীর্ঘস্থায়ী ও উৎকৃষ্টতর। একশো বছরেও নাকি এ কাঠ ক্ষয় হয় না।

তালের রস হজমী ও উত্তেজক। প্রাচীনকালে যখন ভূর্জপত্রে শ্লোক রচিত হতো, তখন বিকল্প হিসেবে তালপাতার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এজন্যই হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে গাছটি পবিত্র। হাতে-খড়িতে একালেও তালপাতা ব্যবহৃত। এ-গাছ বহু পশুপক্ষীর আশ্রয়। বাদুর, ইঁদুর, বনবিড়াল, চামচিকে, তক্ষক, টিকটিকির বাসের পক্ষে ওর নিবিড় পত্রগুচ্ছ আদর্শ। বাবুই পাখির শিল্প-নৈপুণ্যের প্রতীক তার বাসা তাল পাতার আঁশ থেকেই মূলত তৈরি।

তালের আদি নিবাস আফ্রিকা, তবু এদেশেও প্রসার ঘটেছে বহু আগে। ঢাকায় তাল প্রায়ই চোখে পড়ে। পি. জি. হাসপাতাল অঞ্চলে এবং নটরড্যাম কলেজের কাছে তালগাছের সংখ্যা কম নয়। অনেকগুলি তালগাছ চোখে পড়ে ঢাকা গেট পেরিয়ে জনপথের বাঁ-পাশে উত্তরায়।

বরাস্যাস তালের বিশেষ অংশের গ্রিক নাম। 'ফ্লবলিফার' লাতিন শব্দ, অর্থ পক্ষধর, পাতার আকৃতির জন্য এই নামকরণ।

Family : *Palmae*. Sc. name : *Borassus flabellifer* Linn. Syn. : *B. flabelliformis* Roxb. Bengali : Tal. Hindi : Tal. Tarkajhar. Urdu : Tad. English : Palmyra Palm. Place : Near P. G. Hospital (1965).

লিভিস্টোনা চাইনেন্সিস্

'ব্যাসমতি ধানক্ষেত ছেড়ে দিয়ে মালাবারে
উটির পর্বতে
যাব নাকো, দেখিব না পামগাছ মাথা নাড়ে,
সমুদ্রের গানে।'

জীবনানন্দ দাশ

কাণ্ড সরল, উন্নত, নিশাখ, প্রায় ৩০ দীর্ঘ। পত্রের প্রান্তস্থ বিমুক্ত ফলক দ্বিধাবিভক্ত, আনত। পত্র ব্যাস প্রায় ৪ এবং ঝুলন্ত পত্রিকাপ্রান্ত প্রায় ১ দীর্ঘ। পত্রবৃন্ত ৪ কিংবা দীর্ঘতর। বৃন্তের দুপাশ তালের মতই ক্রকচ। ফুল দ্বি-লিঙ্গিক, ম্লান-সবুজ। ফল গোল, প্রায় ১" চওড়া; রং প্রথমে সবুজ, পরে হলুদ এবং সবশেষে বেগুনী।

পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার) দক্ষিণ পাশের দেয়ালের খুব কাছের পামকুঞ্জটি বড়ই দৃষ্টি-নন্দন। সীমিত আয়তন এবং বিরাট নিবিড় পত্রের বিক্ষেপে সে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এজন্য ঢাকায় বহু বাগানেই এ সুদৃশ্য তরুটি চোখে পড়ে।

প্রথম দৃষ্টিতে একে একটি ছোট্ট তাল গাছ বলেই মনে হয়। কিন্তু কান্ডের ব্যাস তালের চেয়ে অনেকটা ছোট। পত্রিকার গঠন তালের মতো, তবু তালপাতার শেষ প্রান্ত যেখানে দৃঢ় ও বিকীর্ণ, এর পত্রিকাপ্রান্ত সেখানে আনত, ঝুলন্ত। পাতার এই একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যেই একে তাল থেকে আলাদা করা সহজ।

এই পাম দ্বিবাসী নয়। ফুল দ্বি-লিঙ্গিক। মঞ্জরি পাম-মঞ্জরির সাধারণ বৈশিষ্ট্যেরই অনুসারী। ফুলেরা অত্যন্ত ছোট, ম্লান-সবুজ। গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রস্ফুটনের কাল। পাকা ফল গাঢ়-বেগুনী।

অন্য পামের মতই এর বৃদ্ধিও মন্থর। অনেক দিন এ-গাছ টবে রাখা যায়। আদি নিবাস দক্ষিণ চিন। কিন্তু ইদানীং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্রই পালিত তরু হিসেবে বাড়বাড়ন্ত। লিভিস্টোনা নাম এডিনবরা বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড লিভিস্টোনের স্মারক। চাইনেন্সিস্ অর্থ চৈনিক।

এর আরেকটি অন্তরঙ্গ প্রজাতি ঢাকায় বৈবাৎ চোখে পড়ে। নাম 'লিভিস্টোনা রটুন্ডিফলিয়া'। কান্ড ৫০ ফুট অবধি উঁচু এবং পত্রান্তের বিমুক্ত পত্রিকাসমূহ আনত নয়,

তালের মতই সরল, দৃঢ় বিকীর্ণ। প্রেস ক্লাবের পূব পাশে এই দুটি প্রজাতিই অন্য গাছপালার ভীড়ে লুকিয়ে আছে। আদিস্থান মলয় ও ফিলিপাইন। 'রটুন্ডিফলিয়া' গোলাকৃতি পত্রের লাতিন প্রতিশব্দ। কোনো অর্থকরী ব্যবহার জানা নেই।

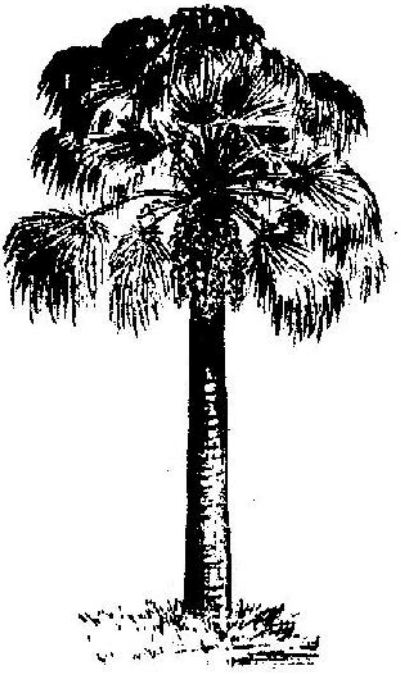

Family : *Palmae.* 1. Sc. name : *Livistona chinensis* R. Brown. Syn. *L. Mauritiana* Walt. English : China palm. (Europe) Place : Public Library Campus. 2. Sc. Name : *Livistona rutundifolia* Mart. China palm (1965).

লিউকানা লিউকসেফালা

'কুসুম-ভরে নব-পল্লব দোল।
মধু পিবি মধুকরী মধুকর রোল॥

বলরাম দাস

ক্ষুদ্র বৃক্ষ, নিষ্কন্টক। পত্র দ্বিপক্ষল ৩"—৭" লম্বা, পক্ষসংখ্যা ৮—১৬, ৩"
লম্বা ; পত্রিকা-সংখ্যা ২০—৩০, রৈখিক, তোখাল, চার্ম, আশুপাতী, ফিকে সবুজ,
সূক্ষ্ম-রোঁয়াযুক্ত, প্রায় ১/২" লম্বা। মঞ্জরি মুণ্ডক, সবৃন্তক, একক বা সজোড়, প্রায় ১"
চওড়া, হালকা হলুদ ফুলের ঘনবদ্ধ পিণ্ড। দল ১/৮" লম্বা। পুংকেশর ১০, মুক্ত, প্রায়
১/৪" লম্বা। ফল চ্যাপ্টা, মসৃণ, বাদামী, ৫"—৬" লম্বা, প্রায় ১/২" চওড়া।
বীজসংখ্যা ১৫—২০, মসুরাকার, উজ্জ্বল।

কয়েক বছর আগে আমাদের দেশে ইপিল ইপিল লাগানোর ধুম পড়ে গিয়েছিল এবং এই
দ্রুত-বর্ধনশীল গাছে আমাদের জ্বালানী সমস্যার সমাধান বাতলান হচ্ছিল। সম্ভবত
ফিলিপাইন বা ওই এলাকার কোনো দেশের দৃষ্টান্ত। অথচ গাছটি আছে আমাদের দেশে
বহুকাল, ছেলেবেলায় দেখেছি আপন ভিটেয়, অবশ্যই কোনো বাংলা নাম আছে, ভুলবশত
তখন কেলিকদম বলেই জানতাম, আসলে কেলিকদম কদমের ঘনিষ্ঠ, লাতিন নাম
ৃডইনঅ চওরড ইওেলইঅ ওওক, ইপিল ইপিল থেকে বংশসূত্রে দূরস্থ।

গাছটি ছোটখাটো, শরীরটা মসৃণ, হালকা বাদামী-ধূসর, ডালগুলি লম্বা ও ছিপছিপে,
গজায় কাণ্ডের প্রায় গোড়া থেকে। পাতা যৌগিক, কৃষ্ণচূড়ার মতন, তবে পত্রিকাগুলি সরু
সরু এবং গাছের সীমিত গড়নের সঙ্গে এই পত্রসজ্জা চমৎকার মানানসই, বেশ কারুকার্যময়
ও কোমল। সরু সরু পত্রিকাগুলি ফিকে সবুজ বা ধূসর। পাতার গোড়া থেকে ডাঁটার ওপর
একক বা সজোড় গোল গোল হালকা সুগন্ধী মুণ্ডক মঞ্জরী ফোটে বসন্তে ও শরতে।
এগুলোতে ঠাসা শাখান্তে সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ছোট ছোট ফুল বা ফুলকণা। শিমের
মতো চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে গাছ ভরে যায়। শুরুতে সবুজ, পাকলে বাদামী।

গাছের সাদা ও শক্ত কাঠের কোনো দারুমূল্য নেই। ফল দিয়ে নকশী ঝুড়ি বানান যায়।
কোথাও কোথাও ছাল ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও আসলে গাছটির কোনো ভেষজমূল্য
নেই। কচি ফল সব্জি এবং পাতা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহারের রেওয়াজ আছে।

গাছটির আদিনিবাস উষ্ণমণ্ডলীয় আমেরিকা। ভারত উপমহাদেশে ফুলগাছ ও ক্ষেতে ছায়াতরু হিসাবেই ব্যবহৃত। ঢাকায় নানা জায়গায়ই এখন চোখে পড়ে। রোকেয়া হলের উল্টোদিকে পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে একটি বড় গাছ আছে। অনেকগুলি রয়েছে বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের সামনে।

নামের প্রথম অংশ গ্রীক, অর্থ সাদাটে, শেষাংশ লাতিন, সেটিও সমার্থক।

Leucaena leucocephala (Lam.) de wit. Syn. : *L. glance* Benth.
Fam.: *Minosae*, Eng. name : Hosse tamarind, white babool.

চিনে-বেরি

মুন্টিংগা ক্যালাবুরা

'ও যে চেরি-ফুল তব বনবিহারিনী!'

রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুদ্রাকার বৃক্ষ। শাখা এলান, রোমশ। পত্র একক, একান্তর, ভল্লাকার, প্রায় ৩″ লম্বা। আগা সরু, সূক্ষ্মকোণী, পত্রতল রোমশ, ঈষৎ রুপালী। বৃন্ত $\frac{1}{4}$″ লম্বা। ফুল একক, কক্ষিক, প্রায় ১″ চওড়া, বৃন্ত ১″। বৃত্যংশ ৫, মুক্ত, সরু ও লম্বাটে, $\frac{1}{2}$″ লম্বা। পাপড়ি ৫ $\frac{1}{2}$″ লম্বা, চ্যাপ্টা, সাদা। পুংকেশর অজস্র ; গর্ভাশয় গোলাকার, মসৃণ, গর্ভদণ্ড ১, গর্ভমুক্ত ৫-খণ্ড। ফল রসাল, গোলাকার বা ডিম্বাকার, $\frac{1}{2}$″ লম্বা, পাকা ফল গোলাপী। বীজ সূক্ষ্ম, অসংখ্য।

রবীন্দ্রনাথ যে-চেরির কথা লিখেছেন সে তো ভুবনমনমোহিনী জাপানী কুসুম, গোলাপগোত্রের বরবর্ণিনী, লাতিন নাম করতনতস ১এরওসওইডএস। আমাদের আলোচ্য বৃক্ষটি সেই তুলনায় ফেলনা, ফলের সঙ্গে সাদৃশ্যজনিত কারণেই সম্ভবত এমন দুর্লভ সম্মানভোগী, নইলে বংশসূত্রেও দূরস্থ, সে পাটগোত্রীয়। আমেরিকার উষ্ণমণ্ডলের এই প্রজাতিটির কখন কীভাবে বঙ্গভূমে প্রবেশ সেই তথ্য আমাদের অজানা। তবে সে কোনো ব্যতিক্রম নয়, ওই অঞ্চল থেকে এদেশে এমন অনুপ্রবেশকারী বৃক্ষ-লতা-গুল্ম অঢেল। পথেঘাটে, বনেবাদাড়ে লাল বেগুনি হলদে সরু সরু ফুলের থোকা থোকা মঞ্জরিধর ঝোপাল আগাছার সামান্য কাঁটাওয়ালা যে ঝাড় দেখি সেই লান্টানাও তো ওই আমেরিকার। আমাদের প্রিয় কাঠগোলাপ, যা পূজা-আর্চায় সমাদৃত, আর বাগানবিলাস, যাকে ছাড়া বাগানই হয় না, তারাও পরদেশী, ওই অঞ্চলের আদিবাসিন্দা। বেনথল সাহেবের কলকাতার বৃক্ষসংহিতায় চিনে-চেরির সাম্প্রতিক আগমনের কথা উল্লিখিত হলেও ইতোমধ্যে বইটির বয়স পেরিয়ে গেছে অর্ধশতক, বৃক্ষটির অবশ্যই আরও বেশি, হতে পারে শতবর্ষ। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে চিনে-চেরি প্রথম দেখি বরিশালে, বরেণ্য চিকিৎসক-নিসর্গী ডা: এম. আহমদের বাড়িতে। ছোটখাটো গাছ, বড়ই দৃষ্টিনন্দন গড়ন, ডালপালা নুয়ে পড়ে কখনও মাটি ছুঁয়ে, যেন ঘোমটা-পরা লজ্জাবতী নববধূ। পাতাগুলি লম্বা লম্বা, অনেকটা পাট-পাতার মতনই। সরু সরু ডালে গাছের সবুজ জমিনে ছড়ানো ছিটানো সাদা সাদা ফোঁটার মতন ফুল ছোট হলেও চোখে পড়ে বৈকি। এতটুকু

ফুলের পাপড়ি আর কতটুকুই হবে, পক্ষ্মা পালকের মতো। গোল গোল ছোট ফলে গাছ ভরে থাকে, সবুজ বলে কাঁচা অবস্থায় পাতার ভিড়ে লুকিয়ে থাকে, পাকলে গোলাপী বা লাল, রসাল ও সুস্বাদু, একটা সুগন্ধও আছে, ক্ষীরের কাছাকাছি বীজ খুব ছোট, সুজির দানার মতো, ফলের নরম শাঁসে ঠাসা। চারা জন্মে সহজেই, বাড়েও দ্রুত।

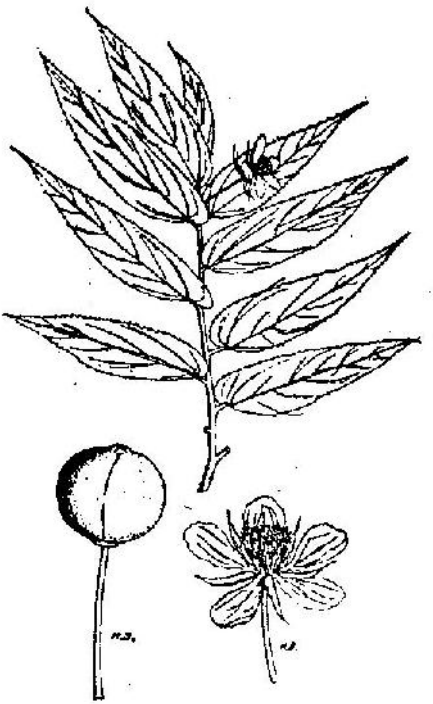

ডাঃ আহমদের কাছ থেকে একটি চারা এনে বরিশালে আমাদের বাসায় লাগাই। এক বছরের মধ্যেই ডালপালার পেখম মেলে সে বড় হয়ে ওঠে, লনের একটা কোণ ভরে ফেলে, ফুলও ফোটায়। ফল পাকলে নানা জাতের পাখিরা সেখানে ভিড় জমায়—বিশেষত বুলবুলিরা। বহু বছর বেঁচেছিল, আরও কতবছর বাঁচত কে জানে। একাত্তরের সংগ্রামের দিনে ওই পড়োবাড়িতে রাজাকাররা আস্তানা গাড়লে বাগানের অন্যান্য গাছপালার সঙ্গে ওটিও খতম হয়। লনেই ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিল ওরা। ষাটের দশকের মাঝামাঝি আমরা ঢাকার নটেরডেম কলেজে অনেকগুলি চিনে–চেরি লাগাই। পুরো একটি লাইন। আরামবাগের ছেলেরা রোজ বিকালে গাছের তলায় ফলের লোভে জটলা করত। এ থেকে, আমার অনুমান, গোটা কলেজের যাবতীয় গাছগাছালির উপর তাদের একটা মমত্ব জন্মে গিয়েছিল। তারা ফুল ছিঁড়ত না, ডাল ভাঙত না। গাছগুলো এখন আর বেঁচে নেই। ঢাকার প্রবল বন্যার সময় জলাবদ্ধতায় মারা গেছে। অনেক খুঁজেছি, তবু শহরে কোথাও গাছটি দেখছি না। নিশ্চয়ই কারও ব্যক্তিগত বাগানে আছে।

বীজ ছাড়াও গাছের গোড়া থেকেও মাঝেমধ্যে চারা গজায়। ডাল থেকে কলম করাও চলে। জনপথের পাশে বৃক্ষরোপণে ভরাট (হেলল্এর) হিসাবে এবং গ্রামীন বনায়নে শিশুদের তুষ্টি এবং শহরে পাখিদের আহার যোগানোর জন্য গাছটি অবশ্যই রোপণীয়। এই সঙ্গে আরেকটি গাছের কথাও বিবেচ্য, সিলেটের স্থানীয় নাম পিচণ্ডি, চিনে–চেরি ও ফলসার (ঘরএ্যইঅ সতবইনঅএদতঅলইস চছ) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, লাতিন নাম হইচরওচওস পঅনইচতলঅটঅ ৎ, ঢাকায়ও জন্মে, বুনো গাছ, ফলও ফলসার মতোই, টক–মিষ্টি, মুখরোচক, কিশোর ও বিহঙ্গকুলের প্রিয়

চিনে-চেরির জ্যাম চীন দেশে ব্যাপক প্রচলিত। গাছের পাতা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চা'য়ের সঙ্গে মিশেল হিসাবে ব্যবহারের রেওয়াজ আছে।

নামের প্রথমাংশ মুনটিং (১৬২৬—৮৩) নামের জার্মান চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিদের স্মারক, ক্যালাবুরা ও গাছটির ওয়েস্ট-ইণ্ডীয় নাম।

Muntinga calabura L. Fam. : *Tiliaceae*. Eng. name : Chinese cherry.

বাওবাব

অ্যাডান্‌সোনিয়া ডিজিটাটা

'ছোট রাজকুমারের আবাস, তার গ্রহে কিছু কিছু ভয়ঙ্কর বীজও উড়ে আসত, আর ওগুলি বাওবাব গাছের। গোটা গ্রহটি তাতে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। বাওবাব এমন জিনিস তাকে তড়িঘড়ি উপড়ে না ফেললে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। পুরো গ্রহটাই সে দখল করে। শিকড়গুলো বেমালুম ঢুকে পড়ে মাটি খুঁড়ে। গ্রহটি ছোটখাটো হলে আর তাতে অঢেল বাওবাব গজালে তাকে ওরা ছিড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।'

আতোয়াঁ সাঁ-এক্সুপেরি

(ছোট্ট রাজকুমার)

বৃক্ষ ; কাণ্ড খাটো পুরুষ্টু ; পত্র যৌগিক, করতলাকার ; পত্রিকা ৫ বা ৭ ; ভল্লাকার, তলদেশ পালকস্নায় ; ফুল একক, কাক্ষিক, দীর্ঘবৃন্ত, ঝুলন্ত ; বৃতি যুক্ত, বাটিবৎ, ৫-খণ্ড ; পাপড়ি ৫, সাদা, পরাগদণ্ডে সাঁধা ; যুক্ত-পরাগদণ্ড খাটো, বেলনাকার, নিচে বহুধাবিভক্ত ; গর্ভকোষ ৫-১০ বিভক্ত, গর্ভদণ্ড দীর্ঘ, বহির্গত, গর্ভমুণ্ড ছড়ান, ফল বৃহৎ, আয়তাকার, দারুময়, অবিদারী, শাঁসাল ; বীজ বৃক্কাকৃতি, বাদামী, কঠিন ও উজ্জ্বল।

না, আমাদের গ্রহটি ছোট রাজকুমারের গ্রহাণুর মতো ততটা ছোট নয়। তাকে ছিড়েখুঁড়ে ফেলার মতো মূলশক্তি বাওবাবের নেই, তাই নির্দ্বিধায় এখানে বাওবাব লাগানো যায়। ওরা আফ্রিকায় অঢেল, ছায়াছবিতে ওই মহাদেশের নিসর্গদৃশ্যে বৃক্ষটি প্রায়ই চোখে পড়ে, দারুণ সুশ্রী না হলেও গড়নে আকৃষ্টকর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বাওবাবের গোড়ার দিকটা খুবই চওড়া, তারপর কাণ্ড হঠাৎ সরু হয়ে যায় বলে গাছটাকে কেমন গাট্টাগোট্টা বামনের মতো দেখায়। এই জাতের গাছ খুব দীর্ঘজীবী, হাজার বছরেরও অধিককাল পরমায়ু। আর গোড়াটা ৪০ ফিট পর্যন্ত চওড়া না হওয়া পর্যন্ত বাড়ে ক্রমাগত। আফ্রিকার মরুপ্রায় অঞ্চলেও বাওবাব ভালই টেকে, বয়স্ক গাছের মধ্যিখানে এক সময় খোড়ল দেখা দেয়, সেগুলি প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে, তাতে জল জমে, এবং কোনো কোনোটিতে ২৫০ গ্যালন পর্যন্ত

বুড়ো বাওবাব শুকনো দিনে জলাভাব মেটায়। সরু হয়ে ওঠা কাণ্ড থেকে আনুভূমিকভাবে ছড়ান লম্বা লম্বা ডালের সবুজ গাছটিকে ব্যাঙের ছাতার মতো লাগে। লম্বা বোঁটার মাথায় ৫–৭ ভল্লকাকার পত্রিকার কুণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যে এটি শিমুলের খুবই ঘনিষ্ঠ। গাছটি পত্রমোচী, শীতে উদোম হয়ে পড়ে। নতুন পাতা গজায় মে মাসে আর ফুল ফোটে জুন–জুলাইতে।

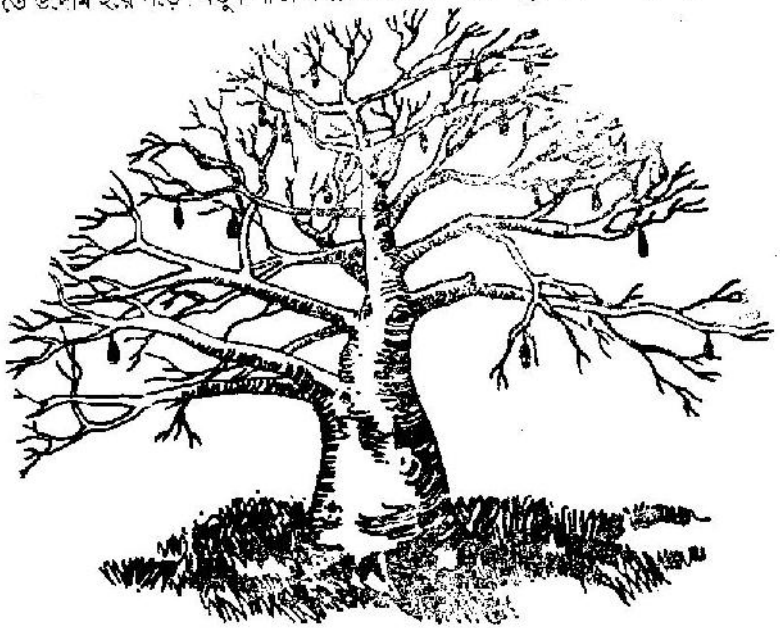

সাদা বড় বড় ফুল একে একে ঝুলে ঝুলে থাকে শাখান্তে, ফোটে রাতের বেলায়, অবশ্য দিনেও বুজে যায় না। পাঁচটি পাপড়ি ওপরের দিকে উঠতে থাকে বলে যুক্ত পরাগদণ্ড নিচের দিকে ঝোলে, মাথায় থাকে গোলাকার ঘনবদ্ধ একগুচ্ছ সোনালী পরাগধানী, আর সেটি ভেদ করে বেরোয় শলাকার মতো একক গর্ভদণ্ডটি। লম্বা লম্বা ডাটায় ঝুলন্ত বেলনাকার সবুজ বা হাল্কা বাদামী বড় বড় ফলগুলি বড়ই ব্যতিক্রমী। শাঁসাল এই ফলে সীমবীজের গড়নের বাদামী রঙের বেশ কিছু বীজ থাকে।

শুকনো ফল মাছ-ধরা জালের কিনারে সোলাখণ্ডের মতো ব্যবহৃত হয়। শাঁস দিয়ে তৈরি টক পানীয় ক্লান্তিহর। বাকলের আঁশের দড়ি অত্যন্ত মজবুত, তাতে নাকি হাতিও বেঁধে রাখা যায়। কাঠ নরম, ভুসভুসে হলেও ভেলা তৈরির উপযোগী। ফলের আবার ভেষজগুণও আছে : পৈত্তিক পীড়া, অম্লাশয় ও জ্বরনাশী। পাতা আর ছালেরও অভিন্ন গুণ। বাওবাবের সেদ্ধ বীজের গুঁড়া দন্তশূলেও উপকারী। কোনো কোনো আফ্রিকীয় জাতির মধ্যে মৃতদেহ শুকানোর জন্য সেটা বাওবাব গাছের খোড়লে রাখার রেওয়াজ আছে।

উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকার এই বৃক্ষপ্রজাতিটি আরব বণিকদের সৌজন্যে এক সময় শ্রীলংকা ও ভারতে পৌঁছে। গাছটি ইতোমধ্যে উষ্ণমণ্ডলে, বিশেষত শুষ্ক এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে গেছে। ঢাকার নীলক্ষেতে নাকি একটি বাওবাব ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ভবন নির্মাণের সময় কাটা পড়ে। বলধা বাগানের গাছটি ঝড়ে ধরাশায়ী হয়েও কিছুদিন টিকে ছিল।

অ্যাডানসোনিয়া নামটি প্রখ্যাত ফরাসী উদ্ভিদবিদ অ্যাদন-এর স্মৃতিবহ, ডিজিটাটা—অর্থ করতলাকার, পাতার বৈশিষ্ট্যেই অর্থবহ।

ঢাকায় কোনো পার্কে অন্তত দু'একটি বাওবাব লাগান দরকার।

Adansonia digitata Linn. Fam. : *Bombacaceae,* Hindi : Gorakmali. Eng. Boabab, African : sour gourd.

শাল

শোরিয়া রবস্টা

'প্রায় ত্রিশ বছর হল শান্তিনিকেতনের শালবীথিকায় আমার সেদিনকার এক কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সায়াহ্নে পায়চারি করেছি ... সেই আমাদের যত আলোকগুঞ্জরিত রাত্রি, আশ্রমবাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুলির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে। .... এই স্তব্ধ তরুশ্রেণীর প্রাচীন ছায়ায় সেই ধারা তেমন করে আরো অনেক বয়ে গেছে, আরো অনেক বইবে ... আমরা চলে যাব, কিন্তু কালে কালে বারে বারে বন্ধুসংগমের জন্য এই ছায়াতল রয়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাবছি—তেমনি ঐ শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসছে।'

রবীন্দ্রনাথ

বৃক্ষ, বৃহৎ কিংবা বিষ্টব্ধ, রজনযুক্ত ; পত্র একক, একান্তর, চার্ম ৬ ″–১৩ ″ × ৪ ″ – ৬ ″, বৃন্ত প্রায় ১ ″, উপপত্রিক, উপপত্র $\frac{1}{3}$ ″ রোমশ, বাঁকা ; মঞ্জরি কাক্ষিক বা শীর্ষস্থ, বৃহৎ, শাখায়িত, নিয়তাকার, ৫ ″ - ৯ ″ লম্বা, মখমলসদৃশ রোমাবৃত ; ফুল অবৃন্তকপ্রায় ; বৃতি যুক্ত, ৫–খণ্ড, নল অত্যন্ত খাটো, তিনটি বৃত্যংশ পরে ফলের সঙ্গে বিবর্ধিত ; পাপড়ি ৫, মুক্ত, প্রায় $\frac{1}{2}$ ″ লম্বা, ম্লান-হলুদ, চোখাল, শিরাচিহ্নিত ; পরাগকেশর ১৫– বহু, পরাগকোষ শ্মশ্রুল উপাঙ্গযুক্ত ; গর্ভকেশর ৩, যুক্ত, গর্ভাশয় রোমশ, ৩–কাক্ষিক, গর্ভমুণ্ড ৩, দন্তুর ; ফল শুষ্ক, পক্ষল, পক্ষ–৫, প্রায় ২ $\frac{1}{2}$ ″ লম্বা, শিরাচিহ্নিত, শিরাসংখ্যা ১০।

বিদেশ থেকে অনেকদিন পরে দেশে ফিরে ধানমণ্ডির একটি পাঁচতলা বাড়ির বারান্দা থেকে কালবোশেখির মাতম দেখছিলাম। গ্রীষ্মে ইউরোপের আকাশে মেঘের পর মেঘ জমলেও 'জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে' কোন ভৈরবের আগমন ঘটে না। শিহরিত হয় না গুরুগর্জনে কোন বার্চ-বন। বড়জোড় এক পশলা হালকা বৃষ্টি। দৈবাৎ অবোর বর্ষণ। প্রথম প্রথম আকাশে লীলাঞ্জন ছায়া দেখে ছুটে এসে বৃথাই জানালা বন্ধ করেছি। বহুদিন বাংলার কাল বৈশাখীর রুদ্ররূপ দেখি নি, বৃষ্টিতে ভিজিনি। তাই ছাদে মুক্ত আকাশের নিচে এসে

শ্যামলী নিসর্গ

দাঁড়ালাম। সারা ঢাকার শ্যামলী প্রচ্ছদ আলুথালু। দুলছে রক্তিম কৃষ্ণচূড়া, হলুদ পেল্টোফরাম, সবুজ শিরীষ। আর দুলছে বুর্ভর স্তনবতী নারকেল। মনে হল এত নারকেল আগে কখনও ঢাকায় দেখি নি। আরও মনে হল নারকেলের এই প্রাচুর্য ঢাকার নিসর্গের জন্মার্জিত স্বরূপটিই যেন পাল্টে দিয়েছে। দশ লক্ষ বছর আগের গঠিত মধুপুর-ভাওয়ালের লালমাটির আত্মজ যে ঋজু শালবৃক্ষ সেই তো ঢাকার নিসর্গের প্রতীক, সেখানে দ্বীপবাসী নমনীয় পেলব নারকেলকে বড়ই বেমানান মনে হল। অথচ ঢাকায় শাল গাছ দেখি

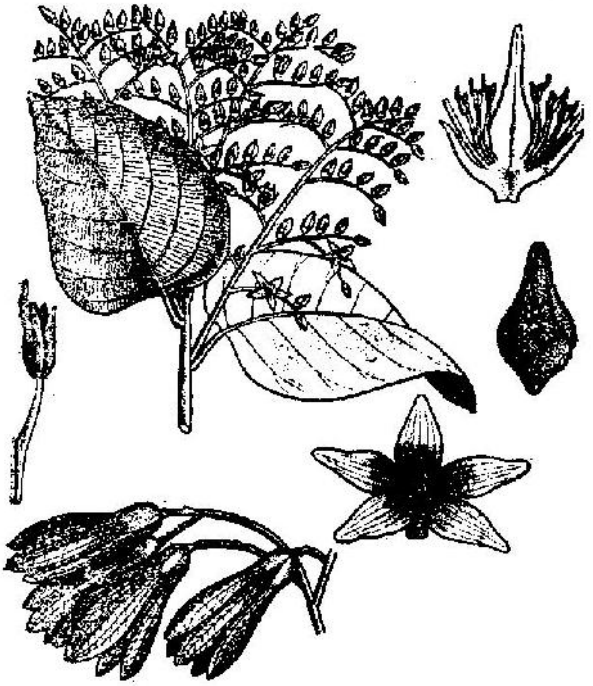

না। বিষয়টি ঢাকার উদ্যানকর্মীদের ভেবে দেখা দরকার। প্রাউডলক হয়ত এমন বিবেচনা থেকেই এই শহরে কোন পেলব গাছপালা লাগান নি, তাঁর রোপিত বৃক্ষরাজি সবই শালপ্রাংশু।

শালগাছ খুব লম্বা ও সরল ফাল্গুন ব্যতীত গোটা বছরই পাতা-ভরা। ছোট গাছের ছাল মসৃণ, বড় গাছের ছাল ফাটা-ফাটা। পাতা উজ্জ্বল সবুজ, বড়সড়, ৬″-১০″ × ৪″ - ৬″, গোড়ায় ডিম্বাকার, আগার দিকে ক্রমশ সরু। ফুল সাদা, কোমল, রোমশ। পাপড়ি ফিকে হলুদ, ½″ লম্বা ও সরু, বোটা সরু, লোমশ। মার্চ মাসে ফুল ফোটে। ফল শুষ্ক, পক্ষল,

১/২ " লম্বা। পাখনা সাধারণত পাঁচটি, ২—৩ " লম্বা, গোড়ার দিকে সরু, মাথা গোল, পাকা অবস্থায় ধূসর, অসমান, ১০—১২ সমান্তরাল শিরায় চিহ্নিত। ফলের সময় মে-জুন।

শালকাঠ মূল্যবান – শক্ত ও স্থায়ী। ঘরের খুঁটি ও রেলের স্লিপারে ব্যবহার্য। শাল-পাতা ঠোঙা হিসাবে বহুল ব্যবহৃত। গাছের আঠা (ধুনা) ধারক ও রক্ত আমাশয়ে (চিনির সঙ্গে মিশিয়ে সেব্য) উপকারী। বাজীকরণ ঔষধ হিসাবে ১০ রতি অতিসূক্ষ্ম এই ধুনা আধসের দুধের সঙ্গে পেয় । এই ধুনা পাইনের ধুনার সমতুল্য ও ধূপ হিসাবে সুগন্ধি।

শাল মধ্যভারতীয়, তবে বাংলাদেশের মধুপুর, ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গে জন্মে। ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে, জয়দেবপুরে, সাভারে শালগাছ দেখা যায়। মোটাসোটা, পেল্লায়। বাংলাদেশে শালকে গজারিও বলা হয়।

রবস্টা অর্থ শক্তসমর্থ।

Shorea robusta Gaertn, Fam. : *Dipterocarpaceae*, Beng. Shal, Gajari. Hindi : Shal. Eng. : Shal tree. Place : Jaydevpur, Savar.

স্কারলেট কর্ডিয়া

কর্ডিয়া সেবেস্তিনা

'সরস কুসুম সরস সুষম
সরস কাননে ভেলি ভূষণ।
রসে উনমত ঝঙ্কৃতি-কত
সরস ভ্রমর-পাঁতিয়া ॥

গোবর্দ্ধন

ক্ষুদ্রাকার বৃক্ষ ; পত্র একান্তর, ডিম্বাকৃতি বা উপবৃত্তাকার ; সাধারণত স্থূলকোণী, অমসৃণ, ৪ ″ — ৬ ″ লম্বা, পত্রনিম্ন শিরা প্রকট ; বৃন্ত প্রায় ১ ″ ; অনিয়ত মঞ্জরি অগ্রস্থ ; ফুল যুক্তদল ১½ ″ লম্বা, দলনলের উপর ছড়ান চ্যাপ্টা স্থূলকোণী পাপড়ি ৬—৭, গঢ় কমলা, পরাগকেশর ৫—১২, দলমধ্য ; গর্ভকেশর ১, যুক্ত ; ফল ডিম্বাকার, মাংসল, সাধারণত এক-বীজীয়, সাদা, ১½ ″ লম্বা, স্থায়ী বৃতিবেষ্টিত।

মস্কো-প্রবাসে স্থানীয় গাছপালার সঙ্গে পরিচয়ের আশায় বইপত্র কিনে বিস্তর পড়াশোনার পরও বিশেষ ফলোদয় হয় নি। ইউরোপের নিষ্ঠুর প্রকৃতি হঠাৎ বসন্ত-গ্রীষ্মে এমনই ঔদার্যময়ী হয়ে ওঠেন যে আমাদের মতো ষড়ঋতুর আশ্লেষে লালিত চিরসবুজ দেশের মানুষ তখন থৈ হারিয়ে ফেলে। কতসব ওষধি ও লতায় রঙবেরঙের ফুল ফোটে এবং তাও ছড়ান-ছিটান নয়, প্লাবনের মতো। অনেক কষ্টে বৃক্ষ ও গুল্মের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছিলাম, কেননা তারা সংখ্যায় অজস্র নয় ; কিন্তু অগণিত ওষধির বেলায় হাল ছেড়ে দিই। এদিকে দেশের গাছপালার নাম-নিশানাও যে ভুলতে বসেছি সেটা টের পেলাম নব্বুইতে দেশে ফিরে একদল উৎসাহী ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে রমনা পার্ক ও আশেপাশের এলাকায় একদিনের শিক্ষা-সফরে শরিক হয়ে। পার্কে কিছু বরাদ্দত গাছপালাও এতদিনে বৃক্ষসম, উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে সেগুলি একদা চিনতাম, কিন্তু দেখলাম বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বিহঙ্গকুলের হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালাসদৃশ জীবন গাছের (Trema orientalis B.) নামটি কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না। সে স্পষ্টতই বুনো, সঙ্গীরা তাই কিছুই মনে করে নি। কিন্তু ঢাকা ক্লাবের পাশের জাতীয় টেনিস-কপোলের উঠুনে উজ্জ্বল ফুলের ঝলমল কয়েকটি গাছের বেলায়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে বড়ই লজ্জা পেলাম : ওই গাছ আগে ঢাকায় ছিল না (যদিও সম্প্রতি প্রকাশিত ড. নওয়াজেশ

আহমদের 'মহাবনস্পতির পদাবলী' গ্রন্থে দেখছি এমন একটি বয়স্ক গাছ তিনি পাবলিক লাইব্রেরির কাছে কোথায় খুঁজে পেয়েছেন, যা একদা ঢাকার নবাবদের বাগিচার শোভা বর্ধন করতো।) তাই 'শ্যামলী নিসর্গ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয় নি, যদিও ভারত-উপমহাদেশীয় গাছপালার বইয়ে কর্ডিয়ার ছবি দেখেছি বহুবার। যাক, শেষ পর্যন্ত কর্ডিয়া নবপর্যায়ে ঢাকায় আবির্ভূতা। অবশ্যই সুসংবাদ। সারা দেশে তার বিস্তার ঘটুক।

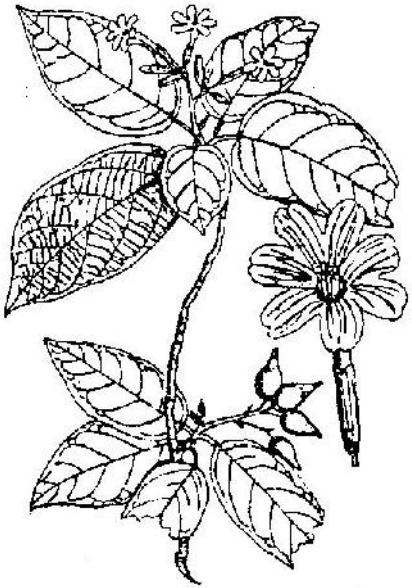

ছোটখাটো এই গাছটি চিরসবুজ, কাণ্ড কখনও খাড়া, কখনও গোড়া থেকে ডালপালাসহ গুলমতুল্য। গাঢ় ধূসর ছাল অমসৃণ, তাতে ছড়ান লম্বা লম্বা গভীর সরু সরু ফাটল। খাটো বোঁটার পাতাগুলি বেশ বড়, চ্যাপ্টা, থাকে ছোট ছোট শাখার মাথায় পরস্পর বিপরীত নয়, ঘন-একান্তর ভাবে। ফুল ফোটে প্রায় সারা বছর, ডালের আগায়, পাতার বেষ্টনিতে, অগোছাল মঞ্জরিতে। ফুল কমলা-লাল, ছ-সাতটি চ্যাপ্টা পাপড়ির নিচের নলটি খাটো ও গোড়ায় সরু সরু বৃত্যংশ আটকান। পুংকেশরপুঞ্জ দলনলে লুকান। ছোট ছোট ডিম্বাকার রসাল ফলকে স্থায়ী বৃতির ছোবড়া ঘিরে রাখে। ফলে মিষ্টি গন্ধ আছে।

আদিনিবাস পেরু, কিন্তু এখন গ্রীষ্মমণ্ডলের বাগানে সহজদৃষ্ট। ফুল সারা বছর ফুটলেও গ্রীষ্ম ও বর্ষায়ই প্রাচুর্য। নতুন পাতা গজায় বসন্তে। কাঠ সুগন্ধি ধূপ হিসাবে ব্যবহার্য। ফুল পূজার উপচার, বীজ ও কলম উভয়তই বংশবিস্তার সম্ভব ; বৃদ্ধি মন্থর।

কর্ডিয়া ভ. কর্ডাস (১৫১৫—১৫৪৪) নামের জার্মান উদ্ভিদবিদের স্মরণিক। সেবেস্তনা—এই জাতীয় গাছের ইরানী নাম। রমনাপার্কের লাগোয়া ঢাকা ক্লাবের পাশের জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সের উঠুনে তিনটি কর্ডিয়া আছে।

Cordia sebestera Linn. Fam. : *Boraginaceae* ; Hindi : Bhorar, Bohari. Eng. : Scarlet Cordia, Aloe-wood, Sebesten plum etc. Place : Tennis Complex, near Dhaka Club.

পারুল

স্টেরোস্পার্মাম সোয়াভিওলেন্স

'সাতভাই চম্পা জাগরে,

কেন বোন পারুল ডাক রে।'

নজরুল

বৃক্ষ, ৩০—৪০ ফিট উঁচু। কাণ্ড ধূসর বর্ণ, পত্র পক্ষবৎ যৌগিক, ১২″—১৮″ লম্বা, বিজোড়পক্ষ, পত্রিকা সংখ্যা ৭—৯ ; ৫″ × ২″, আয়তাকার, সূক্ষ্মকোণী, অভঙ্গ বা ক্রকচ-প্রান্তিক, কচিপাতা রোমশ ; মঞ্জরিদণ্ড দীর্ঘ, বহুপৌষ্পিক ; পুষ্প ১″ — ১$\frac{১}{২}$″ লম্বা : অসমাঙ্গ, ঘণ্টাকার, হালকা-বেগুনি, দল-ওষ্ঠ মসৃণ ; বৃতি $\frac{১}{৩}$″ লম্বা, লোমশ, ৩—৫ খণ্ড, খাটো ও চওড়া ; পাপড়ি ৫, যুক্ত, গোলাকার ; পুংকেশর ৪, দললগ্ন, দীর্ঘদ্বয়ী ; গর্ভদণ্ড ১; ফল ১৮″ × $\frac{১}{৩}$″, শুষ্ক, ঈষৎ লোমশ ; বীজ $\frac{১}{৪}$″ × ১″ খাঁজ-কাটা

সর্ব-বিষয়ে কৌতূহলী পণ্ডিত ওহায়িদুল হক একদা 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় 'অথঃপুষ্পকথা' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে পারুল, পিয়াল, মল্লিকা, চামেলি, মালতী, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাকার বহুল-উল্লিখিত কিছু ফুলের যথার্থ পরিচয় জানতে চান। আমি তখন মস্কোয়। তাঁকে সাহায্যের জন্য সম্পূরক একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে পারুল প্রসঙ্গে সিলেটের পাথারিয়া পাহাড়ের কাছে আমার এক বন্ধুর বাড়ির একটি গাছের কথা মনে পড়ে। বুনো বৃক্ষ, বিশাল, উঠুনে হালকা বেগুনি রঙের বেশ বড় বড় ফুল ঝরাত কোনো এক ঋতুতে, বনফুল বলে মোটেই ফেলনা নয়, চোখে পড়ার মতো সুশ্রী। হাতের কাছেই ছিল কলকাতার সিটি কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক, আমার শিক্ষক এইচ. মুখার্জির 'প্লান্ট গ্রুপস'। পেয়ে গেলাম সেখানে পারুলকে, গোত্র-প্রতীকের নমুনা হিসাবে ছবিও আছে। দেখলাম ওই বনফুলের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। বঙ্গবীর ওসমানি উদ্যানের লাগোয়া মহানগর পাঠাগারের বাগানে সিলেট থেকে এনে পারুল-সদৃশ গাছ, অগরু (আগর) ও হাড়গোজা লাগাই। প্রথমোক্ত একটি গাছ ছাড়া আর কোনটিই বাঁচে নি। গাছটি আজ (১৯৯৪) প্রায় পনের ফিট উঁচু, বলিষ্ঠ, পত্রনিবিড়—এখনও ফুল ফোটে নি। কিন্তু প্রজাতিটি পারুল কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। পারুলের একটি ঘনিষ্ঠ প্রজাতি আছে,

ডাকনাম আটকাপালি বা পীত-পাটলা (*Stereospermum tetragonum* DC).
জন্মে মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত, চট্টগ্রাম ও বর্মায়, আর পারুলের জন্মস্থান ছোটনাগপুর,
বিহার ও উত্তরবঙ্গ। দুটি গাছের সূক্ষ্ম চারিত্রিক পার্থক্যগুলি স্মৃতি থেকে পৃথক করা এই
মুহূর্তে অসম্ভব। তাই মহানগর পাঠাগারের গাছটির প্রস্ফুটন পর্যন্ত অগত্যা অপেক্ষা।

পারুল একহারা লম্বাটে উঁচু গাছ, রোমশ, ছাল ধূসর, কোমল-কাঠও তদ্রূপ। সরু পীতাভ
ধূসর, কালো দাগ ছিটান, মসৃণ সুশ্রী। পাতা যৌগিক, পক্ষাকার, ১২″ — ১৮″ লম্বা,

যেন ছোটখাটো ডাল। পত্রিকাগুলিও বেশ বড়, ৭″ — ৯″ লম্বা, ৩″ — ৫″ চওড়া,
বোঁটা খুব খাটো, ১/১০″। ফুল ফোটে গ্রীষ্মে। মঞ্জরি স্পষ্টতই দ্বিশাখ নিয়ত, তাতে ফুলের
সংখ্যাও উল্লেখ্য। ফুল প্রায় ৩″ লম্বা, যুক্তদল, ফিকে বা ঘন বেগুনি সুগন্ধী। বৃতি ৩—৫
অংশে বিভক্ত, ১/৩″ লম্বা, রোমশ, ছড়ান। পাপড়ি ৫, ঘণ্টাকৃতি, উপরের দিকে পাপড়ির
মুক্ত খণ্ডগুলি গোলাকার। পুংকেশর ৪, দুটি লম্বা, দুটি খাটো, দললগ্ন, একটি পুংকেশর
বন্ধ্যা, পরাগহীন। গর্ভদণ্ড ১, গর্ভমুণ্ড দ্বিখণ্ডিত। ফল ৮″ — ১২″ লম্বা, শুকনো,
খাদালো, পাকে শীতকালে। বীজ ১/৪″ — ১″ লম্বা, মাঝখানে খাঁজ-কাটা, বায়ুবাহী।

পারুলের ভেষজগুণ আছে : মূলের ছাল প্রশান্তিকর ও মূত্রবর্ধক ; ফুল কামোদ্দীপক, ইক্ষায়
মধুসহ সেব্য। পারুল ফুল সুগন্ধি, জলে রাখলে তাতে সুগন্ধ ছড়ায় এজন্য অন্যতম নাম
অম্বুবাসী। বলধা বাগানে আছে।

Sterospermum suaveolesns DC. Syn. *Bignoria suaveobons* Roxb. Fam. : *Bignoniaceae*. Beng. : Parul. Hindi : Patli. Place : Baldha garden.

জ্যাকারান্ডা

জ্যাকারান্ডা মাইমুসিফলিয়া

'অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বসিল নীলগুচ্ছ ফুলে,
দুর্গম রহস্য তার উঠিল সহজ ছন্দে দুলে।'

রবীন্দ্রনাথ

মধ্যমাকার পত্রমোচী বৃক্ষ ; পত্র দ্বিপক্ষল, বিপ্রতীপ, প্রায় ১৫ ″ লম্বা ; পত্রিকা আয়তাকার, সূক্ষ্মকোণী, $\frac{১}{৫}$ ″ — $\frac{১}{৩}$ ″ দীর্ঘ, অগ্রস্থটি দীর্ঘতর ; মঞ্জরি অগ্রস্থ, শাখায়িত, বহু পৌষ্পিক, পুষ্পসংখ্যা ৪০—৯০ ; বৃতি ক্ষুদ্র, ৫-খণ্ড ; দল নলাকার, ২ ″ লম্বা, নীলচে বেগুনি, গোড়া বাঁকা, ওপর চওড়া, গুচ্ছাকার, ওপর ও নিচ ঠোঁট যথাক্রমে ২ ও ৩ খণ্ড ; স্বাভাবিক পরাগকেশর ৪ ; ২ লম্বা, ২ খাটো, বন্ধ্যাটি পরাগাঙ্কুর, লম্বা, দলোত্তীর্ণ ; গর্ভদণ্ড ১, মসৃণ, পরাগকেশর অপেক্ষা সামান্য লম্বা। ফল শুষ্ক, আয়তাকার বা ডিম্বাকার, খাঁজ-কাটা।

১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মে এক ছুটিতে মস্কো থেকে দেশে ফিরে এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সোবাহানবাগের বাসায় দেখা করতে গেলে সে তড়িঘড়ি আমাকে কাছের একটি বাড়ির বাগানে দাঁড় করায়। আমার সামনে একটি নাতিবৃহৎ বৃক্ষ, নামটি তাঁর জানা চাই। একহারা ধরনের, লম্বাটে, গড়ন, মসৃণ হালকা-ধূসর শরীর, কৃষ্ণচূড়ার মতো পাতা, তবে আরও চিরল চিরল, কারুকার্যময়, গাছের তন্বী চেহারার সঙ্গে বড়ই মানাইসই। কিন্তু প্রথমে ওই পাতাগুলি কারও নজর কাড়বে না, চোখ ধাঁধিয়ে দেবে তার সারা গায়ে বেগুনী-নীল ফুলের উচ্ছ্বিত বর্ণনির্ঝর। 'নীলিমাবন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা'। এমন অনুপম দুর্লভ শোভা একমাত্র প্রথম ফোটা মিলেশিয়া ওভেলিফোলিয়ারই আছে। গাছটিকে চিনতাম, অবশ্য ছবি থেকে। মস্কো যাওয়ার আগে একটি অল্পবয়সী জ্যাকারান্ডা হলিক্রস কলেজে দেখে গিয়েছিলাম, তখনও ফুল ফোটে নি। প্রজাতিটি ঢাকা শহর কেন, গোটা বাংলাদেশেই দুর্লভ। জলাবদ্ধতাই মূল হন্তারক। উত্তরবঙ্গ ও সিলেট-চট্টগ্রামে সম্ভবত এই বৃক্ষের সফল চাষ সম্ভব। চট্টগ্রামকে নিশ্চিতই জ্যাকারান্ডার শহর বানানো যায়। সিলেটের চা-বাগানে লাগান ছায়াতরুগুলির (নানা প্রজাতির অ্যালবিজিয়া) সঙ্গে গড়নে-ধরনে জ্যাকারান্ডার মিল খুই স্পষ্ট। সিলেটে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা সত্ত্বেও এই বৃক্ষচাষ নিয়ে পরীক্ষা চালান প্রয়োজন। সাফল্য হবে প্রয়োজন ও সৌন্দর্যের এক আশ্চর্য মণিকাঞ্চনযোগ। এই গাছে ফুল ফোটে এপ্রিল-মে মাসে, আমাদের গ্রীষ্মকালে, যখন বাংলার শ্যামলী নিসর্গে লাল (কৃষ্ণচূড়া),

হলুদ (পেল্টফরাম), গোলাপী (ক্যাশিয়া) ও হালকা বেগুনীর (জারুল) তল তখন জ্যাকারান্ডার নীলের পোঁচ ওই চিত্রপটে দূরত্বের কাঙ্ক্ষিত গহিনতা আনবে। প্রকৃতির বর্ণরাজ্যে নীল তো দূরত্বধর।

ডালের মাথায় বড় বড় মঞ্জরিতে বেগুনি আঁচ-মেশান থোকা থোকা ফুল ফোটে এপ্রিল-মে মাসে। ফুলগুলি ২ ″ লম্বা, যুক্তদল, দলমুখ ২ আর ৩ পাপড়িতে দুভাগ আর দলমণ্ডল থেকে বেরোনো বন্ধ্যা পরাগদণ্ডটি পতঙ্গের শুঁড়ের মতো লকলকে। উর্বর ৪ পরাগকেশর অসমান (২+২), ফুলের একসম গড়নের সঙ্গে মানানসই। গর্ভকেশর যথারীতি এক ও যুক্ত, গর্ভদণ্ডটি খাটো। ফল ছোট, শক্ত ডিমের মতো গোলগাল।

জ্যাকারান্ডার আদিনিবাস ব্রাজিল, পথতরু হিসাবে আদৃত বিধায় এখন উষ্ণমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রীষ্মকালে শূন্যশাখে একই সঙ্গে পাতা ও ফুলের কুঁড়ি গজায়। এই গাছে ফুল ফুটতে লাগে অনেক বছর, বাড়েও খুব ধীরে ধীরে। ঘন ঘন বন্যার দরুন ঢাকায় জ্যাকারান্ডার সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমিত। ইদানীং গাছটি লাগান হচ্ছে নানা জায়গায়— রমনা পার্কে, বাংলা একাডেমীর চত্বরে। রমনার বিশপ-ভবনের সামনের উঁচু পথদ্বীপের জ্যাকারান্ডাটি সম্ভবত টিকে থাকবে। একটি বয়স্ক গাছ আছে ইঞ্জিয়ার্স ইনস্টিটিউটের লাগোয়া সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের ভেতরে।

এই গাছের দারুমূল্য আছে। কাঠ সুগন্ধি এবং বেগুনী ও কালো রেখায় চিত্রবিচিত্র, দক্ষিণ আমেরিকায় জ্যাকারান্ডার পাতা বক্ষরোগ ও ক্ষত চিকিৎসায় ব্যবহৃত। বাকলের রসও অভিন্ন গুণধর। জ্যাকারান্ডা এই গাছের ব্রাজিলীয় নাম, মাইমুসিফলিয়া অর্থ লজ্জাবতীপত্রী-পাতার সাদৃশ্যই এই নামকরণের হেতু।

Jakaranda mimosifolia D. Don. Fam. : *Begnoniaceae*. Eng. name : Fern laved Jacaranda, Green ebony tree. Place : in the Street-island in front of Bishop-house, Ramna(1994).

আকাশনীম

মিলিংটনিয়া হর্টেনসিস

'তাই কৃষ্ণচূড়া, তাই জারুল গোলমোরে
অশোক বান্দরলাঠি পিয়াশাল বিজাশালে
হিজলে সোঁদালে
শিরীষে আকাশনীমে নানা বনস্পতি মহীরুহে
স্বদেশ আত্মার মূর্তি।'

বিষ্ণু দে

উচ্চ, চিরসবুজ বৃক্ষ ; পত্র বৃহৎ, গোড়ায় ২—৩ পক্ষবৎ যৌগিক, ২´ — ৩´ লম্বা, বিজোড়পক্ষ, পত্রিকা ডিম্ব-ভল্লাকার, ২´´ — ৩ ´´ লম্বা, কচি অবস্থায় রোমশ ; মঞ্জরি অগ্রস্থ, বহুশাখী, নিয়ত ; ফুল সাদা, নলাকার, প্রায় ৪ ´´ লম্বা, মুখ ১ ´´ চওড়া, ৫-খণ্ড ; বৃতি অতি-ক্ষুদ্র, যুক্ত, ঘণ্টাকার; পাপড়ি ৫, যুক্ত, পুংকেশর ৫, দল-বহিস্থ, পরাগধানী সাদা বা হলুদ ; গর্ভকেশর যুক্ত ; ফল শুষ্ক, ১২ ´´ বা ততোধিক দীর্ঘ ; বীজ সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পক্ষযুক্ত, উড়ুক্কু।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলা থেকে কলকাতা চলেছি ট্রেনে। নভেম্বর মাস। এক অখ্যাত স্টেশনে ট্রেন থেমে গেল। ক্রসিংয়ের ঝামেলা। সবাই প্লাটফর্মে নেমে দু'পা হেঁটে নিচ্ছে। আমি বসলাম একটি বেঞ্চে। হঠাৎ দেখি আমার গায়ে পাশের আকাশছোঁয়া একটি গাছ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি ফুল ধরছে। মুহূর্তেই হিমঝুরি নাম মনে পড়ল, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। আকাশনীম আমার চেনা গাছ। পাঠ্যবইয়েও ছিল। বলধা বাগানের অমৃতবাবুর মুখেই সম্ভবত হিমঝুরি শব্দটি শুনি। দেশে যখন ভয়ঙ্কর অবস্থা, আমরা পলাতক, তখন এত দূরের এই অজ্ঞাত অখ্যাত স্টেশনে হিমঝুরি গায়ে ফুল ছিটিয়ে দেশের কথা তীব্রভাবে মনে করিয়ে দিল, আমার চোখ জলে ভিজে উঠল। কোথায় আজ অমৃত বাবু ? বেঁচে আছেন তো? আমার নিসর্গী বন্ধু বরিশালের ডা : এম. আহমেদ? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা? আর আমাদের তপোবন বলধা বাগান? পাক-সেনারা সেখানে ঘাঁটি গেঁড়ে বসে নি? কেটে সাফ করে ফেলেনি একটি অমূল্য বৃক্ষসংগ্রহ—একজন প্রকৃতিপ্রেমিকের গোটা জীবনের শ্রম ও স্বপ্ন? বাকী পথটুকু প্রায় কখনই আবেগের এই ধকল থেকে মুক্ত হতে পারি নি, উচাটন চলছিল সবিরাম ভূমিকম্পের মতন। গাছটিকে অতঃপর শ্যামলী নিসর্গ-ভুক্ত করার কথা ভেবেছি। অবশ্য তখন তা ছিল স্বপ্নেরও বাড়া। কে জানত বাংলা একাডেমী টিকে থাকবে সেখানে?

সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি ভস্মসাৎ হবে না? দেশ স্বাধীন হলে দেশে ফিরে যথারীতি ভুলে গেছি আকাশনীমকেও, যেভাবে ভুলেছি একাত্তরের বহু স্মৃতি, ঋণশোধের বহু জরুরি কর্তব্য।

আকাশনীম ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য। বলধা বাগানের গাছটির উড়ুক্কু বীজরা আশপাশের পড়োজমিতে বংশবিস্তার ঘটালেও উন্নয়নের ধকলে কেউ আর টিকে নেই। রমনা পার্ক বা

সোহরাওয়ার্দি উদ্যানেও তেমন নেই, একটি কার্জন হলে আর দুটো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের লাগোয়া গ্রন্থাগারের সামনে। পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ, সবগুলি বৈশিষ্ট্যেই সুমণ্ডিত। সেই বলিষ্ঠ উচ্চতা, খাড়া ডালপালার নেয়ান আগা, ছোটখাটো ডালের মতো চিকন পত্রিকাবহুল পক্ষাকার যৌগপত্র। সবকিছু মিলিয়ে সম্পৃক্ত এক বিনম্র কমনীয়তা--মধুগন্ধী ফুলে ফোটে শাখান্তের বড়সড় যৌগিক মঞ্জরিতে, ছাড়াছাড় ভাবে. আকাশনীম নিশিগন্ধা, ফুলগুলি সাদা ও নলাকার, নলমুখে বসান থাকে পাঁচটি ক্ষুদে পাপড়ির একটি তারা, ফাঁকে ফাঁকে আছে পাঁচটি পরাগধানী, যেন সযত্নে বসান রত্নপাথর। ফলগুলি সরু, লম্বা, আগা ও

গোড়া ছুঁচাল, সরু সরু পক্ষল বীজে ভরাট। বীজগুলি হালকা স্বচ্ছ পাখনাঘেরা ও সেজন্য উড়ুক্কু, দূরগামী।

বার্মার আত্মজ এই বৃক্ষটি আমাদের উপমহাদেশে পৌছয় প্রায় দুশ বছর আগে এবং এখন এই অঞ্চলের স্বাভাবিক বাসিন্দায় পরিণত। ছায়াঘন নয় ও শিকড় অগভীর বিধায় ঝড়ে ধসে পড়ার আশঙ্কার জন্য আকাশনীম পথতরুর অনুপযোগী। নভেম্বর—ডিসেম্বরে, আমাদের বৃক্ষরাজির পুষ্পহীনতার সময় ফুল ফোটে বলে গাছটি পার্ক ও খোলামেলা জায়গায়ই লাগান হয়। বীজ ছাড়াও গাছের গোড়া থেকে গজান (বেশ দূরে) চারা থেকেই বংশবিস্তার। দ্রুত বাড়ে বলে শেষোক্ত চারা রোপণই বাঞ্ছনীয়। কাঠ নরম, হালকা, হলুদ, মসৃণ এবং আসবাব ও সজ্জাকার্যের উপযোগী। মোটা বাকল থেকে নিম্নমানের ছিপি তৈরি হয়।

মিলিংটনিয়া নামাংশ ইংরেজ উদ্ভিদবিদ ও ইংল্যাণ্ডের রাজবৈদ্য স্যার টমাস মিলিংটনের (১৬২৮—১৭০৪) স্মারক, হর্টেনসিস অর্থ উদ্যান–সংশ্লিষ্ট। আকাশনীম নাম নীম, বিশেষত ঘোড়ানীমের সঙ্গে সাদৃশ্যজনিত ও অত্যুচ্চ বলেই। হিমঝুরি শীতকালে ঝরে পড়া সাদা সাদা ফুলের বৈশিষ্ট্যের জন্যই।

Millingtonia hortensis Linn., Syn. *Bignonia suberosa* Roxb. Fam. : *Bignoniaceae*. Hindi : Akash nim, Belati nim. Eng. : Indian Cork-tree, Trec Jasmin.

রবীন্দ্রকাব্যে তরুলতা : কিছু উদ্ধৃতি

নিম্নোল্লিখিত পঙ্‌ক্তিমালা আপন ঐশ্বর্যেই উদ্ধৃতিযোগ্য। এতে উদ্ভিদ, প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে বিধৃত অনুভব আমাদের উপলব্ধিকে সৌন্দর্যলোকের অন্তর্দেশে প্রসারিত করে, বর্ণাঢ্যতার প্রসাদে সমৃদ্ধতর করে। প্রকৃতি থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার, জীবন থেকে স্বপ্ন-কল্পনা অপনয়নের যে দানবীয় প্রকরণ অবক্ষয়িত ধনতন্ত্রের উপসর্গরূপে পাশ্চাত্যে প্রকট, আমরাও আজ তার আক্রমণের মুখোমুখি। অথচ আমাদের সমাজবাস্তবতা ও অবক্ষয়ের গুণগত চারিত্র্য অনেকটা আলাদা। আমরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নই, আমরা প্রাচুর্য-পীড়িতও নই। ঐতিহ্যগর্বী, কৃষিনির্ভর একটি দেশে যে-সংকটে আমরা বেষ্টিত তা আত্মিক নয়, বৈষয়িক। পাশ্চাত্যের সমান্তরালে এর সংস্থাপন অসংগত। এটি হলো আরোপিত কিংবা কৃত্রিমভাবে সংক্রমিত মূল্যবোধেরই এক অধ্যাস। তবু প্রতিরোধ প্রয়োজন। এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐতিহ্যের অফুরান অমৃতেই যে নিহিত আছে অনাক্রম্যতার ঔষধ, নিম্নোদ্ধৃতিসমূহ তার চকিত আভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার যে-স্বপ্নালোক আমাদের মুগ্ধ করে তা ধলেশ্বরীর নিকট অবস্থান থেকে, সুদূর উজ্জয়িনী বা ইন্দ্রলোক থেকে আহৃত এ প্রসঙ্গ অবান্তর এটি শিল্পসত্য এবং আমাদের নান্দনিক ঐতিহ্যে আত্তীভূত। আমরা এতে সম্মোহিত। যে-স্বপ্নলোক কালিদাস, বিদ্যাপতির চেতনাপ্রবাহে পরিবাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ অবধি প্রায় অবিকল অবয়বে প্রাণবন্ত, তার অনন্ত পরমায়ু প্রশ্নাতীত। রবীন্দ্রনাথ যে বিমুগ্ধ নিসর্গলোক আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন, অন্যতর শিল্পমাধ্যমে না হলেও উদ্যান-কল্পনায় তার আংশিক পুনর্নির্মাণ অবশ্যই সম্ভব, যেখানে 'ধলেশ্বরী, তীরে তমালের ঘন ছায়া', 'যূথিবনে ঝরাফুলের ক্রন্দন', 'নীলাঞ্জন ছায়া প্রফুল্ল কদম্ববনে', কিংবা 'শেফালী বনের মনের কামনা' স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনামাত্র নয়, রূপরসগন্ধস্পর্শবিধৃত নিটোল বাস্তবতা। জীবনের বহুবর্ণ বিকাশ ও সর্বস্পর্শী সামঞ্জস্যের জন্য কল্পলোক পুনর্নির্মাণে এমন বহুমাত্রিক প্রয়াস প্রয়োজন।

বকুল

১. বকুল প্রাণের সুধা দিয়ে
বায়ুরে মাতাল করি তুলে—

২. নির্ঝরিণী তীরে ওই বকুলের তলা
ভালো সে বাসিত ;

৩. গাঁথ যুথি, গাঁথ জাতি
গাঁথ বকুল মালিকা।

৪. বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে ?

৫. কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল বাগান।

৬. শ্বেতপাথরেতে গড়া
পথখানি ছয়া করা
ছেয়ে গেছে ঝরে পড়া বকুলে।

৭. বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী।

৮. বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।

৯. ওগো নির্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে।

১০. ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল।

১১. বকুল বীথিকা মুকুলে মত্ত
কানন 'পরে।

১২. বসন্তেরে পরান আকুল করা
আপন গলার বকুল মাল্য গাছ।

১৩. বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।

১৪. ওরে পাগল চাঁপা ওরে উন্মত্ত বকুল
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল।

১৫. বকুল কেয়া শিউলি সনে
ফিরে ফিরে আসব ধরণীতে।

১৬. দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে।

১৭. ফুল ফোটাবার যে রাগিণী বকুল শাখায় সাধা।

১৮. বকুল বীথিকা মুকুলে মত্ত কাননপরে।

১৯. বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মঞ্জুরে।

২০. সেথা আসন বিছায়ে রাখিস বকুলদলে।

২১. বায়ুভরে কাঁপে শাখা, বকুল দল পড়ে খসি।

২২. বিদায়ের পথে হতাশ বকুল।

২৩. কখন বকুলমূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল।

২৪. বনে উপবনে বকুলশাখার চঞ্চলতায় মর্মরে মর্মরে।

২৫. তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে।

২৬. ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে।

২৭. আধো ঘুমের প্রান্তে ছোঁয়া বকুল মালার গন্ধ।

২৮. বকুল মুকুল রেখেছে গাঁথিয়া
বাজিছে অঙ্গনে মিলন বাঁশরি

২৯. আজি পল্লীবালিকা অলকগুচ্ছ
সাজালো বকুল ফুলের দুলে

৩০. ওগো নির্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে।

৩১. বকুল ডালের আগায়
জোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়।

৩২. বকুল বনের মুগ্ধ হৃদয় উঠুক না উদ্ভাসি।

৩৩. এনেছে ঐ শিরীষ বকুল আমের মুকুল
সাজিখানি হাতে করে।

৩৪. উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলী জুঁই।

৩৫. কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে, বকুল তোমার মালার মাঝে।

৩৬. বকুলগন্ধে বন্যা এলো দখিন হাওয়ার স্রোতে।

৩৭. বকুল পেয়েছে ছাড়া, করবী দিয়েছে সাড়া।

৩৮. শুধায় তারে বকুল হেনা কেউ আছে কি
তোমার চেনা।

৩৯. ওরে বকুল পারুল ,ওরে শালপিয়ালের বন।

৪০. তোমার ফাগুন দিনের বকুল-চাঁপা
শ্রাবণ দিনের কেয়া।

৪১. মোদের বকুল গাছে

রাশি রাশি হাসির মতো
ফুল কত ফুটেছে।

৪২. পরায়ে দে গলে
সাধের বকুল ফুলহার।

৪৩. সারাদিন ধরে বকুলের ফুল ঝরে পড়ে
থাকি থাকি।

বেল

বেল, বেলি, উদ্ভিদ-শ্রেণীবিন্যাসে একই প্রজাতিভুক্ত। নাম ঃঅসমইনওম সঅমবঅচং গুল্ম, কখনো লতানো। ফুল সাদা, সুগন্ধি।

১. বসন্তে উঠিত ফুটে বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা,
করিত দক্ষিণ বায়ু অঞ্চল আকুল।

২. মল্লিকা চামেলী বেলী
কুসুম তুলহ বালিকা

৩. নিয়ে জুঁই, বেল, জবা
সাজানো হৃদয় সভা।

৪. হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা, শেফালি
হেথা ফুটিয়াছে।

৫. পথ পাশে দুই ধারে
বেল ফুল ভারে ভারে
ফুটে আছে, শিশুমুখে প্রথম হাসি প্রায়।

শিউলী)

১. যখন শিউলী ফুলে কোলখানি ভরি
দুটি পা ছড়ায়ে দিয়ে অনত বয়ানে

২. সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।

৩. বকুল, কেয়া, শিউলি সনে
ফিরে ফিরে আসবে ধরণীতে।

৪. আশ্বিনের উৎসবসাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে
তোমার অংগনে।

৫. আশ্বিনের শেফালিকা
ফালগুনের শালের মঞ্জরি।

৬. শিউলী ফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের পরে।

৭. প্রশান্ত শিউলি ফোটা প্রভাত শিশিরে ছলোছলো।

৮. শিউলি এলো ব্যতিব্যস্ত হয়ে,
এখনো বিদায় মিলিল না মালতীর।

৯. নীরব আকাশবাণী শেফালির কানে কানে বলা

১০. তারি অংগে এঁকেছিল পত্রলেখা
আম্রমঞ্জরির রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধি শিশির কণিকায়।

১১. যখন শরৎ কাঁপে শিউলি ফুলের হরষে।

১২. আলোক পরশে মরমে ঝরিয়া
হের গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া।

১৩. শিশির শিহর শরৎ প্রভাত
শিউলি ফুলের গন্ধ সাথে।

১৪. আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা গেথেছি শেফালি মালা।

১৫. শিউলি-তলার পাশে পাশে ঝরাফুলের রাশে রাশে।

১৬. ওগো শেফালি বনের মনের কামনা।

১৭. শিউলি-সুরভি রাতে, বিকশিত জ্যোৎস্নাতে।

১৮. হৃদয় কুঞ্জবনে মঞ্জুরিল মধুর শেফালিকা।

১৯. শিউলিগুলি ভয়ে মলিন বনের কোলে।

২০. শরৎ প্রাতের প্রথম শিশির প্রথম শিউলি ফুলে।

২১. দেখিলাম ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি
শেফালি কুসুম রুচি আলোর থালায়।

মালতী

মালতী লতাবিশেষ। বহুবর্ষজীবী। বয়স্ক অবস্থায় বৃহদাকার, দারব রোহিণী। ফুল সাদা, সুগন্ধি, শিউলি ফুলের আয়তন, পাপড়ি মোরানো। বসন্ত থেকে কয়েক মাস প্রস্ফুটনের কাল। বৈজ্ঞানিক নাম ঃগঅনওসমঝ চঅগাওিপালিলআটঅঘ, চওর.

১. কাননে ফুটে নবমালতী
কদম্ব কেশর।

২. সেদিন মালতী যূথি জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি।

৩. শিউলি এলো ব্যস্ত হয়ে;
এখনো বিদায় মিলিল না মালতীর।

৪. নিস্তব্ধ মালতী-ঝরা নিশা।

৫. ওই তো মালতী ঝরে পড়ে যায়
মোর আঙ্গিনায়।

৬. উতলা হয়েছে মালতীর লতা
ফুরালো না তার মনের কথা।

৭. বনের প্রান্তে ওই মালতীলতা।

৮. মালতীর মালা অঞ্চলে ঢেকে কনক প্রদীপ
আনো আনো তব পথ পরে।

৯. না হয় রেখো মালতীকলি শিথিল কেশে।

১০. ফুল গন্ধ নিবেদন বেদন সুন্দর মালতী তব
চরণে প্রণতা।

১১. মালতী বল্লরী কাঁপায় পল্লব করুণ
কল্লোলে।

১২. ওই মালতীলতা দোলো
পিয়াল তরুর কোলে, পুব হাওয়াতে।

১৩. কুন্দ মালতী করিছে মিনতি হও প্রসন্ন।

১৪. শুধাতে হয় সে কথা কি
ও মাধবী, ও মালতী।

১৫. মোর আঙিনাতে মালতী
ঝরিয়া পড়ে যায়।

১৬. যে ফিরে মালতীবনে সুরভিত সমীরণে

১৭. মাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে

মল্লিকা

জুঁইজাতীয় লতা। বৈজ্ঞানিক নাম *৩অসময়ইনতম মতলটইনেওরতম*
ফুল বেলীর মতো। তবে পাপড়ি সংখ্যা কম।

১ মল্লিকা চামেলী বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা।

২ আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক কাঞ্চন করবী।

৩ পথপাশে মল্লিকা দাঁড়াল আসি
বাতাসে সুগন্ধের বাজাল বাঁশি।

৪ বনপথ হতে সুন্দরী
এনেছি মল্লিকা মঞ্জরি।

৫ আন করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা
প্রফুল্ল মল্লিকা।

৬ শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস।

৭ আমার মল্লিকা বনে যখন প্রথম ধরেছে কলি।

যূথী

যূথী হলো বেলী বা জুঁইজাতীয় ফুল। লতা। ফুল সাদা, সুগন্ধি।
৩অসময়ইনএ-এর কোনো প্রজাতি হবে।

১ যূথি পরিমল আসিছে আসিছে সজল সমীরে।

২ যূথির গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মূর্ছিল মোর বাতায়নে।

৩ সেদিন মালতী, যূথি, জাঁতি

কৌতূহলে উঠেছিল মাতি।

৪. চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল
তুলিনু যূথি, তুলিনু জাঁতি, তুলিনু
চাঁপাফুল।

৫. শুভ্র মালতীর হাসি
শ্রাবণের যে সিক্ত যূথিকা।

৬. বৈকালে গাঁথা যূথীমুকুলের মালা।

৭. মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে
যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে।

৮. ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথির মালা।

৯. শুনি জলের ঝরোঝরো যূথীবনের
ফুলঝরা ক্রন্দন।

১০. আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরে
এনেছি যূথি জাঁতি।

১১. সে কি রয়ে গেল গো
সিক্ত যূথীর গন্ধ-বেদনে।

১২. অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া।

১৩. আজ কেন সেই বনযূথীর বাসে
উচ্ছ্বসিল মধুর নিশ্বাসে।

১৪. এই শ্রাবণ-বেলা বাদল ঝরা যূথীবনের
গন্ধে ভরা।

১৫. যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে।

১৬. মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যূথির গন্ধে

মত্ত হাওয়ার ছন্দে।

১৭ আনো বিস্ময় মম নিভৃত প্রতীক্ষায়
যূথীমালিকার মৃদু গন্ধে।

১৮ শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদু বায়।

জুঁই

জুঁই লতানে গুল্ম। বহু বর্ষজীবী। ফুল সাদা, সুগন্ধি, আকারে ছোট এবং বেলীর তুলনায় পাপড়ি সংখ্যা খুবই কম। বসন্ত থেকে শুরু করে শীতের আগ অবধি অনেকবার ছোট ছোট থোকায় থোকায় ফোটে। বৈজ্ঞানিক নাম ওঅসমইনতম অতরইচতলঅটতম

১ জুঁই সরোবর তীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভূঁয়ে।

২ ভেবেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে
তোমার করপদ্মদলের লাগি।

৩ বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে।

৪ বৃষ্টির জলে ভিজে সন্ধ্যা বেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।

কদম্ব

১ কদম্ব গাছের সার,
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।

২ নবকদম্ব মঞ্জরি গন্ধে

আকুল করে।

৩. কদম গাছের ডালে
পূর্ণিমা চাঁদ আটকা পড়ে
যখন সন্ধ্যাকালে।

৪ কদম শাখার আড়াল থেকে
চাঁদটি উঠে আসে

৫. আষাঢ়ের আর্দ্রবায়ুভরে
কদম্ব কেশরে
চিহ্ন তার পড়ে ঢাকা।

৬. অঞ্চলে মোর কদমফুলের ভস্ম।

৭. সে দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী
কদম্বের ডালি।

৮. কদম্ব কেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁক

৯. বাদল দিনের প্রথম কদমফুল
আমায় করেছ দান।

১০. কদম্বেরই কানন ঘেরি
অষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে।

১১. ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে।

১২ কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধ মদিরা
অজস্র লুটিছে দুরন্ত ঝটিকা।

কাঞ্চন

১ বকুল শিমুল আকন্দ ফুল
কাঞ্চন জবা রঙ্গনে
পূজা তরঙ্গ দুলে অম্বরময়।

২ শুধায় যে মল্লিকারে কাঞ্চন রঙ্গনে

তুমি কবে এলে।

কৃষ্ণচূড়া

১. ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায়

২. হেথা কৃষ্ণচূড়াশাখে ঝরে শ্রাবণের বারি
সে যেন আমারি।

৩. কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরি।

৪. কৃষ্ণচূড়ায় সাজে বকুল তোমার
মল্লার মাঝে।

৫. কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরি দেখা পেলেম ফাল্গুনে।

করবী

করবী গুল্ম। এদের ঝাড় বেশ বড় হয়। ফুল লাল, গোলাপী, সাদা, মৃদু সুগন্ধী। পাপড়ি সংখ্যা পাঁচ অথবা বহু। বসন্ত প্রস্ফুটনের কাল। সারাগাছ থোকা থোকা ফুলে তখন ভরে থাকে। বছরের কয়েক বারই ফুল ফোটে। বৈজ্ঞানিক নাম *প্এরইতম ওডওরতম*

১. শরতে ধরাতলে শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।

২. ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী

৩. শরমে জড়িত কত না গোলাপ
কত না গরবী করবী

৪. তোমার বনে ফুটেছে শ্বেত করবী

আমার বনে রাঙা।

৫. ভোর বেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে আসে শ্বেত করবীর রঙে।

৬. অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তঝুঁটি।

৭. হেরো শরমে জড়িত কত-না গোলাপ
কতনা গরবি করবী।

৮. আবেশ লাগে বনে, শ্বেতকরবীর অকাল
জাগরণে।

৯. সহসা ডালপালা তোর উতলা যে
ও চাঁপা, ও করবী।

১০. কোনো রঙের মাতন উঠল দুলে ফুলে ফুলে
ও চাঁপা, ও করবী।

১১. বকুল পেয়েছে ছাড়া করবী দিয়েছে সাড়া।

কেতকী

কেতকী বা কেয়ার ঝোপ সর্বত্র চোখে পড়ে। জলের ধারে সাধারণত জন্মে। পাতা লম্বা, প্রান্ত কন্টকিত। ফুল বড়, সাদা অতি-সুগন্ধি। বৈজ্ঞানিক নাম ফঅনডঅনতস অেসচইচতলঅরইস

১. কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপেঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল বাগান।

২. কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি।

৩. জলভেজা কেতকীর দূর সুবাসে।

কাশ

ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম ঐরআগরওটইস চনিওসতরওডএস, ভএঅতু

১ আমলকী পল্লবের পেলব উদাসে
মঞ্জরিত কাশে,
অপরাহ্নকাল।

২ নদীর তীরে কাশের দোলা,
শিউলি ফুটে দূরে।

৩ কাশের বনে লুটিয়ে পড়েছে
শুক্লাসপ্তমীর জ্যোৎস্না।

৪ নদীতীর কাশ বনে ফুলে ফুলে সাদা।

চাঁপা

চাঁপা বহুনামী।

চাঁপা, স্বর্ণচাঁপা দীর্ঘাকৃতি বৃক্ষ। প্রায় চিরসবুজ। ফুল মৃদু থেকে গাঢ় হলুদ, কখনো সোনালী–কমলা, অতি সুগন্ধি। বসন্ত থেকে বর্ষা অবধি প্রস্ফুটনের কাল। গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। গোলক চাঁপা মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ। অন্য যে নাম কাঠচাম্পা, গোলাইচ কাঠকরবী। বৈজ্ঞানিক নাম প্লমেরিয়া। কনকচাঁপা দুই জাতীয় গাছ হতে পারে মুচকুন্দকেও কনক চাঁপা বলে। তা ছাড়া ওকনাও কনকচাঁপা। দোলনচাঁপা ওষধি, আদাজাতীয় উদ্ভিদ, ফুল সাদা, সুগন্ধি. বর্ষা প্রস্ফুটনের কাল এবং প্রস্ফুটন দীর্ঘস্থায়ী। বৈজ্ঞানিক নাম *ঐএডচীইতম চওরওনঅরইতম কঙএনইগ*। ভুইচাঁপা আদাজাতীয় গাছ। প্রস্ফুটনের সময় বসন্ত। নিস্পত্র অবস্থায় খাটো ডাঁটায় ফুল ধরে। ফুল অতি সুগন্ধি এবং নীলাভ। লাতিন নাম *খঅএমপএরইঅ রওটতনডঅং*

১ চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণ কিরণ কোমল করিয়া।

২. গোলক চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে
বন হতে আসে বাতায়নে।

৩. বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই, চাঁপা, বকুল পারুল
পথে পথে।

৪. শীতের দিনে কনকচাঁপা
যায় না দেখা গাছে।

৫. কনকচাঁপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে।

৬. চাঁপাকুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন আশা।

৭. সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আনি
চির পুরাতন একটি চাঁপার বাণী।

৮. নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ।

৯. চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু
চাঁপাফুল।

১০. চৈত্র মাসের হাওয়ার কাঁপন
দোলনচাঁপার কুঁড়িখানি।

১১. পারুল দিদির বাসায় দোলে
কনকচাঁপার কটি কুঁড়ি।

১২. গোলকচাঁপা একটি দুটি করে
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরি ঝরি
তোমারে নমিয়া।

১৩. ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা।

১৪. চাঁপার কলি চাঁপার গাছে

সুরের আশায় চেয়ে আছে।

১৫. তপ্ত হাওয়ায় শিথিল মঞ্জরী
গোলক চাঁপা একটি দুটি করি।

১৬. ফাগুন আজো যেরে খুঁজে ফরে
চাঁপাফুলে।

১৭. মাখব গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি।

১৮. সহসা ডালপালা তো উতলা যে
ও চাঁপা ও করবী।

১৯. কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে, ও চাঁপা ও করবী।

২০. কোন রঙের মাতন উঠল দুলে ফুলে ফুলে
ও চাঁপা ও করবী।

২১. যেথা চাঁপা কোরকের শিখা জ্বলে।

২২. স্বর্ণবন সমুজ্জ্বল নবচম্পাদলে।

২৩. হেথায় বেলা, হোয় চাঁপা
শেফালি হোথা ফুটিয়ে।

চামেলী

জুঁই জাতীয় লতা। ফুল জুঁইয়ের চেয়ে বড়, সিঙল, পাতা পালকাকার যৌগিক। পাপড়ি সাদা, কখনও হলুদ। বৈজ্ঞানিক নাম ওঅসমইনতম গরঅনডইলেওরতম

১. মল্লিকা, চামেলী বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা।

২. চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ায় গায়ে গায়ে।

৩. আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ঐ চামেলীর লতা
কোন দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা।

৪. চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া।

৫. চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়নমেলি।

কামিনী

১. তরুশাখে হেলাফেলা
কামিনী ফুলের মেলা
থেকে থেকে সারাবেলা
পড়ে খসে খসে।

২. সম্মুখে তার বাগান কোণায় কামিনী ফুল
আনন্দিত অপব্যয়ে পাপড়ি ছড়ায়।

৩. কামিনী ফুলকুল বরষিছে পবন
এলো চুল পরশিছে।

৪. কোনমতে আছে পরাণ ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে।

৫. আমার মনের কামিনী পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর চরণভর।

কিংশুক

১. দুহাত ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত
প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

২. তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার
অকারণের সুখে।

কুমুদ

কুমুদ হলো শাপলা (গমিপাঅএত্র লওটতম ১) আর কমল, নলিনী, শতদল হল পদ্ম (গএলতমবও নতচইএরজ)

১ এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেতশতদল
শীতল শিশির ঢাকা ঝরা মালতী ফুলে।

২ আজ লুটিয়ে হিরণ কিরণ পদ্মদলে
সোনার রেণু লুটেছি।

৩ শুন নলিনী, খোল গো আঁখি।

৪ নীলকমল রইত হাতে
কী জানি কোন্ কাজে।

৫ একটি কুমুদ তুলে তোমার
পরিয়ে দেব চুলে।

৬ উদয় অচল অরুণ উঠিলে কমল ফুটে
যে জলে।

কুরচি

১ কুরচী, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে
অন্যমনা
যে ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে
ভর্ৎসনা।

কুন্দ

জুঁইজাতীয় ফুল, ঝোপ তেমন লতানো নয়, পাতা রোমশ। ফুল সাদা, গন্ধহীন। প্রায় সারা বৎসরই ফোটে থোকা থোকা। বৈজ্ঞানিক নাম ৎঅসমইনতম পতবএসচএনস যইললড়

১ শুভ্র ফেনের কুন্দ মালায়
বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই।

২ কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ
নাই তার লাজ।

৩. ওগো অনেক কুন্দ অনেক শেফালি ভরেছে
তোমার ডালা।

৪. কুন্দ মালতী করিছে মিনতি হও প্রসন্ন।

৫. কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে।

কুরুবক

সীমজাতীয় ফুল। নাম জয়ন্তী। বৈজ্ঞানিক নাম *শএসবঅনইত্র সত্রসবত্রন হএরর* । ছোট গাছ। ফুল হলুদ। দৈবাৎ রক্তিম। রক্তিম জয়ন্তীই সম্ভবত কুরুবক নাম প্রাচীনকালে আদৃত।

১. কর্ণমূলে কুন্দকলি, করুবক মাথে।

২. কুরুবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে।

অশোক

১. অশোক কুঞ্জ উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে।

২. অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।

৩. একছন্দে মিলে গেল বনের মর্মর
অশোকের কিশলয় স্তর।

৪. ওই দেখো অশোকের শ্যামঘন আঙিনায়।

৬. ঘনপুঞ্জ অশোক মঞ্জরী
বাতাসের আন্দোলনে ঝরি ঝরি
প্রহরে প্রহরে।

৭ অলক হতে খসবে অশোক নাচের তালে।

৮. অশোক রেণুগুলি রাঙাল যার ধূলি।

৯. রক্ত রঙের জাগল প্রলাপ অশোক গাছে।

১০. তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার
অকারণের সুখে।

১১. অশোকবনে আমার হিয়া নতুন
পাতায় উঠবে জিয়া।

১২. অশোকের শাখা ঘেরি বল্লরী বন্ধন।

১৩. বন হতে কেন গেল অশোকমঞ্জরী।

১৪. অশোক বনে নবীন পাতা
আকাশ পানে তুলিল মাথা।

নাগকেশর

১. মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে
আকাশে বয় মন-হারানো হাওয়া।

২. নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধূলায় দেয় ফেলে
ঐশ্বর্য গৌরবে।

৩. সকালে দিতাম আনি
নাগকেশরের পুষ্পভার
অলক্ষ্যে তোমার।

৪. বসন্তে নাগকেশরের সুগন্ধে মাতাল
বিশ্বের জাদুর মঞ্চে রচে সে আপন ইন্দ্রজাল।

পলাশ

১ পলাশের কুঁড়ি,
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি ।

২ ফাগুনে ফুটল পলাশ
গাছতলার মাটি দিল ছেয়ে ।

৩ পলাশ–বীথিকা কার অনুরাগে অরুণ।

৪ পলাশের স্পর্শমায়া আকাশে দেয়
বুলাইয়া ।

৫ পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে।

৬ পলাশকলি দিকে দিকে তোমার
আখর দিল লিখে ।

১৭ পলাশ বনের রং মাতান ছায়াপথে
কাজ ভুলানো সকাল বিকালে।

টগর

গুল্ম অথবা ক্ষুদ্রাকৃতি বৃক্ষ। পাতা চ্যাপ্টা, চিরহরিৎ; ফুল সাদা, পাপড়ি ভারি, সুগন্ধি। বসন্ত–গ্রীষ্ম প্রস্ফুটনের কাল এবং বহুদিন প্রস্ফুটন অব্যাহত থাকে । বৈজ্ঞানিক নাম ঐবুঅটঅমইঅ ডইুঅরইচঅটঅ, ভওরাইলল.

১ রৌদ্র ঝলমল ফুলভরা টগরের ডালে।

ডালিয়া

আমাদের শীতের ফুল বিদেশী। সুপরিচিত। বৈজ্ঞানিক নাম *ঢঅলইঅ অরইঅরইলইস* । ম্যারিগোল্ড বা গাদা বাংলাদেশের সুপরিচিত ফুল। বৈজ্ঞানিক নাম *ঠঅগঅটএস পঅটতল ং* । ফুশিয়া ইউরোপীয়, বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য, লাতিন *তৈটচাইঅ লিরইডঅ* ।

১. বাগানের নিমন্ত্রণ এসেছে ডালিয়া
এসেছে ফুশিয়া
এসেছে ম্যারিগোল্ড।

লিলি

লিলির নামের শেষ নেই। অজস্র ফুলকেই এ নামে বাংলায় ডাকা হয়। একটির বৈজ্ঞানিক নাম *লিলিয়াম চ্যালসিডনিকাম*, পিঁয়াজ জাতীয় কন্দ এবং ফ্যানেলের আকারের রঙিন ফুলকেই আমরা লিলি বলি। টাইগার লিলি, স্পাইডার লিলি, ফায়ারবল লিলি এমনি নামের শেষ নেই।

১. লিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তার ঢালু ডাঙা

হেনা

গুল্ম, ঝোপ। ফুল সরু নলের মত, রাতে ফোটে। অত্যন্ত সুগন্ধি। বৈজ্ঞানিক নাম *লসোনিয়া ইনারমিস*, হিন্দি-উর্দুতে রাত-কি রাণী। বাংলায় হাসনাহেনা।

১. শুধায় তারে বকুল হেনা ...

২. ফুল বাগানের বেড়া হতে
হেনার গন্ধ ভাসে।

রজনীগন্ধা

নলাকৃতি সাদা ফুল, আশ্চর্য সুগন্ধি এবং কলিরা নীচ থেকে একে একে উপরের দিকে ক্রমাগত প্রস্ফুটিত হয়। নিচের মুথা থেকে পাতা ও ফুলের ডাটা জন্মে। সারা বছরই বিভিন্ন সময়

ফোটে। বৈজ্ঞানিক নাম *ফওলঅিনটাএস টতবএরওসঅং* ইংরেজি নাম টিউবরোজ।

১. বেড়াক ভাসিয়া
রজনীগন্ধার গন্ধ মদির লহরী।

২. রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা।

৩. রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।

৪. হাওয়ায় লাগে মোহপরশ
রজনীগন্ধার।

৭. বসন্ত বনের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে
নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে

৮. কোন রজনীগন্ধা হতে আনব সে তান
কণ্ঠ পুরে।

৯. পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়।

১০. আন করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা
প্রফুল্ল মল্লিকা।

১১. রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে।

১২. রজনীগন্ধার পরিমলে সে আসিবে আমার
মন বলে।

গন্ধরাজ

বড় আকারের গুল্ম। ফুল সাদা, বহু পাপড়িযুক্ত, তীব্র সুগন্ধি। বসন্ত প্রস্ফুটনের কাল। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বছরে কয়েক বারই ফুল ফোটে। বৈজ্ঞানিক নাম *হঅরডএনইঅ এঅসমইনওইডএস ঐললইস*

১ আসবি তোরা গন্ধরাজের
 গাঁথন নিয়ে হাতে।

২ ছায়ার আড়ালে গন্ধরাজের
 তন্দ্রাজড়িত চাওয়া।

মাধবী

আমরা যাকে মাধবী বলি সেই লাল সাদা থোকা থোকা ফুলের লতা, যা সর্বত্র চোখে পড়ে এবং বর্ষা–বসন্তে অজস্র প্রস্ফুটিত হয় তা কিন্তু মাধবী নয়. ওর নাম রেংগুন ক্রিপার। রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন মধুমঞ্জরী এবং বলধা বাগানের অমৃত বাবুর মাধুরীলতা। মাধবীর বৈজ্ঞানিক নাম *হইপটঅগএ মঅডঅবলঅটঅ*. এদেশে অরণ্যজাত। কিন্তু প্রস্ফুটন উচ্ছ্বিত এবং আশ্চর্য মধুগন্ধী। বসন্ত প্রস্ফুটনের কাল। বিশাল দারব–রোহিণী। ফুল সাদা, পাপড়ি দ্বিখণ্ডিত।

১ মাধবিকা হোক সুরভি সোহাগে
 মধুপের মনোহরা।

২ বসন্তের জয়রবে
 দিগন্ত কাঁপিল যবে
 মাধবী করিল তার সজ্জা।

৩ মাধবী সহসা তার
 সঁপি দিল উপহার
 রূপ তার, মধু তার গন্ধ।

৪ সেদিন বনে মাধবী শাখা নিচু
 ফুলের ভারে ভারে।

৫ মৌমাছি যে পথ জানে
 মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।

৬. বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
মিলনের স্বর্ণপাত্রে সুধা দিল ভরি।

৭ মাধবীকুঞ্জ বারবার করি বনলক্ষীর
ডালা দেয় ভরি।

৮. মাধবী বনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত
মন্থর বেলায়।

শিমুল

১. ওই যে শিমুল, ওই যে সজিনা আমারে
বেঁধেছে ঋণে,
কত যে আমার পাগলামি পাওয়া দিনে।

সূর্যমুখি

ওষধি, কিন্তু বেশ উচু, বর্ষজীবী। ফুল হলুদ প্রান্তদল রশ্মির মতো বিকীর্ণ। বৈজ্ঞানিক নাম *ঐলইঅনটাতস অন্নততস ং*

১ সূর্যমুখীর বর্ণে বসন
লই রাঙ্গায়ে।

গুঞ্জা

কাইচ বা কুচের নামান্তর। বৈজ্ঞানিক নাম *ঃবরতস পরএচঅটওরইতস ং* লতা। ফুল খড়সাদা, অনুল্লেখ্য। বীজ লাল এবং মুখে কালো দাগ। দুষ্প্রাপ্য হলেও নীলবীজ কুচ বাংলাদেশে লভ্য। স্বর্ণকাররা বীজকে ওজনে ব্যবহার করে।

১ যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে

নীপ

১ মেখলাতে দুলিয়ে দিত

নবনীপের মালা।

২ জাগো সহচরী আজিকার নিশি
ভুলো না—
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।

লোধ্র

গুল্ম, বৈজ্ঞানিক নাম *শইমপলওচওস রঅচএমওসতস*,
শাখা সূক্ষ্মলোমযুক্ত, পাতা ২–৫ ইঞ্চি, ফুল হলুদ, সুগন্ধি, ছোট, ২–৪ ইঞ্চি মঞ্জিরিদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ থাকে, বঙ্গে নেই।

১ মুখে তার লোধ্ররেণু লীলাপদ্ম হাতে।

জেরানিয়ম

ঔষধি। বিদেশী। ফুল গুচ্ছবদ্ধ এবং আশ্চর্য বর্ণিল। জেরানিয়ামই বৈজ্ঞানিক নাম।

১ বিদেশী ফুলের টব, সেথা জেরানিয়মের গন্ধ
শুঁকিয়া নিয়েছে মোর ছন্দ।

আকন্দ

জংলী গুল্ম, অনাদৃত। পাতা রোমশ, স্থূল, বৃহৎ। ফুল গুচ্ছবদ্ধ, মাংসল, সাদা অথবা মৃদুবেগুনী। বৈজ্ঞানিক নাম *ছঅলওটরওপইস গইগঅনটইঅ* ড. ভর দুধকষ বিষাক্ত।

২ বকুল, শিমুল, আকন্দ ফুল
কাঞ্চন জবা রঙ্গণে
পূজ তরঙ্গ দুলে অম্বরময়

২ কুঞ্জবনের প্রান্ত ধারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।

ধুৎরো

ধুতরা ফুল ফানেলের আকৃতিবিসিষ্ট, সাদা অথবা বেগুনি, মৃদুগন্ধী। বীজ বিষাক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম *চঅটতরঅ মঅটএল*ং

১ ঝরে পড়া ধুৎরো ফুল

পারিজাত

স্বর্গের ফুল, অতএব নামকরণের চেষ্টা অর্থহীন। অনেকের মতে পরিজাত আসলে মন্দার।

১ স্বর্গভোলা পারিজাতের গন্ধখানি এসে
খ্যাপা হাওয়ায় বুকের ভিতর ফিরবে
ভেসে ভেসে।

২ গোলাপ জবা পারুল পলাশ পারিজাতের
বুকের পরে।

৩ নন্দনবীথির ছায়ে তব পদপাতে
নবপারিজাতে।

৪ এখনও উড়ে যেতে পারে সে
পারিজাতের বনে।

ম্যাগনেলিয়া

মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ। ফুল বসন্ত বা গ্রীষ্মে ফোটে। পাতা অনেকটা কাঁঠালপাতার মতো, তবে বিডিম্বাকার নয়, পাতার নিচ গাঢ় বাদামী। ফুল সাদা, প্রায় পদ্মের মতো। এজন্য বাংলা নাম উদয়পদ্ম। আশ্চর্য সুগন্ধি। বৈজ্ঞানিক নাম *হঅগনওলইঅ গ্রঅনডইলেওরঅ*ং

১ ম্যাগনেলিয়ার শিথিল পাপড়ি থরে থরে
পড়ে ঘাসে।

চেরি

জাপানে জন্মে। বর্ণিল প্রস্ফুটনের জন্য বিশ্বখ্যাত। বৈজ্ঞানিক নাম ফরতনতস চএরঅসওইডএস. আপেলের আত্মীয়।

১ ও যে চেরি-ফুল, তব বনবিহারিণী

জাতি

জুঁইজাতীয় লতা। বৈজ্ঞানিক নাম সঠিকভাবে বলা কঠিন। ফুল সাদা, সুগন্ধি। কাঁটাজাতির অন্য নাম স্বর্ণঝিন্টি। একেবারে আলাদা গোত্রের ফুল। বৈজ্ঞানিক নাম ভঅরলএরইঅ ছরইসটঅটঅ ং

১ গাঁথ যূথি, গাঁথ জাঁতি
গাঁথ বকুল-মালিকা।

২ সেদিন মালতী যূথী জাঁতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি।

৩ চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল
তুলিনু যূথী জাতি, তুলিনি
চাঁপা ফুল।

৪ ফুটল সজনী পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথী জাঁতি রে।

৫ আমি সকল যূথী কানন ফিরে
এনেছি যূথী জাঁতি

রডোডেনড্রন

হিমালয়ের আত্মজ। বৃক্ষ অথবা গুল্ম। শীতের দেশে প্রচুর জন্মে। ফুলের স্তবকে গাছ আচ্ছন্ন হয়। সাদা, বেগুনি অথবা লাল। নানা প্রজাতি আছে। একটির নাম ড়াওডওডএনডরওন টঅমসওনইই

১ উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন গুচ্ছ।

সেঁউতী

এক ধরনের সাদা গোলাপ। বনগোলাপ। বৈজ্ঞানিক নাম ড়ওসঅ *ইনুওলতচরঅটঅ* পাঁচটি পাপড়ি।

১ আমি জানি মনে-মনে,
সেঁউতি যূথী জবা।

তারামণি

[illegible] নাম তারালতা বা কুঞ্জলতা। পাতা চিকন করে কাটা, ফুল লাল দৈবাৎ সাদা, তারকাকৃতি, লতার গঠন অত্যাকর্ষী। বৃদ্ধি দ্রুত। বর্ষজীবী। বৈজ্ঞানিক নাম *বতঅমওচলইট পইননঅট* ৎওা

১ সৌরভগরবিনী তারামণি লতা সে
অমার ললাট-পরে কেন অবনতা সে।

পারুল

বৃক্ষ। বৈজ্ঞানিক নাম *শটএরএওসপএরমতম সতঅুএওলএনস* চছ পাতা যৌগিক, পত্রিকা বড়। ফুল অসমানভাবে খণ্ডিত, রং গাঢ় থেকে হালকা বেগুনী। ফল লম্বা, সরু, কিছুটা মোরান।

১ ওরে বকুল পারুল
ওরে শাল পিয়ালের বন!

২ আজ পারুল দিদির বনে
মোরা চলব নিমন্ত্রণে।

৩ বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে।

৪ পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা।

জারুল

১ বেড়ার ধারে বেগুনীগুচ্ছে ফুল্ল জারুল।

২ জারুল পলাশ যাদারে চলেছে রেষারেষি।

গোলাপ

পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীতে কয়েক হাজার জাতের গোলাপ আছে। আমাদের দেশী বনগোলাপের নাম ড়ওসভ্র ইন্ন্রুওলভচরত্রটত্র। মৈমনসিংহের দিকে জংগলে জন্মে। ড়ওসত্র ইনডইচত্র থেকে নানা ধরনের উন্নত গোলাপ তৈরি হয়েছে।

১ হের শরমে জড়িত কত না গোলাপ
কত না গরবী করবী।

২ দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত
প্রলাপে
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

৩ বল গোলাপ মোরে বল
সই, তুই ফুটিবে কবে?

৪ ব্যথার প্রলাপে মোর
গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী।

৫ গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোথা যাসনে।

জবা

জবা গুল্ম। অজস্র রং ও আকারের ফুল হয়। বৈজ্ঞানিক নাম ী্হিবসচতস রওসত্র-সইনএনসইস ং নীলজবার নাম ী্হিবইস্যতস

ফরিইঅচতস লটকন জবা ৈইবইসচতস ং সচাইজওপএটঅলওতস ৈওওক। মরিচজবা হঅলুভুইসচতস গরঅনডইলেওরতস ৗ.ভ.খ.

১ বকুল শিমুল আকন্দ ফুল
কাঞ্চন জবা রঙ্গণে
পূজাতরঙ্গ দুলে অম্বরময়।

রঙ্গন

গুল্ম, ঝোপ। লাল, গোলাপী, হলুদ ও সাদা জাতের ফুল হয়। রং অনুসারে বৈজ্ঞানিক নাম বিভিন্ন। ফুলের স্তবক বৃহৎ, ঘনবদ্ধ, অত্যন্ত আকর্ষী। বর্ষা থেকে অনেকবারই প্রস্ফুটিত হয়। লাল রঙ্গনের বৈজ্ঞানিক নাম ঈযওরদ চওচচইনএশ ং

১ শুধায় সে মল্লিকারে, কাঞ্চন রঙ্গনে
তুমি কবে এলে।

২ করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা
প্রফুল্ল মল্লিকা
আয় তোরা আয়।

পিয়াল

পিয়াল বা প্রিয়াল দক্ষিণ ভারতের গাছ। বাংলাদেশে সহজলভ্য নয়। বৈজ্ঞানিক নাম ভতচান্দ্রনঅনইঅ লঅটইওেলইঅ ড়ওযব.

১ 'ওরে বকুল পারুল, ওরে শাল পিয়ালের
বন।'

মধুমঞ্জরি

নাম রেংগুন-ক্রিপার এবং আমরা ভুল করে মাধবী বলি। বৈজ্ঞানিক নাম ধতএসদতঅলইস ইনডইচঅ ং পুষ্পস্তবকে লতা আচ্ছন্ন হয়। মধুগন্ধী। ফুলের রং প্রথমে সাদা, পরে লাল।

১ নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন করে
মধুমঞ্জরী লতা।

বেণু

ঘাসজাতীয়। অন্য নাম বেনা, বিন্না।

১. কম্পিত বেণু বনে মলয়ার চুম্বনে।

২. ঝিল্লি ঝংকৃত বেণুবন ছায়া
পল্লব মর্মরে কাঁপে।

৩. বেণু-বন ছায়া ঘন সন্ধ্যায়
তোমার ছবি মিলাইল।

স্ত

মুচকুন্দ

১. পিতামহের আমলের
পুরানো মুচকুন্দ গাছ
দাঁড়িয়ে আছে জানালার সামনে
কৃষ্ণরাত্রির অন্ধকার।

তমাল

১. কোন তমালের কাননতলে মধ্যদিনের তাপে
বনচ্ছায়ার শিরায় শিরায় তোমার সুর কাঁপে।

মহুল

১. ঘন মহুল শাখার মতো
নিশ্বাশিয়া উঠিছে প্রাণ।

কেয়া

কেতকীর নামান্তর। কেতকী দ্রষ্টব্য।

১. কেয়া ফুলখানি কবে তুলে আনি
দ্বারে মোর রেখে গেলে।

২. তোমার ফাগুন দিনের
বকুল চাঁপা
শ্রাবণ দিনের কেয়া

ক্যামেলিয়া

ক্যামেলিয়া চা জাতীয় গুল্ম, প্রস্ফুটনকাল বসন্ত। ফুল অত্যন্ত সুন্দর ; অজস্র ঘনবদ্ধ পাপড়িতে গোলাপের মতো সুশ্রী। রং সাদা, লাল অথবা মিশ্র। ছায়ায় জন্ম। বৈজ্ঞানিক নাম *Camellia japonica.*

১. নাম তার ক্যামেলিয়া'

নীলমণি

বিদেশী বল্লী। নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। বসন্তে এর নীলনিঝর তুলনাবিহীন। নারব লতাবিশেষ। বৈজ্ঞানিক নাম *Petrea volubilis.*

১. নীলিমবন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত
ব্যাকুলতা,
তারি ধারা পুষ্পপাত্রে ভরি নিল নীলমণি
লতা।

ভাঁটি

বাংলাদেশের অতি পরিচিত ওষধি। অস্থানেই সহজলভ্য। ফুল সাদা সুগন্ধি। বসন্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়। পথের ধারে আগাছার ভিড়ে চেখে পড়ার মতো। বৈজ্ঞানিক নাম *Clerodendron infortunatum greatn.* পরাণকেশর দীর্ঘ, উৎকীর্ণ।

১. ভাঁটিগাছে হয়েছে জঙ্গল
পুরানো গড়ে পাশে।

২. আশে-পাশে ভাঁটিফুল ফুটিয়া
রয়েছে দলে দলে।